The Presidency College Magazine

2008-2009

A Tribute to Henry Louis Vivian Derozio

The Presidency College Magazine

(VOLUME 69)

2008-2009

"Though wild-waves roll between us now"

[ACKNOWLEDGEMENTS]

- Sanjib Ghosh (Principal)
- Devasish Sen (Bursar)
- Sanghita Sen (Teacher in Charge of Publications)
- Swanap Kumar De, Niranjan Goswami, Himanshu Kumar (Teacher Editors)
- Debrarayan Chakrabarti (Senior Librarian)
- Bijoy De (Librarian)
- Swapan Kumar Mukherjee (Library Staff)
- Cover Design — Anitesh Chakraborty
- Do (Derozio Section) — Souvik Gupta vaya
- Cover Photographs — Avishek Ghosal, Joy Saha
- Illustration — Sangbida Lahiri

MAGAZINE COMMITTEE

- Sanjib Ghosh (Principal)
- Devasish Sen (Bursar)
- Sanghita Sen (Teacher in Charge of Publications)
- Swanap Kumar De, Niranjan Goswami, Himanshu Kumar (Teacher Editors)
- Anitesh Chakraborty, Sreecheta Das (General Editors)
- Dinanath Singh (Editor, Hindi Section)
- Soumik Saha (Publications Secretary)

Special Thanks to :

Aviroop Sengupta, Bikram Kishore Bhattacharya, Ishita Kundu, Somiddho Basu, Samhita Sanyal

All rights of publications reserved by Presidency College, Kolkata.

Printers : Jayasree Press, 91/1B, Baithakkhana Road, Kolkata-9
Published in 2009 by the Magazine Committee, Presidency College, Kolkata

■ Contents

Foreword	**Sanjib Ghosh**	5
সম্পাদকীয়	**অনিতেশ চক্রবর্তী**	7
সম্পাদকীয়	**দীনানাথ সিংহ**	8
অন্য পৃথিবী	**অনীক চট্টোপাধ্যায়**	9
অনুসৃজিত কৃষ্ণভাবনা ও শ্রীচৈতন্যদেব	**জয়িতা দত্ত**	12
আয়ুর্বেদ, অ্যালোপ্যাথি, মধুসূদন গুপ্ত এবং এদেশে প্রথম শব ব্যবচ্ছেদ	**ড. দীপঙ্কর ভট্টাচার্য**	17
সিমন দ্য বোভোয়া : নারী-মুক্তি আন্দোলনের অনন্য এক ঋত্বিক	**মঞ্জুশ্রী মুখোপাধ্যায়**	20
স্পাইডার সিল্ক — এক বিস্ময়কর তন্তু	**ড. রীণারাণী রায়**	22
ফ্রেড ওয়াল্ডার দুটি গল্প	**অভিজিৎ দত্ত**	24
The Battle for Kargil : Post-Modern War in South Asia	**Kaushik Roy**	27
Should men be feminists?	**Samita Sen**	34
বিজ্ঞান-শিক্ষার নামে যা চলছে ও অধ্যাপক শ্যামল সেনগুপ্ত	**দীপাঞ্জন রায় চৌধুরী**	37
জ্যৈষ্ঠবিকেল	**শঙ্খ ঘোষ**	41
নেড়ি কুত্তা ৫	**নবনীতা দেব সেন**	41
দুটি কবিতা	**সব্যসাচী দেব**	42
দুটি অনুবাদ কবিতা	**সমীর কুমার মুখোপাধ্যায়**	42
একটি কবিতা	**দেবজ্যোতি মণ্ডল**	43
মধ্যরাত, ১০ মে	**তোর্সা বন্দ্যোপাধ্যায়**	43
ঘুমন্ত কফিন	**ঐশিক দাশগুপ্ত**	44
ছেঁড়া লিরিক	**সৌমিক সাহা**	44
আকাশ-ভাঙা	**ধৃতিমান গঙ্গোপাধ্যায়**	44
TIME	**Lumbini Shill**	45
NAMELESS ME	**Poulomi Ghosh**	45
SPRING-SONG : A BALLAD	**Yashodhara Ghosh**	46
THAT MAN	**Amrita Mukherjee**	47
The dark of night nurtured desire	**Sunayan Mukherjee**	48
Last Christmas	**Sayantan Auddy**	49
গাঁব	**संध्या कुमारी सिंह**	50
यार : बेकार की लाश	**जतीन शुक्ला**	50
नेता की रोटी	**शर्मिष्ठा घोष**	51
मैं प्रगति हूँ	**रेनु सिंह**	51
एक छोटी धारा	**प्रमोद कुमार गुप्ता**	52
मैं क्या लिखूँ?	**संतोष सिंह यादव**	52

The Death of The Author :
Thus Spoke The Phoenix — **Arka Chattopadhyaya** — 53

Fictionesque — **Anandaroop Sen** — 57

The Romance of Fatehpur Sikri — **Parameshwari Sircar** — 59

জয় গোস্বামীর 'স্পর্শ' এবং ... — অমৃতা ঘোষাল — 60

একলা একতারা — অর্পিতা ব্যানার্জী — 62

অনিকেত : নাম যার নামমাত্র নয় — মলয় ভট্টাচার্য — 63

सरकार-काका — भावना कौशिक — 68

सामाजिक उत्थान में सत्साहित्य
का योगदान — दीनानाथ सिंह — 70

"Junks"...Sorry, We are
just Disciples — **Amrit Kumar** — 72

The Parable of The Mycorrhiza — **Aniket Sengupta** — 74

"ওরা কাজ করে"...একটি পাথুরে রোজনামচা — ছন্দক চ্যাটার্জী — 75

বালুটিলটিল পঙ্খী কান্দে বালুতে পড়িয়া ... — শ্রুতি গোস্বামী — 79

প্রসঙ্গ : প্রসঙ্গান্তর — শুচিস্মিতা ঘোষ — 83

সিনেমা : একটি সমীক্ষা — সংহিতা সান্যাল — 87

Leaves of Grass – A Journey — **Pritha Kundu** — 89

On Satan, Satanists & Satanism — **Ujaan Ghosh** — 92

Nationalism Revisited — **Somak Biswas** — 96

Raniganj Coal-fields —
A Reality Check — **Udita Mukherjee** — 100

সার্ধশতবর্ষের আলোকে 'অব্যক্তে'র লেখক — সৃজিতা ঘোষ — 101

কবিতার গাছ — সৈকত মিস্ত্রী — 104

বিজ্ঞাপনের অর্থনীতি — অর্মত্যকুমার সেন — 113

● ডিরোজিও স্মরণ বিভাগ

Extracts from the Proceedings
of the Hindu College Committee
relating to the dismissal of Henry
Louis Vivian Derozio — **Prof. Susobhan Sarkar** — 119

"Gems in bezels" —
sonnets of Juvenis — **Chaitali Maitra** — 122

অবিস্মরণীয় হেন্‌রি ডিরোজিও — স্বপনকুমার দে — 124

শিক্ষক ডিরোজিও ও প্রাসঙ্গিক কয়েকটি কথা — দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য — 133

ডিরোজিও এবং তাঁর শিক্ষা — সুরমিতা কাঞ্জিলাল — 135

Derozio — The first voice
against conservatism — **Shriya Bandyapadhyay** — 137

The Fire Sermon — **Jhelum Roy** — 142

What Constitutes the
Presidencian today... (A survey) — 144

Editors and Publication Secretaries of
the Presidencey College Magazine — 150

FOREWORD

With this volume, Presidency College Magazine has spanned 69 years of publication. The uniqueness of the Magazine does not stem only from the stretch of its publication but more significantly from the imaginative vigour exhibited in every issue. The legacy of the College has been imbued and transmitted in the creative endeavour of the students channeled through the Annual Magazine.

Intellectual engagement, novelty of ideas and the spirit to express them freely have been the guiding principles of the Magazine. The eclectic mosaic of the contributions to the magazine clearly bears out the fact that Presidency College nurtures curiosity, zeal, ingenuity and excellence.

The achievements of the College in this year have been remarkable. Attempts have been made to implement several recommendations of the Seven Member Expert Committee constituted by the Government of West Bengal. Granting of partial financial autonomy to the College has allowed generation of funds and retention of tuition fees. These affirmative measures can lead to the broadening of scope in collaborative research activity. One such project with Tata Steel is already underway. Upgradation and modernization of infrastructure of the College have also been carried on, which includes completion of two top floors of the Central Library Building, developmental work in the Science departments, the ongoing project of air conditioning of Derozio Building as well as planning of a State- of –the art Seminar Room in the College.

The College was honoured by the presence of the Governor of West Bengal, Sri Gopal Krishna Gandhi, who inaugurated and delivered the keynote address in the UGC Sponsored National Seminar on " Henry Louis Vivian Derozio: A Reappraisal" organized by the Derozio Bicentenary Celebration Committee on 22nd and 23rd December, 2008. The occasion was also graced by other eminent speakers. Year long programmes are also underway to commemorate the 150th birth anniversary of Acharya Jagadish Chandra Bose.

A formal MOU has been signed between the College and Ecole Polytechnique, Paris. Academic teams from the Chemistry departments of Universite Joseph Fourier and Grenoble Codex, France visited the College. PG programmes are slated to be introduced in the Departments of Bengali and Bio-Chemistry from the Session of 2009-10 in accordance with our continuous efforts towards academic expansion. Researtch work in various departments of the college is contributing positively in sustaining high academic standards of the College.

The publication of the Magazine is a continuance as well as enrichment of the tradition of the college in keeping with the necessities of changing times. I extend my best wishes to the students in their effort to inculcate the dynamism that set them apart as leaders of tomorrow in every sphere of their activities.

Sanjib Ghosh
Principal
Presidency College, Kolkata

সম্পাদকীয়

"বুদ্ধের মৃত্যুর পর কল্কি এসে দাঁড়াবার আগে
একবার নির্দেশের ভুল হয়ে গেলো
আবার বিশুদ্ধ হতে কতকাল লাগে?"

এই ঘোরের মরতে বসা সময়টাকে বাগে আনা যাচ্ছে না কিছুতেই। হাজার-একটা গলি-ঘুঁজি—আর তার প্রত্যেকটার মধ্যে অগুণতি ধ্বংসাবশেষ, চারপাশের পৃথিবীটা যত গুটিয়ে আসছে- -তত পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে এ-সবের মধ্যে এতদিন গুটিসুটি মেরে বসে থাকা সময়ের ভূতটা। প্রথম বিশ্ব সেই ভুত দেখতে পাচ্ছে কিনা, জানা নেই—তবে চারপাশের ক্ষতস্থানগুলো থেকে উঠে আসা টাটকা রক্তের গন্ধকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় কিন্তু আমাদের জানা নেই। 'উচ্ছেদ-মৃত্যু-সন্ত্রাস-অর্থনৈতিক সংকট'— নিদেনপক্ষে রাস্তার চারপাশে মুখ ঢেকে দেওয়া বিজ্ঞাপনের হোর্ডিংগুলোও আজ শূন্য। মানে যা-যা থেকে আমাদের 'ভালোলাগা' নামক অনুভূতিটা তাও বেঁচে-বর্তে থাকতো সে-সবও তো একইসঙ্গে ডুবতে বসেছে।

তবু, বসন্ত আসছে... আমরা নাকি আজ অতটাও খারাপ নেই!

এরই মধ্যে—মূলত ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগেই প্রকাশিত হলো প্রেসিডেন্সি কলেজের পত্রিকা। বেশ কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও গঠনে কিংবা লেখায় তা হয়তো প্রশংসাও কুড়িয়ে নেবে অনেকেরই। 'হয়তো' বললাম কারণ, ভালোলাগাটা তো আপেক্ষিক। 'ব্যতিক্রমী প্রেসিডেন্সির ব্যতিক্রমী পত্রিকা'— এমনটাও মনে হতে পারে অনেকের, হতেই পারে। সুর কেটে যেতে পারে-- তবু জানিয়ে রাখা ভালো— এই 'ভালো-না-থাকার' সময়ে এই পত্রিকা ব্যতিক্রম-ই বই কি! তবে, ব্যতিক্রমের এই চরিত্রটা ভিন্ন। তারও অজুহাত আছে— আমরা এমনকি, প্রেসিডেন্সির ছাত্রছাত্রীরাও যে আজ— ততটাও খারাপ নেই।

তবু, পত্রিকার লেখায়-আঁকায়-প্রচ্ছদে অন্য উচ্চারণ থাকতেই পারতো— কিন্তু, সেই সহজ সত্যটা তো আমরা জেনে গেছি। একেবারে আত্মস্থ করে নিয়েছি এই সময়ের সূত্র—

"যা লেখ যা ইচ্ছে লেখ কিন্তু খবরদার
দিও না সাপের ল্যাজে পা
বলো না নরখাদক বাঘ মানুষের মাংস খায়
যা লেখ কবিতা লেখ, কিন্তু কে তোমার মাথার দিব্যি দিয়েছে যা
কদাচ প্রকাশ্য নয়, এ ভর সন্ধ্যায়, এ কালবেলায় করতে হবে উচ্চারণ?"

যাইহোক, তাও তো লড়ে যেতে হয়। সামান্যতম প্রতিবাদী হলেই 'মুন্ডু কাটা' যাওয়ার চোখরাঙানি সত্ত্বেও যে কজন আজও থেমে যায়নি, অন্ততঃ তাদের কথা ভেবে...

নিজের সময়ে তো মাথা নোয়াননি হেনরি লুইস ভিভিয়ান ডিরোজিও ও। তাঁর জন্মদ্বিশতবার্ষিকী এই বছরই। এই পত্রিকার পাতায় আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের সাধ্যমতো শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের। হয়তো পর্যাপ্ত হল না। আমাদের যোগ্যতা সীমিত— কিন্তু আন্তরিক অনুভূতিতে অন্তত কোনো খাদ নেই। একইসঙ্গে, আমরা ভুলে যাইনি— জগদীশচন্দ্র বসু কেও। তাঁর সার্ধশতবার্ষিকীতেও থাকল আমাদের প্রণাম।

ছাত্র-ছাত্রী-বন্ধুদের বেশ কিছু লেখাই বেছে নেওয়া গেলো না— কেবলমাত্র যোগ্যতার মাপকাঠিতে নয়— বরং পুঁজি সীমিত বলেই।

আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ শঙ্খ ঘোষ, নবনীতা দেবসেন এবং সব্যসাচী দেবের কাছে। এঁদের লেখা না পেলে প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা হয়তো অসম্পূর্ণই থেকে যেত।

তবে, এত কিছুর পরেও অসম্পূর্ণতা থেকেই গেল। এই দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া সময়টার 'ভালো-না-থাকা', 'বেঁচে-না-থাকা' মানুষেরা তাদের যাবতীয় সংবেদন নিয়ে সেইভাবে উঠে এল না এই পত্রিকার পাতায়। এটা হয়তো আমাদেরই ব্যার্থতা... হয়তো সভ্যতারও।

তবে, আশা রইল, ভবিষ্যতে এই প্রেসিডেন্সি কলেজের পত্রিকাই সময়ের যোগ্য মুখপত্র হয়ে উঠতে পারবে। এবারে যেটুকু পারা গেল না....

"হবেই হবে— আর কিছুদিন
লড়েই দেখা যাক না!"

অনিতেশ চক্রবর্তী

सम्पादकीय

भाषा अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम माध्यम है। यह अभिव्यक्ति आम जन की अस्मिता से लेकर राष्ट्र के आगत भविष्य निर्माण के लिए भी हो सकती है। इसलिए भाषा का प्रश्न केवल भाषा तक ही सीमित नहीं होता है। यह महाप्रश्न अंतत: अपनी पहचान का प्रश्न है। इस तथ्य के समर्थन में हिन्दी साहित्य के शिरोमणि मुंशी प्रेमचंद के शब्द हैं- 'राष्ट्र की बुनियाद राष्ट्र की भाषा है। नदी, पहाड़ और समुद्र राष्ट्र नहीं बनाते। भाषा ही वह बंधन है जो चिरकाल तक राष्ट्र को एक सूत्र में बाँधे रहती है और इसे बिखरने, विखंडित एवं विभाजित होने से रोकती है।' भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में बाजारवाद ने स्वहित के लिए एक ऐसी संकर भाषा को निर्मित किया है जो आज हिन्दी भाषा का जितना सर्वनाश कर सकती है, कर रही है और इसके प्रति हमारी घोर उदासीनता ने हमारी पहचान को प्रश्न के घेरे में खड़ा कर दिया है। चंद रुपयों के लालच में हम अपनी पहचान खोने लगे है।

भाषा की समृद्धि एवं संपन्नता जन-जन की भाषा के प्रति सजगता, सक्रियता एवं जागरुकता पर निर्भर करती है। भाषा का निर्माण भी जनसामान्य करते है, अंतत: इसकी रक्षा वही करेंगे, क्योंकि सरकार, आयोग और आयोजन न भाषा का निर्माण करते हैं और न परिष्कार-परिमार्जन। हिन्दी भाषा का उत्थान भी इन्हीं जनसामान्य के हाथों में है। अत: इस अभियान में जनसामान्य की जागरुकता के साथ-साथ विद्यार्थी वर्ग की सक्रिय भूमिका को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज जब हमारा राष्ट्र आतंकवाद के दंश के लगातर झेल रहा है ऐसे में हमारे युवा साहित्यकारों को अपने दायित्वों के प्रति सचेत होना होगा और आम जनता में एकता, स्थिरता, शांति एवं भाईचारे की भावना को विकसित करने के उद्देश्य पर एकमत होकर प्रयास करना होगा क्योंकि यह युग की मांग है।

'प्रेसिडेंसी कालेज' पत्रिका इसी दिशा में विद्यार्थियों को उत्साहित करने का एक विनम्र प्रयास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके समक्ष इस पत्रिका को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे इस प्रयास से सुधी कवि और पाठकगण संतुष्ट होंगे क्योंकि उनकी संतुष्टि में ही इस प्रयास की सार्थकता निहित है। यदि कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं आपके समक्ष क्षमाप्रार्थी हूँ। मैं अपने गुरुजनों एवं सहपाठियों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जिनके परामर्श, मार्गदर्शन और सहयोग के बिना इस कार्य को संपन्न कर पाना मेरे लिए संभव नहीं था।

दीनानाथ सिंह

অন্য পৃথিবী

অনীক চট্টোপাধ্যায়
অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

২০০৮ সালের মার্চ মাসে জাপান গিয়েছিলাম একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গবেষণা প্রবন্ধ পাঠের আমন্ত্রণ পেয়ে। পশ্চিম জাপানের শিল্প-নগরী কোবে (Kobe)-র গাকুইন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন। বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন নয়, নিছক ভ্রমণ কাহিনিও এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, এই রচনার আলোচ্যবস্তু জাপানের মানুষের কিছু সাধারণ অভ্যাস, যা সমাজ ও মানুষের পক্ষে হয়ে উঠেছে অসাধারণ এবং অত্যন্ত উপযোগী। অনুকরণীয় এই অভ্যাসগুলি ভারতসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে সহজে, এর জন্যে প্রয়োজন সংযম ও সমাজ চেতনা; কোনো প্রযুক্তি বা অর্থব্যয় নয়।

জাপানে প্রতি বর্গমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব (Density of Population) উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। জাপান প্রথম বিশ্বের একটি উন্নত দেশ হওয়া সত্ত্বেও দেশের বড় শহরগুলিতে জনসংখ্যা প্রচুর। টোকিও, ওসাকা, কোবে, নাগোয়া, হিরোসিমা, কিয়োতো, হোক্কাইডো ও অন্যান্য বড় শহরে প্রচুর লোক পথে ঘাটে চোখে পড়ে। কিন্তু একদম যেটা চোখে পড়ে না সেটি হলো জনাধিক্যের কারণে নাগরিক জীবনে বিশৃঙ্খলা। রেল স্টেশনের কথাই ধরা যাক। লোকাল ট্রেন থেকে শুরু করে বিশ্ব বিখ্যাত শিনকানসেন (Shinkansen) বা বুলেট ট্রেনের জন্যে যাত্রীরা রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকেন লাইন করে, প্রতিটি কামরার জন্যে নির্দিষ্ট স্থানে। আগে সব যাত্রীরা নেমে যান, তারপর অপেক্ষারত যাত্রীরা একে একে ট্রেনে ওঠেন। অথচ আমাদের দেশের মতোই, ট্রেনে উঠে যে সব যাত্রী বসতে পাবেন এমন নিশ্চয়তা নেই; কিন্তু সিট দখলের জন্য যে হুড়োহুড়িটা আমাদের এখানে আছে, ওখানে সেটা একদম নেই। দাঁড়িয়ে যেতে হবে জেনেও যাত্রীরা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ট্রেনে উঠছেন, কোনো গুঁতোগুঁতি, ধাক্কাধাক্কি, গালমন্দ নেই। নিজেকে প্রশ্ন করেছিলাম, কেন এই নাগরিক-সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি আমাদের দেশে? এর জন্যে প্রয়োজন কত কোটি ডলার বা টাকার? ট্রেনের সিট থেকে শুরু করে সবকিছু তাড়াতাড়ি দখল করতে গিয়ে আমরা হারিয়ে ফেলছি সব কিছু। আসলে এই নাগরিক-সংস্কৃতির মূলে আছে সংযম, স্থৈর্য ও সমাজ চেতনা, এর জন্যে খুব বেশি অর্থ বা শিক্ষার প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্রনাথ জাপান গিয়েছিলেন ১৩২৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে, অর্থাৎ ৯২ বছর আগে। জাহাজে করে রবীন্দ্রনাথ জাপানের কোবে শহরেই প্রথম পদার্পণ করেছিলেন ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ সালে। রবীন্দ্রনাথও অভিভূত হয়েছিলেন জাপানিদের সংযমে, ওঁদের সহিষ্ণুতায়। 'জাপানযাত্রী' প্রবন্ধে বিশ্বকবি লিখেছেন, "একটা জিনিস এখানে পথে ঘাটে চোখে পড়ে। রাস্তায় লোকের ভিড় আছে, কিন্তু গোলমাল একেবারে নেই। এরা যেন চেঁচাতে জানে না ..... পথে মোটরে করে যাবার সময় মাঝে মাঝে যেখানে ঠেলাগাড়ি প্রভৃতি বাধা এসে পড়ে, সেখানে মোটরের চালক শান্তভাবে অপেক্ষা করে; গাল দেয় না, হাঁকাহাঁকি করে না। পথের মধ্যে হঠাৎ একটা বাইসিকল্ মোটরের উপরে এসে পড়বার উপক্রম করলে, আমাদের দেশের চালক এ অবস্থায় বাইসিকল্ আরোহীকে অনাবশ্যক গাল না দিয়ে থাকতে পারত না। এ লোকটা ভ্রুক্ষেপমাত্র করলে না। গাড়ির সঙ্গে বাইসিকলের ঠোকাঠুকি হয়ে যখন রক্তপাত হয়ে যায়, তখনো উভয়পক্ষ চেঁচামেচি গালমন্দ না করে গায়ের ধুলো ঝেড়ে চলে যায়। আমার কাছে মনে হয়, এইটেই জাপানের শক্তির মূল কারণ। জাপানি বাজে চেঁচামেচি ঝগড়াঝাটি করে নিজের বলক্ষয় করে না। প্রাণশক্তির বাজে খরচ নেই বলে প্রয়োজনের সময় টানাটানি পড়ে না। শরীর মনের এই শান্তি ও সহিষ্ণুতা ওদের স্বজাতীয় সাধনার একটা অঙ্গ।" ৯২ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ জাপানে যত লোক দেখেছেন, এখন জনসংখ্যা আরো বেড়েছে। অথচ সংযম, সহিষ্ণুতা রয়েছে আগের মতোই। জনাধিক্যকে সামনে রেখে আমাদের মতো অসহিষ্ণুতা, শিষ্টাচারহীনতা জাপানের নাগরিক জীবনে অকল্পনীয়। ওঁরা এখানেই অনেক এগিয়ে রয়েছেন আমাদের চেয়ে।

এই সহিষ্ণুতার আর এক সুন্দর প্রকাশ দেখেছি গাড়ির হর্ণ না বাজানোর মধ্যে। জাপানে প্রচুর গাড়ি, কিন্তু হর্ণের ব্যবহার নেই বললেই চলে। ফলে নাগরিক জীবনে বধিরতার আশঙ্কা এবং জ্বালা নেই। একটি ঘটনার কথা আমার আজীবন মনে থাকবে। হিরোসিমা শহরে আমি হোটেল থেকে বেড়িয়ে হেঁটে হেঁটে চলেছি বড় রাস্তার উদ্দেশ্যে, সঙ্গে চলেছে চাকা লাগানো ট্রলি ব্যাগ পেছনে আরেকটি ব্যাগ নিয়ে হাঁটছেন আমার স্ত্রী। হোটেলের রাস্তাটি অপেক্ষাকৃত সরু, নিজের অজান্তেই আমি এসে পড়েছিলাম রাস্তার মাঝখানে। প্রায় মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর শুনি আমার স্ত্রী আমায় ডাকছেন, পেছন ফিরে দেখি আমার স্ত্রী ও আমার মাঝে একটি মোটরগাড়ি, গাড়ির চালক পাঁচ মিনিট ধরে আমার পেছনে গাড়ি

চালিয়ে আসছেন, কোনো হর্ণ দেন নি। এই অবস্থা দেখে আমার স্ত্রী আমাকে রাস্তার ধারে সরে হাঁটতে বলছেন। আমি ধারে সরে গেলে গাড়ির চালক স্মিত হেসে, মাথা ঝুঁকিয়ে আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে এগিয়ে গেলেন। এই ঘটনাটি অফিস-টাইম ব্যস্ততার সময়। কত টাকা লাগে, কত বিদ্যা লাগে এই সহিষ্ণুতার জন্যে? প্রথম বিশ্বের অনেক দেশেই দেখেছি গাড়ির চালকরা অনাবশ্যক হর্ণ বাজান না। তবে মনে রাখতে হবে যে, জাপানে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রথম বিশ্বের সমস্ত দেশের মধ্যে বেশি। তাই জাপানির এই সংযম ও সহিষ্ণুতা সম্ভ্রম জাগায়। অনুকরণীয় এই অভ্যাস কি আমরা রপ্ত করতে পারি না? অন্তত এর জন্য কোন অর্থব্যয় নেই। শব্দ দূষণ থেকে রক্ষা পাবার এমন সহজতর উপায় আর কী হতে পারে?

অসম্ভব দ্রুততায় কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে জাপানির জুড়ি নেই। জাপানি সহিষ্ণুতায় প্রজ্ঞা আছে, কিন্তু আলস্য নেই। উদাহরণস্বরূপ আরেকটি ঘটনার কথা বলি। টোকিওতে আমরা থাকতাম রোপোংগি হিলস্ (Roppongi Hills) অঞ্চলে। রোজ সকালে আমাদের বাসস্থান থেকে হেঁটে হেঁটে আমরা মেট্রো স্টেশনে যেতাম, প্রায় আধ কিলোমিটার পথ। একদিন সকালে দেখি পথের এক জায়গা ঘেরা রয়েছে, পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলাম যে রাস্তায় প্রায় সাত-আট ফুট গর্ত করে নীচে কাজ চলছে। মেশিনের আধিক্য দেখে বোঝা গেল যে বেশ গুরুতর কিছু সমস্যা হয়েছে। অনেকটা জায়গা খুঁড়ে মাটি সরিয়ে কাজ হচ্ছে। পাশ দিয়ে হেঁটে আমরা মেট্রো স্টেশনের দিকে চলে গেলাম সকাল এগারোটা নাগাদ। এরপর সারাদিন কাজ ও ঘোরাঘুরির পর রাত নটা নাগাদ যখন বাড়ি ফিরছি, তখন মনে পড়ল যে এই রাস্তায় তো সকালে খোঁড়াখুঁড়ি চলছিল। কিন্তু কোথায় কি! মাটি, গর্ত-টর্তর চিহ্ন মাত্র নেই, সব যেন ম্যাজিকের মতো উধাও হয়ে গিয়েছে। একবার ভাবলাম, ভুল রাস্তায় যাচ্ছি না তো? গত সাতদিন একই রাস্তায় যাতায়াত করেছি, সুতরাং ভুল হবার উপায় নেই। তাও কয়েকটা নির্দিষ্ট Landmark দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। সকালে যেখানে খোঁড়াখুড়ি হয়েছিল, সে জায়গাটিকে ফুটপাতের অন্যান্য স্থান থেকে আলাদা করা অসম্ভব। গর্ত শুধু বোজানোই হয় নি, জায়গাটিকে নিখুঁতভাবে সারিয়ে ফুটপাতের অন্যান্য সিমেন্ট-এর স্ল্যাবের সাথে মিশিয়ে একাকার করে দেওয়া হয়েছে দক্ষ প্লাস্টিক সার্জারির মতো। ওখানে যে দশঘন্টা আগে বেশ বড়-সড় গর্ত খোঁড়া হয়েছিল, বোঝে কার সাধ্য! গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলাম ১০-১২ ঘন্টাতে এই কাজ অবশ্যই করা যেতে পারে। ১০-১২ ঘন্টা কি কম সময়? পাশাপাশি এই চিন্তাও মাথায় এলো যে আমাদের দেশে গর্ত বুজিয়ে নিখুঁত রাস্তাটি কি দশমাসেও ফিরে পাওয়া যেতো?

এই সব ছোটোখাটো বিষয় থেকেই জাপানি কর্ম-সংস্কৃতির একটা সুনির্দিষ্ট আন্দাজ পাওয়া যায়। টোকিও বিশ্বের জনাকীর্ণ মেগাপলিস (Megapolis)-এর একটি। কিন্তু নগর-পরিষেবা কি অসাধারণ এবং দক্ষ! শহরের কোথাও জঞ্জাল তো নেই-ই। ফুটপাতের পাশে টিউলিপ সহ রঙবেরঙের ফুল ফুটে আছে, অসম্ভব দৃষ্টিনন্দন। এমনিতেই মার্চ মাসের জাপান সাদা-গোলাপি চেরি ফুলে (ওদের ভাষায় 'সাকুরা') দুর্দান্ত সুন্দরী, তার উপর নগর পরিচালকদের তত্ত্বাবধানে ফুটপাতের পাশে ফুটে ওঠা রঙবেরঙের ফুল তাকে মোহময়ী করে তুলেছে। এরকম পরিচ্ছন্নতা ইউরোপের বা আমেরিকার শহরগুলিতেও দেখা যায়, তবে এক্ষেত্রেও মনে রাখা দরকার যে, টোকিও-র তুলনায় ইউরোপ-আমেরিকার শহরগুলির জনসংখ্যা কম। টোকিও বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক শহর তো বটেই, অন্যতম সুন্দর শহরের শিরোপাও সে দাবি করতে পারে।

আর শুধু রাজধানী টোকিও-ই নয়, জাপানের প্রতিটি শহরে এই পরিচ্ছন্নতা, এই সৌন্দর্য লক্ষ করেছি। এই সৌন্দর্যবোধ ওপর থেকে আরোপিত নয়, নগর-পরিচালকদের পছন্দমাফিক সৌন্দর্য নয়, এই সৌন্দর্যবোধ প্রতিটি জাপানির হৃদয় থেকে উৎসারিত। না হলে কোন দেশ এত সুন্দর হয়ে উঠতে পারে? কোনো রোমান্টিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে এই কথা লিখছি না, তৃণমূলস্তরে সৌন্দর্য ও রুচিবোধ না থাকলে কোন দেশ শিল্পে, বাণিজ্যে, বিত্তে, কর্মদক্ষতায় ও আচার ব্যবহারে এত সুন্দর হয়ে উঠতে পারে না। এই সৌন্দর্যবোধ রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে অভিভূত করেছিল। জাপানি বাগান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "বাগান জিনিসটা যে কী, তা এরা জানে; কতকগুলো কাঁকর ফেলে আর গাছ পুঁতে মাটির উপরে জিয়োমেট্রি কষাকেই যে বাগান করা বলে না, তা জাপানি বাগানে ঢুকলেই বোঝা যায়; জাপানি চোখ এবং হাত দুই-ই প্রকৃতির কাছ থেকে সৌন্দর্যের দীক্ষালাভ করেছে, যেমন ওরা দেখতে জানে তেমনি ওরা গড়তে জানে ..... জাপানের যে সৌন্দর্যবোধ সে তার একটা সাধনা, একটা প্রবল শক্তি" (জাপানযাত্রী)। এই জাপানি বাগানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন টোকিও-র রাজপ্রাসাদের পূর্বদিকের বাগানটি। আমি স্বপ্নে এরকম বাগান অনেক দেখেছি, — পায়ের পাতা ডুবে যাওয়া হাল্কা সবুজ ঘাসের মাঝে যেন আদিগন্ত ছড়িয়ে আছে সাদা-বেগুনি ফুলের আড্ডা, কোথাও জলের বুকে ঝুঁকে পড়েছে গোলাপি চেরি ফুল। ইতঃস্তত ছড়িয়ে থাকা ঝোপঝাড়ে খয়েরি-হলুদ-লাল ফিসফিস করে কথা বলছে আগন্তুকের সাথে, ঝলসানো সোনালি পাতারা খুশির নেশা জাগাচ্ছে প্রাণে, ধবধবে সাদা হাঁস উদ্ধত গ্রীবা তুলে বলছে, হে মানুষ দেখো আমরাও আছি এই পৃথিবীর বুকে, — স্বপ্নের সেই বাগান বাস্তব হলো টোকিও রেলস্টেশনের অদূরে, রাজপ্রাসাদে। মনে হলো, রবি ঠাকুরের উপলব্ধি কত গভীর, কত প্রাসঙ্গিক এবং কত সুদূরপ্রসারী!

জাপানি শিষ্টাচার ও কর্মদক্ষতার যুগপৎ উপলব্ধি প্রকাশ করে এই নিবন্ধ শেষ করবো। ২০০৮ সালের জুলাই মাসে স্লোভেনিয়ার রাজধানী লুবলিয়ানা থেকে চলেছি হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্ত-এর উদ্দেশ্যে। দীর্ঘ ১১ ঘন্টার এই রেলযাত্রার অনেকটা পথ আল্পসের (Alps) বুক চিরে। সকাল সাড়ে সাতটায় লুবলিয়ানা থেকে যখন ট্রেনে চড়েছি, তখন কামরায়

আমরা মাত্র দুজন যাত্রী, আমি এবং আর একজন ইউরোপীয়ান। ট্রেন যতই এগোতে থাকে, ধীরে ধীরে লোক বাড়তে থাকে। বুদাপেস্ত পৌঁছবার ঘন্টা তিনেক আগে আমার কুপেতে উঠল একটি জাপানি পরিবার, দাদু-দিদা, তাদের দুই কন্যা এবং ছোট নাতি-নাতনিরা। পরিবারে পুরুষ বলতে ষাটোর্ধ 'দাদু'-টি। ভদ্রলোক সবিনয়ে আমাকে বললেন যে আমি তাঁর সিটে বসে আছি। আমি তো অবাক, প্রায় আট ঘন্টা এই ট্রেনে আছি, এমনকি দুজন টিকিট চেকারও আমাকে একথা জানাননি। আমি আমার টিকিট বার করে ঐ জাপানি ভদ্রলোককে দেখালাম। উনি এবারও সবিনয়ে বললেন যে আমার সিট পাশের কুপেতে, সিট নম্বর একই হওয়ায় আমি কুপে ভুল করে ফেলেছি। আমি বুঝলাম যে ভুলটা আমারই এবং ট্রেন অপেক্ষাকৃত ফাঁকা থাকায় যাত্রার শুরুতে আমাকে অন্য যাত্রীরা বা টিকিট চেকার সৌজন্যবশত সে কথা বলেননি। এখন বুদাপেস্ত-এর কাছাকাছি এসে পড়ায় ট্রেন একদম ভর্তি এবং প্রতিটি যাত্রীরই উচিত তার নির্দিষ্ট স্থানে বসা। আমি ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার হাল্কা পিঠের ব্যাগটি নিয়ে পাশের কুপেতে আমার নির্দিষ্ট সিটে রেখে এলাম। আমার বড় এবং অত্যন্ত ভারী ট্রলি-ব্যাগটি নেবার জন্যে আগের কুপেতে ফিরে দেখি ষাটোর্ধ ৫ ফুট ৫ ইঞ্চির 'যুবক'-টি সেই ব্যাগ মাথায় করে নামিয়ে ফেলেছেন। আমি কিছুটা লজ্জায় এবং অনেকটা ভয়ে (যদি ব্যাগের ভারে বুড়ো ভদ্রলোক পড়ে যান) চেঁচিয়ে উঠে ওঁকে বললাম যে আমার লাগেজটি খুব ভারী এবং ওটি তৎক্ষণাৎ আমাকে দিয়ে দিতে। ভদ্রলোক হেসে মাথায় আমার লাগেজ নিয়ে বললেন 'চলুন আপনার কুপেটা দেখে আসি'। হতচকিত আমি ওঁকে অনুসরণ করলাম। পাশের কুপেতে গিয়ে উনি লাগেজটি বাঙ্কে তুলে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে বললেন, "No burden is too heavy for a Japanese". ইউরোপ ভ্রমণের বেশ কিছু অভিজ্ঞতা থেকে জানি, সহযাত্রীরা স্মিত হাসি ছাড়া আর কিছু দেবার জন্যে প্রস্তুত থাকেন না। এই জাপানি ভদ্রলোকের শিষ্টাচার শুধু যে ব্যতিক্রম তাই-ই নয় ওঁর এই শ্রমদান অভূতপূর্বও বটে। অপরের ভার লাঘব করার এই শিষ্টাচার যদি সবাই রপ্ত করতে পারতো, তবে কোনো বিপ্লব ছাড়াই বদলে যেতো পৃথিবীটা।

'পৃথিবী রুটির মত তোমার ঘুমের মধ্যে চলে আসে
তোমার তোলপাড় রাত পৃথিবী রুটির মত, পৃথিবীও রুটি...
কী ভীষণ ঘুম তুমি ঘুমাও! তোমার কোঁকড়ানো মুখ
স্বপ্নের বৃষ্টিতে ভিজছে—রুটি! রুটি! পৃথিবী!'

—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

''অনুসৃজিত কৃষ্ণভাবনা ও শ্রীচৈতন্যদেব''

জয়িতা দত্ত

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

জীবনযন্ত্রণার পথ বেয়ে মধ্যযুগ সচেতন হয়েছিল। আত্মসচেতন, সমাজসচেতন, আর তারই ফলশ্রুতিতে পাঠকসচেতন। এই সচেতনতার অনিবার্য পরিণামে জন্ম নিল বাংলা অনুবাদ। পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ায়। তুর্কী আক্রমণে গৌড় লক্ষ্মণাবতীর বিলয় এর মূলে। দীর্ঘলালিত ব্রাহ্মণ্য হিন্দুরাজত্বের আপাত অবসানের ধ্বংসছবি বুকে নিয়ে তখন স্তব্ধ পবনদূত, গীতগোবিন্দম্, আর্যাসপ্তশতী কিংবা সদুক্তিকর্ণামৃতমের সাংস্কৃতিক কৌলিন্য। বাধ্য হয়েই আশ্রয় গড়তে হল নতুন রাজশক্তির ছত্রছায়ায়। চোদ্দ শতকের মাঝামাঝি, ইলিয়াস শাহী আমল থেকে রাজনীতিতে স্থিতাবস্থা ফিরে আসতে লাগল। আর এরই অবকাশে হিন্দু সংস্কৃতি আর একবার মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইল। বুকের গভীরে ক্ষত, পরাজয়ের ইতিহাসের পাথুরে প্রমাণ আর মুখে পোষ্টাবন্দনার অভিনয়। লক্ষ্য বিধর্মী প্রশাসকের ছাড়পত্র লাভ। বিগত প্রলয়ের মাঝে খুইয়ে ফেলা সংস্কৃতি আর ধর্মীয় ঐতিহ্যকে মেলে ধরার ছাড়পত্র। সুযোগ মিলল। শাসকের অনুগ্রহে শুরু হল পুরাণ নির্ভর অনুবাদচর্চা। অবলম্বন বাল্মীকি আর ব্যাসদেব। আকর, রামায়ণ, মহাভারত আর শ্রীমদ্ভাগত। উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা। হিন্দু ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারকল্পে অতি সুকৌশলে লোকসাধারণকে পুরাণ শিক্ষিত করে তোলা। বিধর্মী শাসকের কাছে নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা। ভক্তিরস, কাব্যরস আর ইতিহাস রস — এই তিন বিষয়ে লোকমনোরঞ্জনের ব্যবস্থা হল 'অনুবাদ' মাধ্যমে।

কিন্তু একি ধরনের শিল্পরূপ? আর্য কাহিনীর ভাষান্তর, পাঠান্তর নাকি রূপান্তর। অনুকীর্তন, অনুসৃজন নাকি বিনির্মাণ। মহাকবিদের অপার্থিব নিরাসক্তির মর্মকোষে ফুটে ওঠা মহাকাব্যের, যুগোচিত অভিপ্রায়ের কাছে এ আসলে অসহায় আত্মসমর্পণ। ফলে 'নাম' মাত্র সম্বল করে মধ্যযুগীয় বাংলা পুরাণকেন্দ্রিক অনুবাদ চর্চায় পলকে পলকে বদলে গেল মূলের বিষয়গত বাঞ্জনা, চরিত্রকাঠামো, দেশ-কাল চিন্তা এবং ভাষাতাত্ত্বিক আবেদন। জীবন-জীবিকাগত বিপন্নতার মাঝে আত্মসর্পণের লৌকিক ভক্তিতে নিঃশেষিত হয়ে গেল পৌরাণিক সাহিত্য-ঐতিহ্যের ওজস্বিতা। ইহজাগতিক কামনা-বাসনার কাছে হার মানল জীবন-বিবিক্ত নিষ্কাম মুক্তিবাঞ্ছা।

আসলে অনুবাদে মূলের রঙ বদলায়। 'সব লেখা লুপ্ত হয় বারংবার লিখিবার তরে, নূতন কালের বর্ণে।' অনুবাদ তখন অনুসৃজনে রূপান্তরিত হয়। পুরোনো ফ্রেমে নতুন করে বোনা হয়ে যায় অতীতের নকশি কাঁথা। আর এই নতুন করে বোনার মূলে কাজ করে সমাজচিন্তা। সমকালকেন্দ্রিক মনন। দেশকালাতিক্রান্তি শাশ্বত প্রতিভা নয়, দেশকালানুগ মেধা। একটা প্রবল চেষ্টা, অক্লান্ত সাধনা আর স্বাজাত্যবোধ। অনুবাদকের ভূমিকা সেখানে দায়িত্বশীল অভিভাবকের। সন্তর্পণে পাঠকের হাত ধরে তাঁকে অতিক্রম করতে হবে পথ — 'উৎস' থেকে 'গন্তব্য'। মধ্যযুগীয় অনুবাদকেরাও একই প্রেরণায় পথ হেঁটেছিলেন। আর জীবন-অভিজ্ঞতার আলোয় যুগপাঠ করেছিলেন বলে অন্তর্লীন সমাজ সচেতনতাকে মুড়ে দিয়েছিলেন 'ভক্তি'র নিশ্ছিদ্র আবরণে।

'ভক্তি' হল 'চিত্তমাসৃণ্যব্যঞ্জক অবস্থা'। উপাস্যের কাছে উপাসকের নিবিড় আত্মসমর্পণ। কৃত্তিবাস-কাশীরাম মালাধরেও সমর্পণ ছিল। সমাজের মুখ চেয়েই তাঁদের শরণাকুতি। কিন্তু মোটাদাগের ঐহিক চাহিদার প্রাবল্যে তাতে মুক্তির সুর লাগেনি। মুক্তি নিয়ে এলেন শ্রীচৈতন্যদেব। কৃষ্ণনামে জগৎ ভাসালেন। যুগ যুগ ধরে ভক্তির কেন্দ্রে বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণকে নতুন পরিচয়পত্র দান করলেন। বদল ঘটালেন ঈশ্বর সন্নিধানের। 'ভক্তি' রূপান্তরিত হল 'প্রেমে'। অথচ অন্তঃসলিলার মত সেখানে কাজ করে গেছে সমাজচিন্তা। তাই এ রূপান্তর শুধু আধ্যাত্মিক নয়। শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণব মন্ত্রে প্রাচীন কৃষ্ণকেন্দ্রিক ভাগবতীয় পরম্পরার সঙ্গে মিশে গেছে প্রাক্-তুর্কীযুগ থেকে ভারতবর্ষে সমাগত সূফীভাবনা। তাঁদের মহব্বাহ্ আর মহিফাহ্। আবার শুধু সূফীভাবনাই নয়, সাম্প্রদায়িক ও ধর্মগত ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আর ঐক্যস্থাপনের প্রচেষ্টায় তিনি কৃষ্ণনামমাহাত্ম্যে শামিল করলেন মধ্যযুগের মরমীয়া সন্তসাধকদের মিলনবানী। ভক্তি এক মহাপ্লাবনের রূপ নিল। উপাস্য আর উপাসক যেখানে একাসনে — শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে।

প্রাচ্য ভক্তিধারায় উপাস্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের আধিপত্য অবিসংবাদী। বৈদিক বিষ্ণুর সঙ্গে প্রাক্-মহাভারতীয় কাল থেকে তিনি একাত্ম। রামচন্দ্র প্রমুখ চরিত্রও একসময় সেই কেন্দ্রগত ভক্তির সঙ্গে মিশে যায়। আসলে ত্রাতার ভূমিকাতেই এঁদের সমগোত্রলাভ। বিশেষত বিষ্ণু এবং কৃষ্ণ। এঁরা একে অপরের মধ্যে এমন নির্বিরোধে ঢুকে পড়েছেন যে, তাঁদের একান্ত আপন জমিটিই মধুর পারস্পরিকতায় বেদখল হয়েছে। রূপান্তরীকরণের এই প্রক্রিয়ায় বিষ্ণুর সংস্পর্শে কৃষ্ণের দেবায়ন ঘটেছে আর কৃষ্ণের ছোঁয়ায় বিষ্ণু 'মানুষ' হয়ে উঠেছেন। আবার এই দেবায়ন আর মনুষ্যায়নের আন্তর প্রক্রিয়ায় কোনো এক অজানা মুহূর্তে কৃষ্ণ হয়ে উঠেছেন অবতারবাদের বীক্ষণবিন্দু। দশাবতার রূপে আবির্ভূত। আবির্ভাবের এই পরম্পরাটি

চমৎকার। বৈদিক হবির্ধূম, মেঘমন্দ্র বিষ্ণু মন্ত্রোচ্চারণ, শত সহস্র যজ্ঞ প্রক্রিয়ার আড়ম্বর আস্তে আস্তে জায়গা করে দিল উপনিষদকের উদয় হলেন ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি। জ্ঞান, যোগ আর ধ্যানের সূক্ষ্ম পথে চলল নিষ্কাম কর্মসাধনা আর চিত্তশুদ্ধি। নিরাবয়ব আরাধনায় বৈচিত্র্য আনলেন পুরাণকারেরা। লীলা পুরুষোত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন কৃষ্ণ। ততদিনে ভারতবর্ষের পথে প্রান্তরে গুঞ্জরিত হচ্ছে আভীর যুবকের পরস্ত্রীবাসনা নিয়ে কৃষ্ণকেন্দ্রিক লোকগাথা। মাধবাচার্য আর নিম্বার্কও অচিরে উপস্থিত হতে চলেছেন ভক্তি সাধনার স্রোতপথে নতুন মাত্রা যোগ করতে। এরই মধ্যে আবার জয়দেব থেকে প্রাক্-চৈতন্য বৈষ্ণব পদাবলীতে লৌকিক প্রেমকাব্যের নায়করূপে কৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এই বিচিত্র রূপময়তার ভাণ্ডার কৃষ্ণকে নতুন করে চিনিয়ে দিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে কৃষ্ণ একাত্ম হয়ে গেলেন স্বয়ং চৈতন্যদেবের সঙ্গে। নতুন আকারে রচিত হল কৃষ্ণকথা। মূল ভাগবত বা অন্যান্য উৎস থেকে আহরিত কৃষ্ণকেন্দ্রিক সূক্তাবলী গৌড়ীয় দর্শনে সম্পূর্ণ অভিনবতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল। অনুবাদের সুদূরতম নিহিতার্থ যদি 'রূপান্তর' হয় তবে এই বিবর্তিত কৃষ্ণচরিত্রে তার চূড়ান্ত রসদ মিলবে।

অনূদিত হচ্ছেন কৃষ্ণ — যুগে যুগে, কালে কালে। শ্রীচৈতন্যদেবে তাঁর চরমোৎকর্ষ। বৈদিক বিষ্ণু বা বাসুদেব কৃষ্ণ এখানে পরমপুরুষ: জীবন আর জগতের রূপকার। তাঁরই কারণে শ্রীচৈতন্যদেবের অভূতপূর্ব বিরহদশা, রাধাতুল্য ভাববিকার — আবার তারই আচরণিক অভিব্যক্তি চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ স্বরূপে।

এই বিচিত্র অবস্থার দ্রষ্টা ছিলেন নবদ্বীপ আর নীলাচলের লীলাপরিকরেরা। তাঁদের সিদ্ধান্ত, মহাপ্রভু অন্তরঙ্গে কৃষ্ণ কিন্তু বহিরঙ্গে রাধা; তিনি 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতম্' কিন্তু 'নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্'। জন্ম নিল, অচিন্ত্যভেদাভেদদর্শন। উদ্‌ঘাটিত হল, বৃন্দাবনলীলা আর নবদ্বীপলীলায় কৃষ্ণের বিবিধ আত্মপ্রকাশের স্বরূপরহস্য; হ্লাদিনী শক্তির উৎস। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপে স্বীকৃত হলেন.

প্রেমবিতরণ, নামসঙ্কীর্তন আর লীলারস আস্বাদন — শ্রীচৈতন্যের কৃত্য এটাই। তাঁকে ঘিরে রচিত হতে লাগল অজস্র কাব্য, পদ ইত্যাদি। কেউ সংস্কৃতে, কেউ বাংলায়। আবার কখনো একভাষা থেকে ভাষান্তরে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের নামসঙ্কীর্তনকে নাম দিলেন 'বহিরঙ্গ' আর লীলারস আস্বাদনকে বোঝালেন 'অন্তরঙ্গ' বলে। বললেন,

প্রেম নাম প্রচারিতে এই অবতার।।
সত্য এই হেতু কিন্তু এহো বহিরঙ্গ।
আর এক হেতু শুন আছে অন্তরঙ্গ।।[১]

বাংলা থেকে এবার সংস্কৃতে চলে গেল 'অন্তরঙ্গ হেতু'র স্বরূপ নির্ধারণের ভার। স্বরূপ দামোদরের ভাষায় :

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশোবানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশোবামদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশংবেতিলোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভ সিন্ধৌহরীন্দুঃ।।[২]

অর্থাৎ রাধাপ্রেমের মহিমা কতখানি, সেই প্রেমের আলোয় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যের চমৎকারিত্ব কতটা আর সেই চমৎকারি মাধুর্য অনুভব করে রাধার আনন্দই বা কিরূপ — এই তিন বিষয়ে অপূর্ণ সাধ মেটাবার জন্য ভগবান কৃষ্ণ শচীগর্ভে আবির্ভূত হয়েছেন। বৈষ্ণব কবি প্রেমদাসের ব্যাখ্যা ধ্বনিত হল সেই একই কথা — কেবল ভাষান্তরে,

অতএব চৈতন্য রাধাকৃষ্ণ একরূপ।
স্বকিয় রূপভাব কহিয়ে স্বরূপ।।
দুইস্থানে সদা এই হয়েত বিহার।
উৎকণ্ঠা হউক তোমার তাহা পাইবার।
বৃন্দাবন কৃষ্ণলিলা সব নিত্য হয়।
নবদ্বিপে চৈতন্যলিলা নিত্য বিরাজময়।।
প্রধান পরিবার লিলার সদা হএ স্থিতি।
ভজনসিদ্ধি হইলে এককালে দুই প্রাপ্তি।।[৩]

চৈতন্যাবির্ভাবের অন্তরঙ্গ উৎসের পাশাপাশি আছে বহিরঙ্গ কারণ। নামসঙ্কীর্তনের মাধ্যমে হরিভক্তির সহজ স্রোতে ধর্মকে গ্লানিমুক্ত করা। আসুরিক অমিতাচার আর ব্যভিচারকে বিনাশ করা, বিপর্যস্ত মানবাত্মাকে সাম্যে, সঞ্জীবনে সংস্থাপিত করা।

নাম বিনা কলিকালে আর নাহি ধর্ম।
সর্বমন্ত্র সার নাম — এই শাস্ত্র মর্ম।।৪

আসলে যুগে যুগে অবতরণের প্রধানতম হেতুই হল ধর্মসংস্থাপন। সৃষ্টিরক্ষার স্বার্থেই ঘটে পরমপুরুষের অবতারগ্রহণের প্রয়োজন।

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।[৫]

পৌরাণিক নারদীয় সংহিতার মূল ভাষ্য-ও এটাই।

অভ্যার্চ্চয়িত্ব প্রতিমাসু বিষ্ণুং
দুষ্যন্ জনে সর্বগতং তমেব।
অভ্যর্চ্চ্য পাদৌ দ্বিজনস্য মূর্দ্ধি
দ্রুহ্য নিবাজ্ঞো নরকং প্রজাতি।।[৬]

চৈতন্যজীবনীগ্রন্থ 'চৈতন্যভাগবত'-এ দেশকালের রূপান্তরের মধ্যেও সেই একই বাণী উচ্চারিত হয় সমপ্রজ্ঞায় —

জাতিকুল ক্রিয়াধনে কিছু নাহি করে।
প্রেমধন আর্তি বিনে না পাই কৃষ্ণরে।।
যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।।
- - - - - - - - - - - - - -
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে।।৭

অভূতপূর্ব এই সামীপ্য। শুধু বিষয়ে আনুগত্যে নয়, এ সংযোগ জীবনদর্শনে।

আবার শুধু অপৌরুষেয় শ্রীমদ্ভাগবত বা প্রাচ্য পুরাণমালা নয়, ঈশ্বরের সন্ধান চলে অন্য কোনো ধর্মমূলে। হোক না সূফীভাবনা। কুর্-আন্-হাদীস উপদিষ্ট এই ধর্মবিধির মাঝে শ্রীচৈতন্যদেব হয়ত খুঁজে পান ঈশ্বর আর মানবের অভূতপূর্ব মরমীয়া প্রেম সম্পর্কের হদিশ। 'সূফী' শব্দ আরবী 'সফা' থেকে এসেছে। যিনি কায়মনোবাক্যে পবিত্র তিনিই সূফী। এর আরেক অর্থ 'অকপটতা'। এ হিসেবে বাহ্যিক আচারানুষ্ঠান অপেক্ষা আন্তরিক পবিত্রতা আর অকপটতার সাধকই সূফী। অনেকের মতে, হজরত মুহাম্মত (সঃ)-এর অতি নিকটবর্তী বিশিষ্ট সাহাবাদের বলা হত 'আহল্-ই-সুফ্ফা'। যাঁরা মদিনায় মসজিদে ইবাদৎ উপাসনায় মশগুল, আল্লার সঙ্গে নিকট-সম্পর্ক স্থাপনে যাঁরা অভিলাষী সূফী তাঁরাই। ঈশ্বরের সঙ্গে আপন একাগ্রতার মিস্টিক উপলব্ধির কথা এরাই প্রচার করেছিলেন। তাঁদের ক্ষেত্রে যা ছিল ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনানন্দময় অনুভবের অভিব্যক্তি, ভক্তসাধারণের কাছে তা অনিবার্য কাব্যলক্ষণরূপে ধরা দিয়েছিল। সূফী সাধক মুয়ীনুদ্দিন চিশ্তির পদ —

খবাহী কিশ্ রুখ্শে বীনীদর চিহ্রহ্ ইমন্ ব নিগর।
মন্ আয়নহ-ই-উয়ম উ নীস্ত্ জুদা আয়সন্।।[৮]

তুমি তার (খোদার) মুখ দেখতে ইচ্ছা কর, আমার চেহারার দিকে তাকাও, আমি তাহার দর্পণ, সে আমা হতে পৃথক নহে।

একইভাবে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ শ্রীচৈতন্যদেবের মহাভাবুকরূপ ভক্ত দেখেছে। ঈশ্বরের খোঁজে বাহ্যজ্ঞানহারা প্রভুর আপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেই প্রকাশ পেয়েছে সেই অতীন্দ্রিয় প্রেমস্বরূপ--

নয়নং গলদশ্রুধরয়া
বদনং গদ্গাদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি।[৯]

ভক্ত বৈষ্ণব প্রত্যক্ষ করেছে সেই অতুলনীয় কৃষ্ণ প্রেমাস্বাদন, আর প্রার্থনা করেছে তার স্পর্শসুখ—

বিপুল পুলককুল আকুল কলেবর
গরগর অন্তরে প্রেম ভরে।
লহু লহু হাসনি গদগদ ভাষণি
কদ মন্দাকিনী নয়নে ঝরে।।
নিজরসে নাচত নয়ন ঢুলায়ত
গাওত কতকত ভকতহি মেলি
যো রসে ভাসি অবশ মহিমণ্ডল
গোবিন্দদাস তহি পরশ না ভেলি।।১০

মন্মহাপ্রভু উজ্জ্বলরস দান করতে এসেছেন। ধর্মের গ্লানিমুক্তি আর সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে শিকড়সমেত ওপড়ানোর দায়ভার কাঁধে নিয়েছেন তিনি। ফলে নিজেকে প্লাবিত করার মন্ত্র যেখানে পেয়েছেন সেখান থেকেই গ্রহণ করেছেন সে আলোকবর্তিকা। সূফী ভাবধারার পাশাপাশি মধ্যযুগীয় মরমীয়া সাধকদের দ্বারা প্রভাবিত হবার পেছনেও এই সমাজচিন্তারই খেলা। প্রাক্ চৈতন্যীয় মধ্যযুগে ভারতবর্ষে মানবপ্রীতির সাধনমন্ত্র প্রচার করেছিলেন এই মরমীয়া সাধকেরা। নামদেব, রামানন্দ, কবীর, পাত্তনাড়ুপিল্লে প্রমুখ। গভীর অধ্যাত্মবোধের কেন্দ্রে বসে প্রচলিত ধর্ম আর আচার-সর্বস্বতার বিরুদ্ধে এঁরা বিদ্রোহ করেছিলেন। যেমন, কবীরের কথা :

জৌর খুদাই মসীত বশত হৈ ঔর মূলিক কিসকেরা।
তীরথ মূরতি রাম নিবাসা দহুঁ, মৈ কিন হুঁণ হেরা।।
পূরিব দিশা হরী কা বাসা পছিম অলহ মুকাশ।
দিলহী খোজি দিলৈ দিল ভীতরি ইহারাম রহিমানা।।[১১]

খোদা যদি মসজিদেই বসবাস করেন, তাহলে আর সব মুলুক কার? তীর্থে মূর্তিতে রামের আবাস, এই দ্বৈতভাবের মধ্যে সত্য কোথায়? পূর্বদিকে হরির বাস, পশ্চিমে আল্লার মোকাম; খুঁজে দেখো হৃদয়ের মধ্যেই রাম-রহিম বিরাজমান।

গুরু রামানন্দ জানালেন— "কেন আর ভাই মন্দিরে যাইতে আমায় ডাক, তিনি বিশ্বব্যাপী, আমার হৃদয়-মন্দিরেই তাঁর দেখা পাইয়াছি।"[১২]

আর শ্রীচৈতন্যদেব বললেন,

মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয়ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া।।
অন্তর নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমার করিবেন উদ্ধার।।[১৩]

বললেন,—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্ণাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্ণো বনস্থো যতির্বা।।

কিন্তু প্রোদ্দ্যন্নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধে।
গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দা সদাসানুদাসঃ।।[২৪]
ঐক্যসংস্থাপনের এই সুর খুঁজব কার মধ্যে — সূফী, মরমীয়া নাকি শ্রীমদ্ভাগত! কারণ ভাগবতও যে বলে—
বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিত সমদর্শিনঃ।।[২৫]

মোদ্দা কথা একই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থী, সন্ন্যাসী — 'আমি' কেউ নই। 'আমি' শুধু নিখিল পরমানন্দ পরিপূর্ণ অমৃতসাগরস্বরূপ গোপীপতি শ্রীকৃষ্ণ চরণ কমলের দাসানুদাস। বিশেষ রূপের আশ্রয় ছেড়ে শ্রীকৃষ্ণকেন্দ্রিক ভক্তির সামান্যীকরণ ঘটেছে। ধর্ম সমাজ সংযুক্ত হয়ে রসের মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই সে বাঁধন হারা। শ্রীচৈতন্যদেবের হাত ধরেই পৌরাণিক কৃষ্ণ-স্বরূপের এই রূপে রূপান্তরে আত্মপ্রকাশ।।

সহায়ক গ্রন্থ :

১। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৪।
২। তদেব, মঙ্গলাচরণ অংশ।
৩। ভক্তিরসকোমুদী — প্রেমদাস।
৪। চৈতন্যচরিতামৃত (আদি : ৭/৭৪)।
৫। শ্রীমদ্ভাগত ৪/৮।
৬। চৈতন্যভাগবত/মধ্যখণ্ডে উদ্ধৃত।
৭। চৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড।
৮। হাজী মুঃ সইদ-এর ফরমায়েশী সংস্করণ, পঙক্তি-১৫।
৯। শিক্ষাষ্টক, ৮ম শ্লোক।
১০। বৈষ্ণবপদ সঞ্চয়ন / গোবিন্দদাস, ২য় পদ।
১১। মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ ঃ অরবিন্দ পোদ্দার।
১২। ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার ধারা : ক্ষিতিমোহন সেন।
১৩। চৈতন্যচারতামৃত / মধ্যলীলা, ১৬শ পারিচ্ছেদ।
১৪। তদেব।
১৫। মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ : অরবিন্দ পোদ্দার।

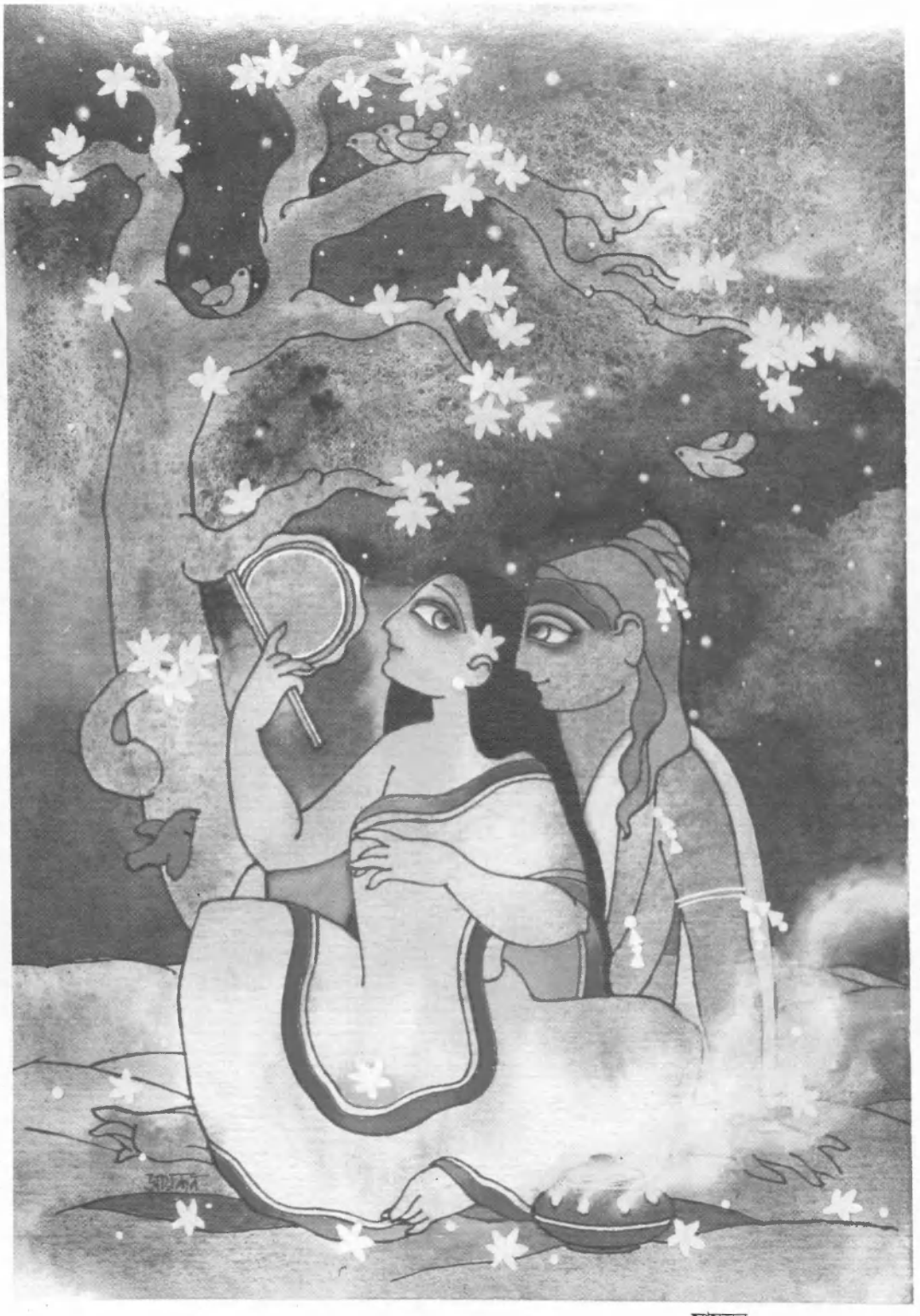

সায়ন্তন
তৃতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

আয়ুর্বেদ, অ্যালোপ্যাথি, মধুসূদন গুপ্ত এবং এদেশে প্রথম শব ব্যবচ্ছেদ

ড. দীপঙ্কর ভট্টাচার্য
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

উনিশ শতকের তখন পা-টলমলে শৈশব। কদিন পর যে 'ভদ্রজন' বৃত্ত ক্রমশ বিস্তৃত হবে তবে উষ্ণ আলোয়, সেই বৃত্ত থেকেও যোজন কয়েকদূরে আমাদের অধ্যেয়ভূমি। গ্রামের নাম বৈদ্যবাটি হলেও এই ভূমিখণ্ড আসলে শেওড়াফুলি সংলগ্ন। হুগলী জেলার শেওড়াফুলি রেলস্টেশনের পশ্চিম দিকে বৈদ্যবাটি খাল পেরিয়ে আরও পশ্চিমে বৈদ্যপাড়া।

বৈদ্যপাড়ার গুপ্তবাড়িতে ১৮০৬-এ বেজে উঠল মঙ্গল শঙ্খ। বলরাম গুপ্ত জনক হয়েছেন পুত্র সন্তানের। পুত্রের নাম রাখা হল মধুসূদন। শিশু মধুসূদন বেড়ে উঠছেন — আনন্দে, আদরে। কিন্তু বিপত্তি শুরু একটু বড় হতেই। পড়াশোনায় মন নেই তাঁর। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ কৃতবিদ্য পুরুষ। ধন্বন্তরী কবিরাজ হিসেবে একডাকে সকলে চেনে তাঁদের। সেই বংশের ছেলের কিনা এমন মতি! শেষ পর্যন্ত কি অমানুষ হয়ে বংশে কলঙ্ক-লেপ্টকে দেবে? পিতা বলরাম শাসন শুরু করলেন। একদিন বোধহয়, কিঞ্চিৎ চড়া হয়ে গিয়েছিল শাসনের মাত্রা। মধুসূদন পালালেন বাড়ি ছেড়ে। চলে এলেন কলকাতায়। তখন বয়স কত তাঁর? প্রায়-দুর্লভ তাঁর জীবনকাহিনীতে এই পর্বটি বেশ অস্পষ্ট। শুধু জানা যাচ্ছে, মধুসূদন তখন কিশোর। কলকাতায় এসে কয়েকবছর তিনি কী করছেন, কোথায় থাকছেন, সে সবেরও হদিশ সহজলভ্য নয়।

সমসাময়িক ঘটনা, কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য নেড়েচেড়ে জানা যাচ্ছে, বাড়ি ছাড়ার সময় তাঁর বয়স চোদ্দ থেকে ষোল র মধ্যে। তাঁকে ফের যখন প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে, তখন তাঁর বয়স বছর আঠারো। সেটা ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দ। রামমোহনের যুক্তিবাদী দীপ্তি তখন কলকাতার বলয়ে-বলয়ে। বালক বিদ্যাসাগর বীরসিংহে শৈশব যাপন করছেন। যুক্তি ও জ্ঞানের প্রভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠছেন ডিরোজিও। বৌবাজার এলাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে শুরু হয়েছে 'কলিকাতা' সংস্কৃত কলেজ'-এর পঠন-পাঠন। সে কলেজের ছাত্র বৈদ্যপাড়ার গুপ্তবাড়ির ছেলেটি।

বছর দুয়েকের মাথায় ১৮২৬-এর ১ মে ভাড়া বাড়ি ছেড়ে সংস্কৃত কলেজ নিজস্ব ভবনে চলে এল। আর নতুন ভবনে আসতেই কলেজের বৈদ্য ছাত্ররা দাবি জানালেন একটি বৈদ্যক শ্রেণী চালু করার। বঙ্গ জাগরণের তখন প্রভাত-বেলা। হিন্দু কলেজে যোগ দিয়েছেন ডিরোজিও। প্রভাত-সূর্যের স্পর্শে একে-একে খুলে যাচ্ছে বন্ধ-অন্ধ দরজাগুলি। দেশীয় ছাত্রদের সেদিনের দাবি সাগ্রহে পূরণ করতে এগিয়ে এলেন, জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের তদানীন্তন সভাপতি ড. হোরেস উইলসন এবং দ্য নেটিভ মেডিক্যাল ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক ডা. জন টাইটলার। পরের বছর, ১৮২৭-এই চালু হল সংস্কৃত কলেজ আয়ুর্বেদ বিভাগ — 'Medical class in the Sanskrit College'। যে সাতজন ছাত্র নিয়ে আয়ুর্বেদ বিভাগ চালু হল, তাঁদের মধ্যে মধুসূদনও ছিলেন। শুধু ছিলেন না, ক্রমে তিনিই অন্যসব ছাত্রকে ছাপিয়ে উজ্জ্বলতম হয়ে উঠলেন। আয়ুর্বেদ শিক্ষকের প্রধান পণ্ডিত ক্ষুদিরাম বিশারদও অবাক হয়ে গেলেন এই ছাত্রের অধ্যবসায় এবং পারদর্শিতায়। শরীরস্থানবিদ্যা বা অ্যানাটমিতে তাঁর আশ্চর্য আগ্রহও নজর কাড়ল প্রধান পণ্ডিতের। মাত্র তিন বছরেই বিশিষ্ট হয়ে উঠলেন মধুসূদন, সংস্কৃত কলেজের আয়ুর্বেদ বিভাগ থেকে বাইরের আয়ুর্বেদ মহলেও তিনি তখন সুবিদিত। এই সময় ১৮৩০-এর এপ্রিলে ক্ষুদিরাম বিশারদ অসুস্থ হয়ে শিক্ষকতা থেকে অব্যাহতি নিলে স্বয়ং মধুসূদনকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। এই ঘটনায় তোলপাড় শুরু হল কলেজে। 'সমাচার দর্পণ' জানাচ্ছে — মধুসূদনের সমধ্যায়ীগণ কলেজ ত্যাগ করবেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল অধ্যাপক এবং ছাত্রের একই বিদ্যে। এতে পঠন-পাঠন চলতে পারে না। কর্তৃপক্ষ কিন্তু সিদ্ধান্ত বদল করলেন না। মধুসূদনও মেধা ও দৃঢ়তায় অচিরেই সফল হলেন শিক্ষক হিসেবে।

১৮৩৫-এ জানুয়ারিতে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক শ্রেণীর বিলুপ্তি ঘটে গেল একই সঙ্গে। কিন্তু মধুসূদন রয়ে গেলেন স্বমহিমায়। ডা. ব্রামলি, ডা. গুডিভ-এর মতো সাহেবের সঙ্গে তাঁকেও শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করল মেডিক্যাল কলেজ, যদিও অ্যালোপাথিক চিকিৎসক হিসেবে কোন প্রথাগত ডিগ্রি তাঁর ছিল না (শিক্ষকতা করতে করতেই ১৮৪০-এ পরীক্ষা দিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি এই ডিগ্রি লাভ করেন)। শরীরস্থানবিদ্যায় তাঁর অসাধারণ পারঙ্গমতা সাহেবদের কাছেও সুবিদিত ছিল। বাংলা সাহিত্যের পাঠকেরা স্মরণ করতে পারেন আর এক আয়ুর্বেদ চিকিৎসক জীবনমশায়কে। 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসে যে জীবন দত্তকে তারাশঙ্কর নির্মাণ করেছেন, তিনিও তো শরীরস্থান বিদ্যায় দক্ষ ছিলেন, না হলে কী করে অভ্রান্ত হয় তাঁর নাড়ীজ্ঞান? একদা অ্যালোপাথি পড়তে আসা জীবনমশায় ঘটনাচক্রে সে পাঠ বর্জন করলেও রঙলাল ডাক্তারের কাছে অ্যানাটমি শিখতে চেয়েছিলেন হাতে কলমে। রঙলাল কবরস্থানের মাটি খুঁড়ে শবদেহ নিয়ে আসতেন। তাঁর বাংলোর পিছনে কাচের ঘরে সেই দেহ কেটে অ্যানাটমি চর্চা করতেন

একা। তাকে সবাই বলতো তান্ত্রিক। তাঁর কাছেই কবিরাজ জীবনমশায় ডাক্তারি শিখতে চাইলেন। 'জীবন দত্ত প্রথম দিন মড়া কেটেছিলেন কিন্তু তার প্রতিক্রিয়ায় রাত্রে খাওয়ার পর বমি করে ফেলেছিলেন।' এরপর রঙলালের কাচের ঘরে আর ডিসেকশন করেননি তিনি। উপন্যাসের ফ্রেমে জীবনমশায়াকে আমরা দেখছি, 'উনিশ শো পঞ্চাশ সাল — বাংলা তের শো ছাপ্পান্ন সালের এক শ্রাবণ-অপরাহ্নে .....।' তখন তিনি সত্তর বছরের প্রবীণ। তাঁর শবদেহ কাটার অভিজ্ঞতা প্রথম যৌবনের, অর্থাৎ আরও পঞ্চাশ বছর বাদ দিলে আরোগ্য নিকেতন উপন্যাসে চিত্রিত শব ব্যবচ্ছেদের ঘটনা উনিশ শতকের শেষ পর্ব বা বিশ শতকের সূচনার। তাঁর সঙ্গে মধুসূদনের সে অর্থে কোনও মিলও নেই। সময়, ভাবনা, প্রেক্ষিত সবই আলাদা। তবু কোথায় যেন একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় দুই শতকের দুই পুরুষের।

১৮৩৫-এর ১৭ মার্চ মধুসূদন শারীরবিদ্যা ও শল্যবিদ্যা বিভাগের ডেমনস্ট্রেটর হিসেবে যোগ দিলেন মেডিক্যাল কলেজে।

রামমোহন, ডিরোজিও, ডেভিড হেয়ার, উইলসন প্রমুখের উপস্থিতি তখন বাংলায় যুক্তিবাদের বহতা এনেছে। মধুসূদনও সেই স্রোতেই সঞ্চারিত হলেন। এদেশীয় চিকিৎসকদের সামনে তখন সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল শব ব্যবচ্ছেদ ঘিরে। মানুষের চিকিৎসা করতে হয় চিকিৎকদের। মানবদেহের অভ্যন্তর দর্শন বা শব ব্যবচ্ছেদ তাই খুবই জরুরি। কিন্তু সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের একটা বড় অংশ শব ব্যবচ্ছেদের বিরোধী। পশুদেহ ব্যবচ্ছেদ করে তখন যে চিকিৎসা-শিক্ষার প্রচলন ছিল তা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না মধুসূদন। সহ শিক্ষকগণ ও তাঁকে সমর্থন করছিলেন। সমাজ মানতে পারছিল না কিছুতেই। শারীরবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ডা. এইচ. এইচ. গুডিভ সাহেব শেষ পর্যন্ত উদ্যোগ নিলেন। ভেঙে দিতেই হবে এই কুসংস্কার। একদিন পড়ানোর টেবিলে একটি শবদেহ রেখে ডা. গুডিভ শব ব্যবচ্ছেদের গুরুত্ব বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন।

মেডিক্যাল ছাত্র, শিক্ষক — যাঁদের মনে কিঞ্চিৎ দ্বিধা ছিল, তাঁদের জড়তা কাটাতে বিশেষ কাজে দিল তাঁর এই উদ্যোগ। তবু একটা বাধা যেন জড়িয়ে যাচ্ছিল মনে মনে। সেটাই ছিঁড়ে দিলেন মধুসূদন এক শীতের সকালে, ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে সে এক স্মরণীয় সকাল। ১৮৩৬ সালের ১০ জানুয়ারি ছুরি হাতে মধুসূদন যেন তাঁর পূর্বপুরুষের অধীত বিদ্যার স্বপ্নছোঁয়া উত্তরসূরী হয়ে উঠলেন। করলেন প্রথম শব ব্যবচ্ছেদ।

কী ঘটেছিল সেদিন! কাউন্সিল অব এডুকেশনের তৎকালীন সভাপতি এবং বড়লাটের আইন-সচিব ড্রিংক ওয়াটার বেথুন তা বর্ণনা করেছেন (রিভিউ অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন ইন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ১৮৩৫-১৮৫১)। অরুণকুমার চক্রবর্তী 'চিকিৎসা বিজ্ঞানে বাঙালী' গ্রন্থে সেই বর্ণনার বঙ্গানুবাদ করেছেন এইভাবে — 'নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে ছুরি হাতে মধুসূদন ডা. গুডিভকে অনুসরণ করে সেই গুদাম ঘরে প্রবেশ করলেন, যেখানে একটি মৃতদেহ রক্ষিত আছে। অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে প্রবল কৌতূহল ও উত্তেজনা। তারা গুদামঘরের বাইরে জড় হয়েছে। যেখানে একটি ভয়াবহ ঘটনা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, সেখানে প্রবেশ করার সাহস নেই, অথচ অনুষ্ঠানের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা লাভ করার আগ্রহও প্রচুর। কয়েকজন দাঁড়িয়েছে দরজার সামনে, কয়েকজন দেখছে ঝিলমিলের ফাঁক দিয়ে। মধুসূদন শক্ত হাতে ছুরিটি ধরলেন মৃতদেহের বুকের উপর। ছাত্ররা এক ভয়াবহ দৃশ্যের কল্পনা করে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে। দৃঢ়ভাবে মধুসূদন ছুরিটি চালিয়ে দিলেন শরীরের ভিতর। অপেক্ষমান ছাত্ররা এতক্ষণে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, যেন এক দুঃসহ উৎকণ্ঠা থেকে তারা অব্যাহতি পেল।' (বিজ্ঞানসাধক পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত, ডা. শঙ্করকুমার নাথ, গণশক্তি, শারদ ২০০৬ থেকে উদ্ধৃত)।

এদেশে এই প্রথম শব ব্যবচ্ছেদ। হুগলীর বৈদ্যপাড়ার এক বাঙালী এই ইতিহাস সৃষ্টি করলেন মেডিক্যাল কলেজে। কুসংস্কারে বিরুদ্ধেও চালালেন তীক্ষ্ণ ছুরি। কিন্তু উচ্চবর্ণ হিন্দুরা এঘটনায় ক্ষেপে উঠলেন। জাত-ধর্ম না-জানা মৃতদেহ ছোঁয়া এবং কাটাকুটির জন্য তাঁকে জাতিচ্যুত পর্যন্ত হতে হল। কিন্তু দমলেন না মধুসূদন। 'নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দ শব-ব্যবচ্ছেদকারী ছাত্রগণকে রীতিমত উৎসাহ দিয়া এই নব প্রতিষ্ঠিত কলেজকে (মেডিক্যাল কলেজ) সবল করিতে লাগিলেন।' বলে উল্লেখ করেছেন শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' গ্রন্থে। ক্রমে গোঁড়া সমাজপতিরা পিছু হঠতে লাগলেন। সমসময়ে কলকাতা জুড়ে শুরু হল আরও নানা আলোড়ন। উল্লেখ করতে হয়— ১৮৩৬-এ স্থাপিত কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির কথা। ডিরোজিও-র শিষ্যদল লাইব্রেরী ভরিয়ে তুললেন। গড়ে উঠল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি। ১৮৩৯-এর ১৪ জুন মহামতি হেয়ার সাহেবের উদ্যোগে তৈরি হল বাঙ্গালা পাঠশালা। আর এদেশীয় মানুষকে শ্রমজাত শিল্প শিক্ষা দেওয়ার জন্য তৈরি হল মেকানিকাল ইনস্টিটিউট। গোঁড়া সমাজপতিদের বাক্যবাণ ধাক্কা খেতে খেতে প্রত্যস্ত হতে লাগল।

১৮১৪-১৫ রামমোহন রায়ের কলকাতা আগমন থেকে যে যুক্তিবাদী চেতনা ক্রমশ দানা বাঁধছিল, ১৮১৭-র হিন্দু কলেজ, ১৮২৪-এর সংস্কৃত কলেজ, ১৮৩৫-এর মেডিক্যাল কলেজে, তা সবল সপ্রাণ হয়ে উঠল। সমসাময়িক এই চেতনা তাড়িত করেছিল হুগলীর গুপ্ত বংশের সন্তানটিকেও। কিছু ভারত-বান্ধব ইংরেজকেও সহযোদ্ধা হিসেবে পেয়েছিলেন মধুসূদন। ১৮৩৬-এর ২৮ অক্টোবর তাঁর অনুপ্রেরণায় মেডিক্যাল কলেজের চার সাহসী ছাত্র রাজকৃষ্ণ দে, দ্বারিকানাথ গুপ্ত, উমাচরণ শেঠ এবং নবীনচন্দ্র মিত্র এগিয়ে এলেন শব ব্যবচ্ছেদে এরপর আর পা সোজা করে দাঁড়াতে পারেনি কুসংস্কার। তথ্য বলছে, পরের বছর, ১৮৩৭-এ ষাটটি মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করা হয়। আর ১৮৩৮-এ প্রায় দ্বিগুণ। আজ এসব গল্পকথার

মতো শোনালেও সেদিন মধুসূদন গুপ্ত এগিয়ে না এলে বাংলায় চিকিৎসা বিজ্ঞান চর্চা এগোতে পারত না কিছুতেই। শুধু তো ব্যবচ্ছেদ নয়, একদা বাড়ি থেকে পালানো এই মানুষটিই মাত্র পঞ্চাশ বছরের জীবদ্দশায় (মৃত্যু ১৮৫৬ খ্রি. ১৫ নভেম্বর) বাংলা ভাষায় 'লণ্ডন ফার্মাকোপিয়া' এবং 'অ্যানাটমিস্ট ভেদিনেকাম'-এর অনুবাদ করেন। লেখেন অ্যানাটমি নামে গ্রন্থ। সম্পাদনা করেন 'সুশ্রুত'। আজ মনে হয়, ২০০ বছর আগে বৈদ্যবাটির কিশোর মধুসূদনের বাড়ি ছাড়ার সঙ্গেই বোধহয় লগ্ন হয়েছিল এদেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভবিষ্য যাত্রা।

ঋণ স্বীকার ঃ

১. স্মরণে মননে মধুসূদন গুপ্ত। সম্পাদনা : সুবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়। অ্যানাটমিক্যাল সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া। প. বঙ্গ শাখা, নভেম্বর ২০০৬।
২. বিজ্ঞান সাধক পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত। ডা. শঙ্করকুমার নাথ; গণশক্তি, শারদ সংখ্যা, ২০০৬।
৩. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। শিবনাথ শাস্ত্রী। সম্পাদনা : বারিদবরণ ঘোষ। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি. জানু. ২০০৭।
৪. করুণাসাগর বিদ্যাসাগর। ইন্দ্রমিত্র। আনন্দ। অক্টোবর ২০০৭।
৫. আরোগ্য নিকেতন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশ ভবন। পৌষ ১৩৯৭।

মানুষের সঙ্গে দেখাদেখি বন্ধ হলে কবিতা লিখবে কিভাবে?
হাবেভাবে সবাইকে জানাও, ওরা আছে তুমিও রয়েছো,
গাছপালা বনবুনহকের মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদেরও মর্যাদা আছে
ভালোবাসা আছে—

—প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

সিমন দ্য বোভোয়া : নারী-মুক্তি আন্দোলনের অনন্য এক ঋত্বিক

মঞ্জুশ্রী মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

আধুনিক নারীবাদীদের বীজগ্রন্থ 'The Second Sex' গ্রন্থের রচয়িতা অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন সিমন দ্য বোভোয়ার (১৯০৮-১৯৮৬) হলেন বিংশ শতাব্দীর একজন উল্লেখযোগ্য ফরাসী লেখিকা এবং নারীবাদী দার্শনিক। অসামান্য সমালোচনী শক্তিসম্পনন চিন্তাবিদরূপে নারীবাদীদর্শন, সাহিত্য এবং সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আধুনিক চিন্তার বিকাশে সারা পৃথিবীব্যাপী তাঁর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব লক্ষণীয়। যুদ্ধোত্তর ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের একজন প্রধান প্রতিনিধিরূপে existentialism-এর দার্শনিক আন্দোলনের সামিল হয়েছিলেন। যুদ্ধ-পরবর্তী atheistic existentialism --- বিশেষত, এর সহযোগী সার্ত্রের 'Being and Nothingness' (১৯৪৩)-এর ধারণার সঙ্গে ethics-এর সম্বন্ধ বন্ধনের বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

বোভোয়ার প্যারিসের রক্ষণশীল বুর্জোয়া পরিবারে ৯ জানুয়ারী, ১৯০৮-এ জন্মগ্রহণ করেন। বোভোয়ারের অজানা ছিল না যে, তাঁর বাবা দুই কন্যার পরিবর্তে একটি পুত্রসন্তান আশা করেছিলেন; তবে তিনি বোভোয়ারের মেধার স্বীকৃতি দিয়ে বলেছিলেন, তাঁর মেধা পুরুষের মতোই এবং কৈশোরক পর্যায় থেকেই তিনি স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত ছাত্রীরূপে মর্যাদালাভ করেন। পনের বছর বয়স থেকেই এক খ্যাতনামা লেখক হবার দৃঢ় প্রত্যয়ে স্থিত হন। শুরুর দিকে তাঁর পড়াশুনো ছিল গণিত ও দর্শন বিষয়ে; ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গণিত ও ভাষা-সাহিত্য শিক্ষা গ্রহণ করেন। তবে দর্শনে বিশেষ আগ্রহ থাকায় প্যারিস ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যুক্ত প্যারিসেরই বিখ্যাত উচ্চশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান Sorbonne College-এ দর্শনের পাঠ নিতে যান ১৯২৯-এ; ২১ বছর বয়সেই তিনি দর্শনে উল্লেখযোগ্য ব্যুৎপত্তির পরিচয় রাখেন। তাই কলেজেই তিনি সার্ত্রেসহ আরো সঙ্গীদের মেধাবী সান্নিধ্য লাভ করেন এবং এঁদের উপস্থিতিতে এক বিশেষ দার্শনিক পরিমণ্ডল তাঁর জীবনবীক্ষাকে বিশিষ্টতা দান করে। এই সময় থেকে ব্যক্তিগত ও বৌদ্ধিক স্তরে জাঁ পল সার্ত্রের সঙ্গে আজীবন বন্ধুতায় আবদ্ধ হন। উল্লেখ্য, পরীক্ষার প্রথম ধাপে সার্ত্রে অনুত্তীর্ণ হলেও শেষ ধাপে এসে বয়সে বড় সার্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং বোভোয়ার হন দ্বিতীয়।

রক্ষণশীল বুর্জোয়া পরিবারের জন্মলাভের সূত্রে অল্প বয়স থেকেই পিতা-মাতার সঙ্গে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শগত চিন্তাভাবনার সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে, ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধের ধারণা বোভোয়ারের মধ্যে শিকড় গাড়তে পারেনি; তখন থেকেই তিনি হয়ে উঠেছেন বিপ্লবাত্মক মননের অধিকারী। এই সংঘাত থেকেই তাঁর মধ্যে উত্থিত হয়েছে আদর্শবাদ এবং অস্তিত্বধারণার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রয়াস। এরই সূত্রে তাঁর মধ্যে আমাদের সত্তা পরিচয় এবং পৃথিবী ও সেইসঙ্গে অপরাপর মানুষের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের অবয়ব নির্মাণ সম্বন্ধে তীব্র সচেতনতা জেগে উঠেছিল। কলেজে পড়াকালীন প্লেটো, কান্ট, শোপেনহাওয়ার, নীৎসে, বের্গস প্রমুখের দর্শনচিন্তা সম্বন্ধে পঠন-পাঠন তাঁর দার্শনিক চিন্তাকে প্রসারিত করেছিল। কিন্তু তখনকার সময়ে ফ্রান্সে হেগেল ও মার্ক্সের দর্শন পাঠক্রমে না থাকলেও বোভোয়ার নানাভাবে এঁদের সঙ্গে পরিচিত হবার সূত্রে এঁদের দর্শনভাবনায় উদ্দীপিত হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে ১৯৩০-এ মার্ক্সবাদ এবং Socialist আন্দোলনের দ্বিধাবিভক্তি থেকে উত্থিত 'Party Communiste Franais' দলটি ফরাসী সমাজে এবং বোভোয়ার-সহ বহু মানুষের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তিরূপে বিকাশ লাভ করে। বোভোয়ার হেগেল ও মার্ক্স সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ব্যক্ত করতে থাকেন। এদিকে শিক্ষান্তে নানা সেকেণ্ডারী স্কুলে দর্শনের শিক্ষকতা চলতে থাকে। ১৯৪৩-এ প্রথম উপন্যাস 'She came to stay' প্রকাশিত হয়, ক্রমে তিনি পূর্ণ সময়ের লেখক হিসেবে আত্মনিয়োগ করেন। সার্ত্রের সঙ্গে বোভোয়ার তাঁদের দর্শন, উপন্যাস ও নাটকের মধ্যে দিয়ে ফরাসী atheistic existentialism-এর এবং বিশ শতকের প্রভাবশালী সাহিত্যিক, দার্শনিক ও নান্দনিক আন্দোলনের অগ্রণী ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। ১৯৪৫-এ তাঁরা 'Les Temps Modernes' নামে অরাজনৈতিক সাহিত্যপত্র প্রকাশের মধ্যে দিয়ে চল্লিশ ও পঞ্চাশের বুদ্ধিজীবী মহলে নানা আলোড়ন সৃষ্টি করতে থাকেন। এর মধ্যে ভ্রমণ --- বিশেষত আমেরিকা-ভ্রমণের সংস্পর্শে তাঁর চিন্তার বিকাশ ঘটতে থাকে --- ক্রমে হয়ে ওঠেন এক বিশিষ্ট চিন্তাবিদ। ভ্রমণের সূত্রে লব্ধ নানা অভিজ্ঞতা এবং তাঁর এতদিনকার শিক্ষা-চিন্তা-ভাবনা মন্থন করে নারী জীবন সম্পর্কিত গবেষণা শুরু করেন ১৯৪৬-এ এবং তা ১৯৪৯-এ 'The Second Sex' গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়। এই ভ্রমণের লিপিলিপির ওপরেই 'America Day by Day' গ্রন্থে (১৯৫৪) আধারিত হয়েছে।

এই বছরেই প্রকাশিত হয় 'The Mandarins' উপন্যাসটি এবং এই উপন্যাসের জন্য তিনি ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার 'প্রি গঁকুর'-এ ভূষিত হন। উপন্যাসটিতে যুদ্ধ-পরবর্তী বুদ্ধিজীবীদের শীতল যুদ্ধের নৈতিক সংকটগ্রস্ত রূপটি উন্মোচিত হয়েছে। কমিউনিজম সম্বন্ধে চল্লিশের দশক থেকেই তিনি বৃহত্তর অর্থে সহানুভূতিশীল ছিলেন। পঞ্চাশের দশকে আলজেরীয়ান

যুদ্ধের (১৯৫৪-১৯৬২) সময় তিনি প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন, ফ্রান্সের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের জন্য আলজীরীয়দের সংগ্রামের সমর্থনে ফরাসী সরকারের উত্তর আফ্রিকা নীতিকে দায়ী করেন পঞ্চাশের দশকের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি 'Memoris of a Dutiful Daughter' লিখতে শুরু করেন, এটি চার খণ্ডে ফ্রান্স থেকে প্রকাশিত হয় (১৯৫৮-১৯৭২ পর্যন্ত)। তাঁর এই স্মৃতিচারণা একাধারে বিংশ শতাব্দীতে সংগঠিত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে বিংশ শতাব্দীর মেধাবী নারীর বীক্ষণ হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে লেখক ও দার্শনিক হিসেবে তাঁর বৌদ্ধিক বিকাশের রূপরেখার পরিচয়বাহী। ১৯৬৫-তে এক সাক্ষাৎকারে বোভোয়ার নিজেকে 'সম্পূর্ণ নারীবাদী' বলে ঘোষণা করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ আত্মঘোষণার মধ্যে দিয়ে তিনি ষাটের দশকের মধ্যবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এরপর ১৯৬৮-র পরবর্তী সময়ে তিনি Anglo-American এবং French Feminist-দের মধ্যে তাঁর 'The Second Sex' গ্রন্থের নতুন পাঠকমণ্ডলী লাভ করেন। উল্লেখ্য ১৯৬৮-তে ফরাসী সমাজে জাগ্রত-উত্তাল বিক্ষোভ সংগঠিত ছাত্রবিদ্রোহের রূপ ধারণ করে ব্যাপক রাজনৈতিক মাত্রা সমন্বিত হয়ে ফ্রান্সে এক বিপর্যয় ঘনিয়ে তোলে যার ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। ১৯৬৮-র আগে থেকেই নারীবাদী বিতর্ক ও প্রচারে সাধারণভাবে নারীর দুঃখ-কষ্টভোগ, যন্ত্রণাজর্জ্জর জীবন, জন্মনিয়ন্ত্রণ এবং নারীর শৃঙ্খল-মোচন তথা নারীমুক্তির বিষয়টি মূর্ত হয়ে উঠেছিল। ১৯৬৮-র পরে Movement de Liberation des fennes (MLF) ফরাসী নারীবাদী আন্দোলনের প্রথম ধারায় সংস্কারপন্থী দৃষ্টিভঙ্গিকে বাতিল করে নারীবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় ধারার সূচনা করে। ফলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে স্থিত নারীকে মনঃসমীক্ষণ, সমাজ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন, কখনওবা পুনর্মূল্যায়নের চেষ্টা চলতে থাকে। মার্ক্সীয় তাত্ত্বিক ভিত্তিতে স্থিত হয়ে অনেকে নারীর স্বাধীনতা সম্বন্ধে, কেউবা নারীর উৎপীড়নের সঙ্গে সামাজিক শ্রেণী-উৎপীড়নের সংযোগ-সূত্রটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন। প্রথাসিদ্ধ রূপনির্মিতিকে অগ্রাহ্য করে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর পার্থিব উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, নারীর বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়গুলিকে কেন্দ্রে রেখে বিপ্লবাত্মক নারীবাদী চিন্তার প্রকাশ ঘটতে থাকে।

বোভোয়ার সক্রিয়ভাবে নারীবাদের প্রচারে যুক্ত হন, গর্ভপাতকে আইনসিদ্ধ করার জন্য লড়তে থাকেন এবং গুরুত্বপূর্ণ নারীবাদী পত্রিকা 'Questions Feministes'-এর সম্পাদকীয় নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেন। ক্রমে বস্তুবাদী নারীবাদী প্রবণতাকে সমর্থন করে তিনি সত্তরের দশকে নারীর অধিকার তথা অস্তিত্বরক্ষার উদ্দেশ্যে গর্ভপাতকে আইনসিদ্ধ করার সপক্ষে ও নারীর বিরুদ্ধে সংঘঠিত উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে প্রচার ও আন্দোলনে যুক্ত হন।

তাঁর শেষ দার্শনিক প্রয়াসের ফসল হল 'Old Age' (1970)। সার্ত্রের মৃত্যুর পর (১৯৮০) তিনি উভয়ের আজীবন সাথীত্বের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন তাঁর 'Adieux : A Farewell to Satre' (১৯৮১) তে, অবশেষে মারা যান, ১৯৮৬-তে।

বোভোয়ারের সমগ্র রচনার মধ্যে 'The Second Sex' গ্রন্থটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থেই তিনি একজন নারীর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী-পুরুষের প্রকৃত সম্পর্কের মধ্যে সংলগ্ন নারীর মানবীয় সত্তার প্রকৃত অবস্থা এবং পরিস্থিতির (Situation) মধ্যে দিয়ে তার 'হয়ে ওঠা'র বিষয়টি। দার্শনিক মানচিত্রে লিঙ্গগত প্রভেদকে স্থাপন করে তাঁর 'Other' অর্থাৎ 'অপর' সম্বন্ধে বক্তব্য নির্মাণ করেছেন। ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক, মনঃসমীক্ষণ ইত্যাদি নানা দিক থেকে পর্যালোচনা করে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের 'বিষয়ী' স্বরূপের পাশে নারীর 'অপর' হিসেবে স্থাপিত জীবনের স্বরূপ সন্ধান; মানবীয় সত্তারূপে তার নানা সমস্যা বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে তিনি নারীকে ভোটাধিকার, সম্পত্তির অধিকার, কর্মের অধিকার লাভের সীমা-অতিক্রমী এক স্বীকৃত স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তারূপে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। পুরুষকে অস্বীকার করে নয়, নারী-পুরুষের নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য-স্বাধীনতা নিয়ে পারস্পরিক সম্বন্ধবন্ধনের অমোঘতা-অনিবার্যতাকে স্বীকার করে নর-নারীর প্রকৃত সম্ভাবনাময় ভালবাসার নির্মাণে গভীরভাবে আস্থা স্থাপন করে গেছেন। আলোচ্য গ্রন্থটি বিংশ শতাব্দীতে নারীবাদী চিন্তার গভীর ও মৌলিক রচনা হিসেবে অদ্যাবধি নানা আলোচনা-সমালোচনা-বিতর্ককে উস্কে দিয়েছে। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশিত বোভোয়ারের 'One is not born, but rather becomes, a woman'—এই সুবিদিত উক্তিটি প্রথাসিদ্ধ লিঙ্গ-বিষয়ক ব্যাখ্যায় নারী শরীরের ভূমিকাকে প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার আলোকে দেখার প্রবর্তনা জুগিয়েছে এবং এর সূত্রেই Judigh Butter 'sex' এবং 'gender'-এর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশের মধ্যে দিয়ে লিঙ্গ বিষয়ক বিপ্লবাত্মক বোঝাপড়ার দিকটির প্রতি নারীবাদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সব মিলিয়ে সিমন দ্য বোভোয়ার নারীমুক্তি আন্দোলনের অনন্য এক ঋত্বিক।

।। স্পাইডার সিল্ক — এক বিস্ময়কর তন্তু ।।

ড. রীণারাণী রায়

রিডার, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

স্পাইডার কথাটা শুনলেই কি মনে হয়? একটি ছোট সন্ধিপদী প্রাণী মানুষ যাকে ভয়ও করে আবার তার জাল বোনার ক্ষমতা দেখে আশ্চর্য হয়। ফেলুদার প্রথম অভিযান 'বাদশাহী আংটি' র পিয়ারীলালের আততায়ী ব্ল্যাক উইডো স্পাইডার কিংবা 'স্পাইডার ম্যান' বিশেষ কায়দায় মাকড়সার জাল তৈরি করে ছুঁড়ে দেয় অনেক দূরের কোনো বাড়ীর ছাদে, যা দিয়ে সে অনায়াসে অনেক দূরের পথ পাড়ি দিতে পারে। কিন্তু স্পাইডার সিল্ক — মাকড়সার বোনা রেশমী সুতো। তাও কি সম্ভব?

রেশম মথ যেমন সিল্ক তৈরি করে, মাকড়সাও তেমন সিল্ক নিঃসরণ করে, শুধু তাই নয়, সেটা দিয়ে সে নিপুণ শিল্পীর মতো রচনা করে চলে নিখুঁত জাল। বিজ্ঞানীরা এই স্পাইডার সিল্ককে প্রাণীজগতের সপ্তমাশ্চর্যের একটি বলে মনে করেন, কারণ মাকড়সার রেশম যেমন হাল্কা তেমনি শক্ত। মাকড়সা সাত আট রকমের সিল্ক তৈরি করতে পারে। একদিকে যেমন এক এক ধরনের মাকড়সা পাঁচ-ছয় রকম সিল্ক তৈরি করতে পারে, অন্যদিকে সব ধরনের মাকড়সা আবার সবরকম সিল্ক তৈরি করে না। নেফিলিয়া গণভুক্ত মাকড়সা সবচেয়ে মোটা (প্রায় ২মি. ব্যাসযুক্ত) জাল বানায়, যা দিয়ে তারা ছোটো পাখী, বাদুড় ধরতে পারে। আবার অস্ট্রেলিয়ার ইক্সেউটিকাস সোশিয়ালিস গোষ্ঠীর মাকড়সারা প্রায় ৩.৭ মি. দীর্ঘ জাল দিয়ে বাসা বানায়। প্যারাগুয়েতে কিছু বিশেষ ধরনের মাকড়সা পাওয়া যায়, যার প্রায় ৩০ ফুট দীর্ঘ জাল বুনতে পারে।

স্পাইডার সিল্ক সম্পর্কিত সবচেয়ে বিস্ময়কর তথ্যটি হলো এই যে এটি ইস্পাতের চেয়ে প্রায় পাঁচগুণ শক্তিশালী এবং নাইলনের দ্বিগুণ স্থিতিস্থাপক ও ওয়াটার প্রুফ বা জলনিরোধক। পল হিলিয়ার্ড তাঁর "দ্য বুক অব দ্য স্পাইডার" (১৯৯৪) এ মাকড়সার এই সিল্ক তন্তুর গুণাগুণের সুস্পষ্ট বর্ণনা করে বলেছেন যে এটি সহজে ছেঁড়ে না এবং রবারের থেকেও বেশী অভঙ্গুর। একে ছিঁড়তে গেলে যে কোনো প্রাকৃতিক তন্তু যেমন উদ্ভিদ দেহের সেলুলোজ, প্রাণীদেহের কোলাজেন, পতঙ্গদেহের কাইটিন ইত্যাদিকে ছিঁড়বার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির প্রায় দশগুণ বেশী শক্তি লাগে। মার্ক কারওয়ার্ডিন "গিনেস বুক অব অ্যানিম্যালে রেকর্ড, ১৯৯৫"-এ বলেছেন পৃথিবীতে যতরকম প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট তন্তু আছে, স্পাইডার সিল্ক তন্তু তাদের সবার চেয়ে শক্তিশালী। কিন্তু এই তন্তুর এত শক্তিশালী হয়ে ওঠার রহস্যটা কি? সেটি হচ্ছে স্পাইডার সিল্ক যে প্রোটিন দিয়ে তৈরি, তাতে অনেকখানি "অ্যালানিন" ও "গ্লাইসিন" অ্যামাইনো অ্যাসিডের উপস্থিতি। বিশেষত অ্যালানিন থাকার ফলে এগুলি পরিবেশ থেকে অনেকটা জল শোষণ করে নেয়, যা এদের দৃঢ়, স্থিতিস্থাপক এবং টানসহিষ্ণু করে তোলে।

মাকড়সার সিল্ক তৈরির রসদ মজুত থাকে তার পেটের মধ্যে একটা বিশেষ গ্রন্থি (সিল্ক গ্ল্যান্ড) তে তরল প্রোটিন হিসেবে। এর আণবিক গুরুত্ব তখন থাকে প্রায় ৩০,০০০ ডাল্টন। এই প্রোটিন যেই 'স্পিনারেট' দিয়ে মাকড়সার দেহের বাইরে আসে, হাওয়ার সংস্পর্শে সেটি সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হয়ে যায় এবং তখন এর আণবিক গুরুত্ব বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় ২০০, ০০০-৩০০,০০০ ডাল্টন। কিন্তু কেন বা কীভাবে এই পরিবর্তন ঘটে, সেটা বিজ্ঞানীদের কাছে এখনো রহস্য।

এক এক জাতির মাকড়সার দেহে এক এক ধরনের সিল্ক গ্রন্থি থাকে। তাদের কোনোটি বাসা বানানোর জন্যে, কোনোটি ফাঁদ বানানোর জন্যে, কোনোটি আবার অন্যকাজে লাগে এমন সিল্কসুতো তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সিল্ক উৎপাদন করে। এবার আসি মাকড়সার জাল বানানোর তাঁতযন্ত্রের কথায়। কিছু মাকড়সার জাল বোনার জন্যে "ক্রিবেলাম" নামে একটা অতিরিক্ত অঙ্গ থাকে। স্পিনারেট-এর সামনে এই অঙ্গটি থাকে, যাতে ১-৪টি "প্লেট" থাকে। প্লেটগুলি "স্পিগট" দিয়া ঢাকা থাকে। সিল্ক স্পিনারেট দিয়ে বেরোনো মাত্র মাকড়সা এই স্পাইডার সিল্ক বুনতে শুরু করে এবং সেটা স্পিগট দিয়ে নির্গত হয়। "ক্রিবেলাম" দিয়ে নির্গত তন্তু অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও প্রায় অদৃশ্য হওয়ায় সেটি দিয়ে সহজেই শিকার ধরা সম্ভব হয়। পেশীর সাহায্যে স্পিগটের ব্যাস নিয়ন্ত্রণ করে মাকড়সা নিজেই তার সিল্ক তন্তু সরু হবে না মোটা হবে তা ঠিক করে।

মাকড়সা যে ধৈর্য ধরে জাল বোনে তার কিন্তু অনেকগুলি কারণ বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেয়েছেন। প্রথম প্রয়োজন নিরাপত্তা। এজন্য একে "ড্র্যাগলাইন সিল্ক" বলা হয়। ছোটো মাকড়সারা প্রাণ বাঁচাতে ঝুলে পড়ে তাদের বোনা জাল বেয়ে। কেউ কেউ সুতো দিয়ে একটা কোকুন বুনে তার মধ্যে নিশ্চিন্তে লুকিয়ে বসে থাকে। এই কোকুন তাকে বাইরের শত্রু, অত্যধিক আর্দ্রতা বা শুষ্কতা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। অন্য প্রয়োজন হল শিকার ধরা। ডাইনোপিস গুয়াটেমালেনসিস নামের মাকড়সার বেশ বড় চোখ আছে, যা দিয়ে তারা চারদিকে নজর রাখে।

শিকার দেখলেই জাল ছুঁড়ে তাকে জড়িয়ে ফেলে। আবার ম্যাস্টোফোরা জাতীয় মাকড়সারা চটচটে পদার্থযুক্ত জাল চারদিকে ঘোরাতে থাকে। কাছাকাছির মধ্যে যদি একটাও মথ থাকে, তবে তার আর নিস্তার নেই। জাল বোনার আরেকটি প্রয়োজন জনন ও সন্তান পালন। পুরুষ মাকড়সা জননের সময় ও কিছু গোষ্ঠীর স্ত্রী-মাকড়সা সন্তান পালনের সময় জাল ব্যবহার করে। মাকড়সাদের কচি কাঁচারা এই জাল বেয়ে স্পাইডারম্যানের মতো দূর-দূরান্তে চলে যায়। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন এভাবে তারা প্রায় ১৫০০ কি.মি. পর্যন্ত পথ অতিক্রম করতে পারে। তবে সবসময় তাদের এই অ্যাডভেঞ্চার সুখকরও হয় না, কারণ জালের শেষপ্রান্ত অনেকসময় বিপজ্জনক স্থান অথবা গভীর জলাশয়ে শেষ হয়। ইওরোপের আর্জিরোনেটা অ্যাকোয়াটিকা নামের মাকড়সা জলে থাকে বটে, তবে তার শ্বাস নেবার জন্যে ডাঙার মুক্ত বাতাস চাই। তাই সে জলজ-গাছের গায়ে জাল বুনে এক আশ্চর্য বাসা বানায়, সেখানে সে একটু একটু করে বুদবুদ জমা করে ও নিশ্চিন্তে বাসাটির মধ্যে বাস করতে থাকে।

স্পাইডার সিল্কের আরো একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি অ্যাসিড জাতীয় পদার্থ এবং ব্যাকটিরিয়া ও ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয় না। তাই তো বহু বছর ধরে এগুলি বাড়ীর আনাচে-কানাচে, জঙ্গলে, মাঠে অপরিবর্তিত থেকে যায়। কেন তার সঠিক কারণ এখনো জানা যায় নি।

এতগুলি বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য থাকার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবিভাগ এটিকে "বুলেট প্রুফ ভেস্ট" তৈরির জন্যে ব্যবহার করতে উৎসাহী হয়েছে। এর দৃঢ়তা, সূক্ষ্মতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য এগুলিকে ঠাস বুনোট জাকেট বানানোর কাজে ব্যবহার করতে সাহায্য করবে বলে মনে করা হয়। ওয়াটার প্রুফ, ব্যাকটিরিয়া প্রুফ হওয়ায় সহজে নষ্টও হবে না।

বিজ্ঞানীরা জৈব প্রযুক্তির সাহায্যে মাকড়সার সিল্ক প্রোটিন জিনগুলিকে ইকোলাই ব্যাকটিরিয়াতে ক্লোনিং প্রক্রিয়ায় প্রতিস্থাপন করতে পেরেছেন। কোষ বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকটিরিয়াতে স্পাইডার সিল্ক প্রোটিন তৈরি হতে থাকে। এই স্পাইডার সিল্ককে এবার প্রয়োজনমত পরিবর্তন করে সহজেই মানুষের উপকারে লাগানো যেতে পারে।

হাজার বছর ধরে মানুষ দেখেছে মাকড়সার জাল বোনা। আজ বায়োটেকনোলজির হাত ধরে সে নিজে স্পাইডারম্যানের মতো এই সুতো তৈরির স্বপ্ন দেখে। এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলে হয়তো একদিন আমরা হালকা, শক্ত, মজবুত একটা পরিবেশ বান্ধব প্রাকৃতিক তন্তু হাতে পেয়ে যাবো, যা আমাদের হয়তো উন্নতির সোপানের কয়েক ধাপ এগিয়ে দেবে।

ফ্রেড ওয়ান্ডার

দুটি গল্প

অনুবাদ : অভিজিৎ দত্ত, *অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ*

লেখক পরিচিতি : ১৯১৭ সালে ভিয়েনায় তাঁর বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের ভূমিকা প্রকট হতে থাকে। প্রথমত তিরিশের মন্দা, দ্বিতীয়ত হিটলারের অস্ট্রিয়া দখল। লক্ষ লক্ষ বেকার মানুষের সঙ্গে তিনি ঘুরেছেন ইতালি, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্সে— চেষ্টা করেছেন সবরকম খামারের কাজ, রাস্তা আর বাড়ি তৈরীর কাজ, ওয়েটার, ড্রাফটসম্যান বা ফটোগ্রাফারের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্যারিসে ধরা পড়ে অন্তরীণ হন—সেখান থেকে জার্মানি, বুখেনভাল্ড কয়েদি শিবিরে। ১৯৪৫-এ মুক্তির পর অস্ট্রিয়ান কমুনিস্ট পার্টির সদস্য হন আর ভিয়েনাতে সংবাদ সংগ্রহকের কাজ নেন। ১৯৫৫ তে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে এসে লিপজিগে সাহিত্য পড়াশোনা শুরু করেন। তখন থেকে তাঁর লেখক জীবনের সূত্রপাত।

এখানের লেখাদুটি জার্মান ভাষায় লেখা Der seibente Brunnen (The Seventh Well) থেকে নেওয়া। লেখা 1974 সালে। বিষয়বস্তু হচ্ছে জার্মান কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের জীবন। শূন্যর বিন্দুতে পৌঁছে যাওয়া মানুষগুলোর একদিন থেকে আরেকদিন পেরিয়ে যাওয়ার চিত্র তুলে ধরেছেন অসামান্য সততা ও আবেগের সঙ্গে। এর সঙ্গে মিশে আছে তীব্র কৌতুকবোধ যা নিপীড়িত মানুষের একান্ত নিজস্ব। শুধু অতীত নয় ভবিষ্যতের প্রতি লেখকের সতর্কীকরণ : আমরা সকলে দেখেছি ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। এখনো যুদ্ধ হয়; আছে ফ্যাসিবাদ এবং কনসেনট্রেশন ক্যাম্পও। এই লেখা অতীত নয়। এর বিষয়বস্তু সমকাল।

রুটি

রুটিটা খাওয়ার জন্যে তোমাদের একটা নতুন কাঠের বোর্ড দরকার। সেইরকম একটা বোর্ড তোমরা যে কোন জায়গায় পেতে পার। কাঠের মানে বন, সবুজ ফাঁকামাঠ, ঝোপজঙ্গল। এটাই হচ্ছে বাড়ি, নিরাপত্তা, আরাম। আর এটাই হারিয়ে গেছে। বোর্ডটাকে মাটিতে পাতো, বাঙ্কে কিংবা তোমার হাঁটুর উপর রাখ, তাহলেই তুমি একটা পরিষ্কার টেবিল পেয়ে যাচ্ছ—তুমি তোমার বাড়িতে একা হয়ে যাচ্ছ। এইবার আসছে রুটি : ওটাকে তিনটে মোটা টুকরো কর, টুকরোগুলো আরো ছোট টুকরোয় ভাগ করো। প্রত্যেকটা টুকরো আস্তে আস্তে মন দিয়ে চিবোও। ওর মধ্যে নিহিত প্রতিটা শস্যদানা, বৃষ্টি আর ঝড়ের স্বাদ নাও। সূর্যের আস্বাদ তোমাদের জিভে গলে মিশে যেতে দাও।

রুটিই জীবন। যে অন্যের রুটি চুরি করে, সে তার জীবন চুরি করে। তুর্কি কেমাল রুটি চুরি করেছিল। কে তাকে সর্বসমক্ষে ধরিয়ে দিয়েছিল? একবার যখন কাজের পর আমরা ব্যারাকে ঢুকলাম একজন লোক সেখানে ঝুলছিল। ওরা তাকে পাদুটো ওপর দিক করে কড়িকাঠে বেঁধে রেখেছিল। মানাস রুবিনস্টাইন—আমাদের সবচেয়ে কমবয়সী কাপো তার পেছনে দাঁড়িয়ে চাবুক দোলাচ্ছে। অপরাধীর মুখে কোন শব্দ নেই। সে কি অজ্ঞান হয়ে গেছে? মানাস রুবিনস্টাইন তার ফরসা আঙুলগুলোয় আংটি পরে, উঁচু বুট পরে, যা কিনা শাসকদের প্রতীক, ইহুদি দর্জির সেলাই করা চমৎকার পোষাক পরে। এইসব কি রুটির জন্যে? ওরা কেমালকে কিসের জন্যে শাস্তি দিচ্ছে? ওরা, ঐ কাপোরা কি রোজ আমাদের বরাদ্দ রুটি চুরি করে না? পরিশ্রমে, একগোছা কালো চুল এসে পড়েছে মানাস রুবিনস্টাইনের কপালে। মানাসকে দেখতে সুন্দর। চাবুক হাতে দেবদূত। সে শাস্তি দিয়ে চলে—যে কোন শাস্তির ভার তার ওপর দেওয়া হোক, সে সেটা শান্ত, আবেগহীন ভাবে পালন করে চলে। এটা এমন কিছু কাজ যার পর সে তার হাত দুটো ধুয়ে নেয় এবং একটা সিগারেট খায়।

বেশির ভাগ বন্দীই রুটিটা সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে ফেলে। ওরা হাত দিয়ে ওটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে আর লোলুপ তাড়নায় গিলতে থাকে। তাছাড়া, এবার এটা কেউ চুরি করে নিতে পারবে না। একটা গোটা রুটি প্রতি ছ'জনের জন্যে দেওয়া হয়—কখনো কখনো আটজনের জন্যে—আর কয়েকটি ভাল দিনে চার জনের জন্য! এরকম কেন? অনেক ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা দাবি করে যে তারা রুটির বরাদ্দ মাপ দেখে ফ্রন্টের অবস্থান জেনে ফেলতে সমর্থ। ওরা বলে, বরাদ্দ যদি বেড়ে যায় তার মানে মিত্রশক্তির বিজয়ী অগ্রগতি; নাৎসীদের পরিস্থিতি খারাপ হলে ওরা বিশ্বের ভয়ে কাঁপে। অন্যেরা অবশ্য বিপরীত মতে বিশ্বাস করে।

সুতরাং রুটি আসে, ছ'জন মানুষ বুকে হেঁটে এক কোণে সরে যায় এবং রুটির ভাগ বাঁটোয়ারার পবিত্র পদ্ধতির দিকে একনিষ্ঠ মনোযোগ দেয়। এখানে নানারকম প্রণালী আছে। উদাহরণস্বরূপ, তোমরা লটারি করতে পার : রুটিটা খুব তাড়াতাড়ি ছ'টা টুকরোয় কেটে নেওয়া হয় এবং বিভিন্ন আকারের টুকরোগুলো কাগজের টুকরো কিংবা নম্বর টেনে তুলে নেওয়া হয়। প্রত্যেকেরই সমান সুযোগ থাকে, কেউ অভিযোগ তুলতে পারে না। যে কোন একজন বড় টুকরোটা পেয়ে গেলে সে তার আনন্দ গোপন করতে চেষ্টা করে যাতে সাথীরা কেউ

আহত না হয়। রুটিটা ছিনিয়ে নিয়ে যদি সে জানে কিসে তার ভাল হবে, তবে সে আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। যে সবচেয়ে ছোট টুকরোটা পায় সেও বিছানায় চলে যায়, একমাত্র ঘুমের ভেতরে সে সান্ত্বনা পেতে পারে যখন তুমি জেগে ওঠ ক্ষুধা শৈত্য ও বাইবেলে বর্ণিত অন্যান্য মহামারী নিয়ে একটি দীর্ঘ দিন তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাধারণত পাওনা ভাগ বাঁটোয়ারার উপায়টা ছিল এই রকম; একটা লম্বা লাঠির মাঝখানে দড়ি বাঁধা, দুপাশে রুটির টুকরো আটকাবার জন্য দুটো আঙটা; এই জটিল পদ্ধতিতে টুকরোগুলো ওজন করা হয় যতক্ষণ না ছটি ভাগের সবকটি সমান হয়। ছজোড়া অসুস্থভাবে বিস্ফারিত চোখ পুরো পদ্ধতিটি গিলতে থাকে। এই পদ্ধতিটির একটা সুবিধা হচ্ছে যে এতে অনেকটা সময় লাগে—যতক্ষণে অন্যদের খাওয়া হয়ে গেছে তখনও রুটিটার ওজন চলতে থাকে। যদি ভাগ কিংবা ওজন করার সময় রুটিটা ভেঙে যায় প্রত্যেকে তার টুপি বাড়িয়ে দিয়ে রুটির গুঁড়োগুলো সংগ্রহ করে। আমার এখনো মনে পড়ে আত্মনিগ্রহকারীদের, যারা একটি গোপন রুটিগোষ্ঠীর সভ্য। ওরা ওদের পাওনা অংশ একটা থলিতে রেখে দেয় যেটা ওরা সবসময় সঙ্গে নিয়ে বেড়ায় এবং নিজেদের ওপর নিগ্রহ চালায়। শরীরের বাইরে থাকা রুটি হয়তো ওদের দিবাস্বপ্নের পুষ্টি জোগায় কিন্তু শেষ শক্তিবিন্দু নিঃশেষ করে ফেলে। ওরা অন্যদের চেয়ে তাড়াতাড়ি মারা পড়ে কাজের ফাঁকে ফাঁকে, কখন কে জানে, ওদের গোষ্ঠীবহির্ভূত লোকেদের অগোচরে এবং কঠোরভাবে পরিকল্পিত নিয়মে ওরা জীবনদায়ী ছোট ছোট টুকরোগুলো থলি থেকে বের করে আনে এবং সমস্ত দিন ধরে ভাগ করে নেয়। নির্বোধ। আবার সেখানে পেখমানের মতো মানুষেরাও আছে যার এক টুকরো রুটিকে সাত পদের ভোজে বদলে নেয়। ওরা বসে পড়ে সযত্নে তুলে রাখা কাঠের ছোট বোর্ড বের করে আয়েশ করে এই উৎসব পালন করে। এসব নিয়ে মেণ্ডেল টাইখমান হাসে। সিংহের মতো টাইখমান, কমপক্ষে দিনে একবার, রুটিটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে মুখে ভর্তি করে পুরে নেয়। কিন্তু ঐ লোকগুলো .....হাস্যকর! ঐ ভাবে খায় কাঠবেড়াল, ইঁদুর আর জাবরকাটা জন্তুরা। নিরীহ ভেড়াগুলো ঐ ভাবে খায়।

এক বছর পরে আমি তাকে দেখি, ধর্ম আন্দোলনের নেতা, শব্দের জাদুকর, মেন্ডেল টাইখমান, সেও তার সামান্য রুটিটা একটা বোর্ড আর ছুরি নিয়ে খায়। সব জায়গাতেই মানুষ তার মতামত বদলায়, এখানেও কেন নয়? যখন মেন্ডেল টাইখমান বোঝে যে তার শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, সিংহের সমান সেও ভেড়াদের তুচ্ছ আনন্দ আবিষ্কার করে: রুটি। ওর মধ্যে নিহিত প্রতিটা শস্যদানা, বৃষ্টি আর ঝড়ের স্বাদ নাও। সূর্যের আস্বাদ তোমাদের জিভে গলে মিশে যেতে দাও।

কয়েকটি মুখ

ভোর পাঁচটা থেকে তুষার ঝড়ে বনটা বরফে ছেয়ে গেল। প্রতিটা ডালপালায় বরফের টুকরো ঝলমল করছিল। কিন্তু সকাল আটটার মধ্যে তুষার গলে গিয়ে ছোট ছোট ঝরনার স্রোতে মিশে গেল। আসন্ন বসন্তের আভাসে প্রকৃতি সন্তানসম্ভবা। বাড়িগুলোর চিমনি থেকে উঠছে নীলচে ধোঁয়া। বরফের স্তরে ফাটল ধরেছে, গাছের ডালপালা হয়ে উঠছে সজীব। যুদ্ধের ট্যাঙ্কের বদলে পোকামাকড়ের দল মাটি খুঁড়ে তুলে আনছে এমন এক সর্বব্যাপী শান্ত শক্তির আলোড়নে, যা কিনা সংহত হলে পৃথিবী বিদীর্ণ করে দিতে পারে।

নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে বেড়ে ওঠার লড়াই, ভাইরাসের বিরুদ্ধে শ্বেতকণিকা, মৃত্যুর বিরুদ্ধে আশা, ১৯৪৫-এর মার্চ মাস। হাজার পাঁচেক বন্দী চলেছে পুব দিকে। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে, আমাদের শরীরের প্রত্যেকটি কোষের মধ্যে চলেছে এই গোপন, অন্ধভাবে ক্রুদ্ধ, কঠোর লড়াই। প্রায় অবোধ্য এই লড়াই, এই উপচে পড়া অদম্য প্রাণশক্তি 'গোইয়া' কে অনুপ্রাণিত করতে পারত। কিন্তু একই সঙ্গে কেউ বলতে পারত—দেখো কি দুর্ভাগা এই লোকগুলো! ওরা কি এখনো মানুষ আছে!

কাঠের জুতোর ঘষায় পায়ে ঘা হয়ে যায়--যেগুলোকে অনেকেই এই দীর্ঘ যাত্রাপথের মাঝে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে--জ্যাকেটের তলায় সিমেন্টের ব্যাগ আর বুকের কাছে শক্ত করে আঁকড়ে রাখা রুটির টুকরো। ক্যাম্প ছেড়ে আসার সময় প্রত্যেকে এক পাউন্ড ওজনের একটা রুটি পেয়েছিল: যদিও আমরা জানতাম পরের চার থেকে সাত দিনের জন্য এইটুকু খাবারই ছিল সব তবু অধিকাংশ বন্দীরা সঙ্গে সঙ্গে রুটিটা খেয়ে ফেলেছিল: মানুষের শরীর কোন অপচয় হতে দেয় না। এর মধ্যে রয়েছে প্রতি কণা খাবার আর প্রতি বিন্দু জলের রক্তন ও সংরক্ষণের উন্নততর ব্যবস্থা। মানুষের মুখগুলো চেনা যায় না। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ছাল ওঠা, ঘা আর ফোস্কায় বিকৃত। বহুকাল আগে সেগুলো থেকে চর্বির স্বাভাবিক স্তর ঝরে গেছে, হারিয়েছে পরিতৃপ্তি আর নিরপেক্ষতার প্রকাশ। তার বদলে পড়েছে যন্ত্রণা আর বঞ্চনার গভীর রেখা। কয়েকটি চোখের চারপাশে এখনো রয়ে গেছে হাসির কুঁচকোনো রাগ, কারো কারো চোখে কখনো কখনো চমকে ওঠে বুদ্ধির কিম্বা খুশীর ঝলক। যদিও ভালো থাকার শান্ত নিস্তরঙ্গ দিনগুলো, তৃপ্ত স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মুখগুলো এখন মিলিয়ে গেছে শূন্যতায় এক রূঢ় নির্বাচনের সূত্র ভাসিয়ে নিয়ে গেছে শারীরিক ভাবে দুর্বল মানুষগুলোকে যে কজন তখনো এই যাত্রা পথে টিকে রয়েছে, তারা অন্তত একশটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে বুখেনভাল্ড থেকে শুরু করে আশি কিলোমিটার দীর্ঘ পথের দুপাশে ছড়ানো মৃতদেহের সার--যাদের পাশ দিয়ে পেরিয়ে যাবার সময় অনেকেই তখনো দুমড়ে মুচড়ে পড়ছিল।

ইউক্রেনের এক চাষী ক্ষতবিক্ষত পা টেনে টেনে এগিয়ে যাচ্ছিল। চষা ক্ষেতের মতো তার মুখ, লাঙলের গভীর দাগের মত রোদে পোড়া, বাদামী। দুটো ভিজে ভিজে নীল চোখ স্বচ্ছ, ঝকঝকে আর খোলামেলা—আকাশের মত। নিঃসন্দেহে বলা যায় ওরা কোনদিন অবসরের আনন্দ পায়নি। কঠোর পরিশ্রম ওদের শক্ত করে তুলেছে। ওতে কোন জোচ্চুরির চিহ্ন নেই। যদিও রয়েছে চাতুর্যের আভাস (টলস্টয় যাকে বলেছেন, ওরা বোবা হয়ে কাজ করে, সেটাই ওদের শক্তি)! আর এখন সেই মুখে জড়িয়ে রয়েছে কেবল ভয়, বেঁচে থাকার ইচ্ছায় জ্বলন্ত। ঈশ্বর জানে, কোথা থেকে সে এই শক্তিটুকু পেয়েছিল, কেবল নিজের জন্য কখনোই সে এটা পেতে পারত না। আমি লক্ষ করছিলাম কিভাবে তার মুখটা নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ছিল, প্রবল ইচ্ছাশক্তি আস্তে আস্তে ভেঙে যাচ্ছিল। একধরনের অস্বস্তিকর শান্তি ছড়িয়ে পড়ছিল তার মুখের ওপর, এই যাত্রা শুরু হওয়ার প্রথম বিকেলেই সে যখন জেনে গিয়েছিল—আমি আর বেশি দূর যেতে পারব না—(আমরা প্রত্যেকেই বেশ কয়েবার করে নাটকটা দেখেছি : একজন মানুষ হাল ছেড়ে দিচ্ছে, পাশে পড়ে থাকছে, তারপর একটা গুলির শব্দ!) তার চোখ থেকে সমস্ত রঙ মুছে গিয়েছিল। বর্ণহীন চোখ মেলে সে সবকিছু দেখছিল একটা বিপজ্জনক দূরত্ব থেকে। আমি জেনে গিয়েছিলাম কি ঘটতে চলেছে। লোকটার প্রতিটা পদক্ষেপ ক্রমাগত ভারি হয়ে আসছিল। আগ্নার মুক্তির ক্লান্তিতে তার শরীর আস্তে আস্তে নুয়ে পড়ছিল, তার মুখে চিন্তার ছাপ আলগা হয়ে আসছিল। একজন মানুষ যা কিছু শিখেছে, যা কিছু করতে অভ্যস্ত—সব হারিয়ে যায়। আর কি বাকি থাকে? আমি সেই পরিবর্তনগুলো লক্ষ করছিলাম। তখন অবধি আমি এই ধরনের অপার্থিব স্বচ্ছতা কেবল মৃত ব্যক্তির মুখেই দেখেছি—একটা অদ্ভুত উজ্জ্বলতা তার মুখে ছড়িয়ে পড়ে তাকে অচেনা করে তুলেছিল। এইরকম প্রশান্ত, গম্ভীর, আত্মমর্যাদার ভাব আগে তার মুখে দেখিনি, কি করে সে এগুলো লুকিয়ে রেখেছিল? ঠিক তখনি বোঝা যায় ওর মুখ হাজার বছরের পুরনো। ওর জীবনের কয়েটা ভঙ্গুর, অপ্রয়োজনীয় বছর শুধু ঝরে গেছে। যা রয়ে গেছে তা হল মানবতার মুখ। একজন মানুষ হয়ে ওঠার ইচ্ছা

বিকেল হয়ে আসছে। বন্দীদের দীর্ঘ সারি পা টেনে টেনে এগিয়ে চলেছে। তার শেষ দেখা যায় না। চাষী লোকটি বিড়বিড় করে প্রার্থনা শুরু করে। তার মধ্যে কোন ব্যাকুলতা ছিল না, বরং আত্মস্থ স্থিরতা ছিল। তারপর সে রাস্তার প্রান্তে সরে এল, হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। চোখ দুটো বুজে, মুখটা আস্তে আস্তে আকাশের দিকে তুলে ধরে বুকে বার বার ক্রশ চিহ্ন আঁকতে লাগল।

এখানে কারো বেশিক্ষণ থেমে থাকার উপায় ছিল না। যাত্রাপথের একঘেয়েমি কাটাবার জন্য জ্যাকবুটেরা নিজেদের মধ্যে নানারকম ঠাট্টা তামাশার খেলা খেলছিল। আমি দেখলাম একজন কমবয়সী এস এস সৈন্য প্রথম এই বুড়ো চাষীকে লক্ষ করল। অস্থিরভাবে সে বন্দুক বের করার চেষ্টা করছিল, কেননা একজন যদি যথেষ্ট চটপটে না হয় সাধারণত অন্য কেউ তাকে গুলি করার খেলায় হারিয়ে দেবে। ওরা নিজেদের মধ্যে এই নিয়ে প্রতিযোগিতা করছিল (হয়তো তারা বিলিয়ার্ডের মতো পয়েন্ট রাখছিল)। মোটকথা সেই কমবয়সী সৈন্যটি বন্দুক বের করতে অসুবিধেয় পড়েছিল, তার বন্দুকের খাপের আওটা ঠিক মত কাজ করেনি। তার মুখ লাল হয়ে উঠল অস্বস্তিতে, যদিও কোন হিংস্র শয়তানি তার মধ্যে ছিল না। যদি কেবল রেগে যেত, কত সহজে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যেত। তার মধ্যে কোন ঘৃণা বা হত্যাস্পৃহা নেই, শুধু আছে একধরনের খেলোয়াড়ী জেদ, ক্ষমতার লোভ (এটা করা কিছুই নয়, আমিও এটা করতে পারি। মাটির পায়রাদের গুলি করার মতো।) এবার সে যা ভয় পাচ্ছিল তাই হলো; একজন চটপটে সৈন্য এগিয়ে এল। তার হাতে উঁচিয়ে ধরা খোলা বন্দুক। খুব মন দিয়ে সৈন্যটি লক্ষ্যস্থির করে, তারপর হেসে ফেলে, পাশের কমবয়সী সৈন্যটির দিকে তাকিয়ে বলে : যাও, গুলি কর। জলদি। কমবয়সী সৈন্যটি গুলি করে এবং ফসকায়। বৃদ্ধ চাষীটি নিজেকে অতিক্রম করে যাবার মুখোমুখি। সে নিজেকে বুঝতে পারে না. এই কি মৃত্যু? এখনো তার গায়ে গুলি লাগেনি, কিন্তু একটা অদৃশ্য শক্তি তাকে ধাক্কা মেরে উলটে ফেলে দেয়, কাটা গাছের মতো সে ছিটকে পড়ে যায়। এবারে দক্ষ সৈন্যটির পালা, সে আবার লক্ষ্যস্থির করে এবং সোজাসুজি বৃদ্ধটির কপালে গুলি করে। বৃদ্ধটি স্থির হয়ে যায়. অচেনা বিদেশের মাটিতে তার শরীর পড়ে থাকে।

একজন ইহুদির মুখ, যে হঠাৎ পড়ে গিয়ে মাটিতে শুয়ে রয়েছে। সঙ্গীরা তাকে উলটে দেয়। সে এখনো বেঁচে রয়েছে। তার এঁটে থাকা ঠোঁটে হাসির রেশ। ঠোঁটের কোণ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। তার ছেলে তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে—ছোট্ট ছেলে, বোধহয় বছর বারো বয়স। তার চোখ মুখে আতঙ্ক। জ্যাকবুটরা অলস মন্থরতায় এগিয়ে আসে, হাতে বন্দুক উঁচিয়ে ধরা। বৃদ্ধটির সঙ্গীরা তাকে তুলে দাঁড় করাতে চায় কিন্তু সে পারে না। তারা তাকে ধরে নিয়ে রাস্তার ধারে একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড় করায়। লোকটি কুঁকড়ে বসে পড়ে, আস্তে আস্তে পাশ ফেরে, তারপর এলিয়ে পড়ে। এবার সে তার ছেলেকে মৃদু হেসে আদর করে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে দেয় : যাও।

কি অদ্ভুত সেই হাসি—বিব্রত আর বিবেকতাড়িত। ছেলেটি মাটি আঁকড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বাবা এক হাত দিয়ে তার মাথায় আদর করে অন্য হাতে তাকে ঠেলে এগিয়ে দেয়। অন্য বন্দীরা এবার ছেলেটিকে চেপে ধরে, সে চিৎকার করে হাত পা ছুঁড়তে থাকে। বাবা আবার মৃদু হেসে ক্লান্ত ভাবে বলে : তোমায় অনুরোধ করছি, যাও। পেছনে জ্যাকবুটের দল দাঁড়িয়ে থাকে, জীবন্ত মৃত্যুর মতো। বন্দীরা ছেলেটির চোখ ঢেকে দিয়ে, তাকে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে এগিয়ে যায়। পেছনে একটা গুলির শব্দ, ওরা প্রায় তা শুনতে পায় না।

The Battle for Kargil : Post-Modern War in South Asia

Kaushik Roy
Professor, Department of History

26 May 1999. A batch of MIG 21 unleash air to surface missiles in sub-Arctic conditions along the ice capped Himalayan peaks in north Kashmir. The fight for dominating the battlespace at Kargil has started. For the first time in independent India's history, fighters and fighter-bombers are used in ground strafing missions directed against the insurgents. The Indian Air Force (IAF) supported by the ground combat units start Operation Vijay to flush out the Pakistani backed infiltrators from the Kargil-Drass sector. Towards the end of July, the Indian government claims victory.

But there is a caveat. How is it that the IAF and the best units of the Indian Army supported by heavy artillery needed so much time to drive back the lightly armed Pathan and Afghan guerrillas who were supported by intermittent, indirect artillery fire from Pakistan?[1] The bitter truth is that even after two months of grueling combat, the Indian armed forces were unable to annihilate the enemy units. The latter were allowed to pull out safely after hectic diplomatic activities. This lack of a decisive victory is difficult to explain because the same Indian military was instrumental in the capitulation of one-fourth of the Pakistani Army in Bangladesh in 1971.

Paradigm Shift : Post-Modern War Replaces Industrial Age War :

What has happened after 1971 is not that the Indian military's combat effectiveness has declined due to corruption, and inadequate modernization. Actually the nature of warfare has changed. The end of the Cold War did not result in a warless international order. Rather the dynamics of warfare is transformed. From the 1980s due to technological and political changes, the world witnessed the emergence of a new form of warfare which is termed by the military theorist as Post-Modern Warfare or Information age Warfare of Operations Other Than Warfare (OOTW). This form of combat is the product of revolutionary information techonologies especially in the arena of microcircuitry and is most likely in the ethnic, cultural and religious strife in the Eurasian landmass. And it has rendered useless the conventional military machines with their cumbersome command structures and divisional organization geared for attritional industrial warfare among the states.[2]

What are the features of this new form of warfare? Post-Modern warfare is dispersed, sporadic and scattered. It can occur everywhere simultaneously; along the information highways, in cyberspace, and also in deep space. The minimalist groups practicing subversion might paralyze the electronic nervous system of the developed societies by attacking the civilian and military computers.[3] A combination of microchip and infotech revolutions resulting in new sensing and targeting technologies have resulted in the horizontal and vertical expansion of the battlespace.[4] This form of combat is characterized by the concept of 'vanishing battlefields'.[5] Thus the conventional battlefields where the armies used to meet resulting in a headlong clash as evident during the two World Wars and the Korean War is a thing of the past.

Recent flashpoints in the globe which includes Kargil and Kosovo witnessed some features of this new form of warfare. The point to be noted is that the elements of this new form of warfare first manifested itself in the Soviet-Afghan War of the 1980s. Mostly stateless marginal groups when supported by powers that aspire to become regional hegemons conduct this new form of combat. The objective of such combat is to engage limited number of soldiers for limited duration to derive limited political leverages. The insurgents take advantage of the cheap revolutionary technologies which are easily available in the international arms bazaar. The shoulder carried anti-

tank missiles could easily destroy the most advanced tanks available to the armies of the world. Recently, with these weapons the Chechen guerrillas gave hell to the Russian tank armies.[5] Another mass produced one-man missile is the shoulder fired anti-aricraft missile. These lethal weapons could be fired by even relatively untrained militias because these are heat seeking guided weapons. The heat waves emitted by the engines of the airborne vehicles attract these missiles towards them. The Afghan guerrillas with these weapons downed several Soviet ground attack helicopters.

The operational scenario that the IAF faced in Kargil was similar to that faced by the Soviet Air Force over Afghanistan. The terrain of Afghanistan and Kashmir is similar. The nature of threat was alike. Guerrillas motivated by Islam were challenging the sovereignty of the government. The hardware of the IAF was also supplied by the Soviet military establishment. And India committed the same mistakes the Soviets did. However, India has less justification in legitimizing her defects because New Delhi should have learnt from the Soviet failure.[7]

Both the Soviets and the Indians faced guerrillas perched along the crests of the mountains and direct assaults on them by the infantry were not only costly but also time consuming. Moscow's solution was to blast the guerrilla strongpoints with airpower. New Delhi also followed this policy. Initially the Soviets used Mi-17 helicopters armed with cannons to smash the guerrilla strongpoints. But the man-portable surface to air missils soon destroyed so many helicopters that these gunships were withdrawn from Afghanistan. India had brought such assault helicopters from Moscow in the 1980s.

In the last week of May 1999, the IAF's reaction in Kargil was the carbon copy of the Soviet air policy in Afghanistan. The IAF launched the Mi-17 helicopters against the insurgents trained by Afghan guerrillas. Within two days of launching the operation, one helicopter was lost. Unlike the Soviets, the IAF's helicopter fleet was small. Moreover, the IAF's chopper fleet suffered from a tremendous shortage of spare parts. Hence after the drubbing of May 28, the helicopters were withdrawn from Kargil.[8]

From June onwards a new policy was followed. Like the NATO Air Force in Kosovo, the IAF used laser-guided precision bombs against the insurgents.[9] The United States Air Force (USAF) and the NATO found out that the Serbian army by making bonfires on the hilltops diverted the heat seeking bombs away from their bunkers. And at low altitudes, the shoulder-fired missiles remained the principal threat for the Western airforces at Kosovo.[10] The Mujahideen guerrillas presented the same threat at Kargil. In the end the Indian infantry fought it out and suffered many casualties in the process.

'Savage Warfare' of British-India as Precursor\ of Post-Modern War :

Why can't we learn from history? The Post-Modern conflicts have lots of similarties with the low-intensity warfare, which occurred in British-India. Both were insurgency operations conducted by the religious fanatics armed with the latest weapons. The British-Indian Army had to face continuous raids by the Pathan tribal guerrillas encouraged by Afghanistan along the Indus frontier just as the post-independent Indian Army is facing challenges from the insurgents supported by Pakistan. Again the British-Indian land forces could not cross the international border between India and Afghanistan to flush out these guerrillas just as the present day Indian Army could not cross the Line of Control (LOC). There was no technological gap between the Pathan guerrillas and the British-Indian military personnel. Both sides were equipped with Lee Enfield rifles. Similarly no significant technical gap existed between the Pakistan backed infiltrators and the Indian Jawans. The Pakistani backed intruders were armed with 'Stinger' missiles which could down Indian aircrafts. In an earlier era, the Raj's Army had found out that mechanized heavy artillery, armoured cars, tanks and trucks were of limited utility in the roadless hilly terrain of northwest India. The Royal Air Force tried bombing but low population density and absence of highly developed civilian infrastructure resulted in minimal damage.[11] This geographic obstacle which limits the use of high-grade military hardware remains true in the present scenario. It is to be noted that the use of laser guided precision bombs by state of the art Mirage 2000 fighter-bombers

was of limited utility during the Kargil operations. Since the present day Indian Armed Forces are the lineal descendants of the Raj's military establishment, a study of how the British-Indian military was able to contain the northwest frontier infiltrators might have contemporary relevance.

The British-Indian Army tried to tackle the problem of the Pathan guerrillas 'butcher and bolt' expeditions (termed by the imperial military theorist C.E. Callwell as 'Savage War') through organizational means. These are relevant for present day OOTW. First, top-down centralized comand structure was done away with and the junior officers in charge of patrols designed to track down the guerrillas were given wide authority and autonomy. Thus emerged in the British-Indian Army a sort of command mechanics which the German military literature terms as *Auftragstaktik*.[12] The insurgents, then and now present no conventionally equipped mass armies to be annihilated. Again, present day societies will not accept huge losses inherent in attritional warfare. The rise of lethal technologies has made it mandatory to disperse the troops. Despite the advancements in surveillance equipment, the 'fog of war' remains. And in future battlefields, the human dimension will remain dominant. Hence, a group in the present British Army wants the command apparatus for set-piece encounters to be replaced by a command structure geared for rapid maneuver operations for infiltrating enemy positions. The officers should be encouraged to show initiative, act and improvise in the face of unknown difficulties just as *Auftragstaktik* demands. Secondly, the officers the British-Indian regiments were politically educated. They were trained to be friendly with the local population along the combat zones, and urged to respect their cultural sensibilities. This made possible procurement of information concerning the guerrillas from the local populace and to prevent the infiltrators from merging with them.[13] One of the principal failures of the Americans in Vietnam was the inability of the American armed forces to establish friendly relations with the indigenous population.[14] At present, the NATO forces engaged in peacekeeping operations are providing political education to their military oficers. Instead of being merely warriors, the officers are trained as soldier-statesman and as soldier-communicator.[15] Thirdly, some units of the British-Indian Army were specially trained for sub-conventional operations along the frontier. Besides realistic training, these units were composed of personnel who were acclimatized in high altitude light infantry skirmishing duties.[16]

Military Strategy of Independent India

Our case is worse than the French Bourbons. While the latter forgot nothing and learnt nothing, we learnt nothing but forgot everything. We forgot the art of low-intensity operations that the British taught us in the course of the nineteenth century. After 1947, India in the dream of becoming a regional superpower, cocentrated on building an ad hoc arsenal designed for conventional *Kettelschlacht* (cauldron battle).[17] The two conventional battles fought by the Pakistanis in 1965 and 1971 strengthened this line of thinking within the Indian military establishment. After the Bangladesh catastrophe, Pakistan probably perceived that it had no chance against India in conventional set-piece encounters. India's greater strategic depth and four times numerical superiority had put a fullstop to any conventional Pak adventure.[18] Pakistan then reverted to the strategy it had followed in 1947, that is supporting guerrilla bands in the Kashmir valley. India's failure to tackle the Pakistani sponsored guerrillas in Punjab and Kashmir strengthened Pakistan's resolve to continue sub-conventional warfare on a greater scale.

The BJP government in 1998 by introducing the nuclear factor tried to blunt Pakistan's edge in insurgency operations. However, the nuclear weapons proved to be the 'paper tiger' as Mao Zedong had prophesized in the 1960s. India's incapability and unwillingness to launch tactical nuclear weapons or to cross the LOC due to economic and diplomatic pressures from the international community, encouraged Islamabad to escalate the guerrilla war into a medium intensity war at Kargil. The objective was to gain local superiority in order to achieve local and limited political gains.[19]

Instead of *Auftragstaktik*, the Indian Army follows a rigid top down centralized command structure which gives neither autonomy

nor initiative to the local field commanders facing fluid warfighting scenarios. As a result they could not take advantage of rapidly changing firefight scenarios.[20] Due to absence of training in mission command, the Indian land forces failed to react effectively in the initial stages of the Kargil intrusion. Further, the Indian Army's doctrine was designed for attritional warfare instead of maneuver operations aimed to dislocate the enemy through tempo and surprise.[21] The net result was heavy casulalties among the Indian infantry, which in turn made the public jittery. Due to extensive media coverage of the military operations, manpower losses became unacceptable. Probably, the Indian government's aversion to sustain further manpower losses forced Delhi's hand in negotiating with the intruders at kargil.

Towards a Future Force Structure :

The information age warfare paradigm necessitates changes in the tactical doctrines, as well as in the organization of the Indian military which continues to visualize obsolete war-fighting scenarios. The Indian Army is still hankering for Main Battle Tanks (MBTs). The Indigenous MBT has a long history of failure. The Vijayanta tank proved a failure long ago. The recent Arjun tanks' engines are not powerful enough. So the army is thinking of converting them into self-propelled guns. Hence the army is pressurizing the cabinet either to upgrade the T 72s or better to acquire T 90s from the Russians. Why do the generals want tanks? Probably because they are still thinking about a conventional tank battle on the lines of Kursk, Golan Heights, and Khem Karan to occur again between Indian and Pakistan somewhere in the Thar desert. The adage that the generals always prepare for the wrong war at the wrong time is certainly an overstatement but it does contain an element of truth. After the Israeli *Blizkrieg* against the Egyptians of Anwar Sadat's rag-tag peasant army, the world has witnessed no successful tank sortie. The failure of the Israeli armour at the Yom-Kippur War along the banks of the Suez Canal proves that the age of armour has passed and that anti tank artillery is getting stronger day by day. Our anti-tank missile system can take care of whatever tanks Pakistan can acquire from China and Ukraine.[22] And due to the nature of terrain in the probable theatre of operations against China, the Indian Army cannot use tanks. At present the Indian Republic faces the strongest threat from the OOTW conducted by the insurgents backed both by Pakistan and China in Kashmir, Punjab and in the Northeast. And this sort of proxy war by our neighbours is the trend with which we have to live in the future. Will the brasshats tell us which army in the world has used armour in counter-insurgency operation to a successful conclusion?

Airpower is probably the answer for the future. But what sort of military hardware do we need? The IAF's recent acquisition of Sukhoi 30s, which are medium range fighter-bombers, is of doubtful value. Due to limitations in their range and lack of refueling capcacity of the IAF, the Sukhois cannot be used to bomb the Chinese heartland in case of theatre wide warfare with the dragon. So vis-a-vis Beijing, the Sukhois' deterrent value is almost zero.[23] What use are the Sukhois against Pakistan? Pakistan's width is very narrow which would mean that an aircraft such as the MIG 29 could reach any part of that country. The Sukhois' high speed and inability to operate at low altitudes make them almost useless in ground strafing missions against insurgents.

The Mirage 2000 played an important role in blasting the defensive positions of the enemy troops at Kargil. Thus the government's move to order for more Mirages from the French company Dassult aims in the right direction. However, the point to be noted is that the role of airpower in future sub-conventional conflict is limited. NATO's airstrikes during the Kosovo crisis shows this point. Insurgents armed with shoulder launched ground to air missiles could down any hovering aircraft. Even the role of the stealth bomber is highly overrated. The USAF has lost one such aircraft in Kosovo. No air force of the future could tolerate huge losses in skilled pilots and costly airframes. The future is for Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) which are cheap compared to state of the art aircrafts.[24] India would do better to opt for the UAV option than the advanced fighter design (under the Light Combat Aircraft project) with which it is tinkering.[25]

New Delhi is on the right track with its Advanced Light Helicopter (ALH) project. What is lacking is a coherent doctrine for using this item properly. The ALH should be integrated with the army and airforce's planes used for carrying troops. The creation of airborne

or air-assault brigades with its organic medium artillery (for self-sustaining firepower) should be given priority. Such airmobile brigades would function like the American Rapid Deployment Force. These units should be flexible, must be deployable anywhere in 'real time', and would be of great value in future Kargil type operations. They could reach the scene of operations with troop carriers and paradrops. Due to financial stringency, the Indian military may not be able to acquire adequate number of cargo carriers. In such a case the military should enter into negotiations with the commercial airlines. It would be dangerous for us not to take account of the lessons of history. In 1947, the Pakistani backed insurgents were prevented from capturing Srinagar because Indian infantry with medium artillers could be rushed into the valley in the Dakotas left by the British and the Americans in the aftermath of World War II.[26] When the air-mobile combat groups are deployed, the ALH will provide missile firepower and thus could contain the situation and prevent escalation till the foot-slogging infantry catch up.

Even in the information warfare paradigm, infantry remains the queen of the battlefield. The action at Tiger Hill proves this point. The Indian infantry units would have done better if they had developed on the tactics of the counter-insurgency operations evolved by the colonial Indian Army. The field command structure should be flexible to alter the speed of battle by generating synergy without waiting for lengthy directives and detailed plans from the corps headquarters. Some units should be trained for mountain warfare. The Italian and the Swiss Alpine units could teach us a lot in this regard. Such elite units must have integral air transport for rapid deployment. For command and communications, satellite technology needs to be organically linked with them.

And what about naval platforms required by India? It would be too much to argue that the Indian Navy will have no future role. Littoral warfare will be a vital task for the navy. Another important mission of the navy will be to establish a coastal blockade of the hostile state. For such tasks cheap diesel submarines capable of operating in shallow coastal waters, minesweepers and missile carrying frigates are required. Instead of acquiring such platforms, the starry eyed admirals are thinking of buying an aircraft carrier from Russia and if possible to use the naval version of the Sukhois from the aircraft carrier.[27] The admirals should note that due to India's long coastline, land based long range bombers could penetrate deep over the ocean from the coastal airfields.[28] They could be supplemented by shore based medium range ballistic missiles. The experience of the US Navy is illustrative here. The US Navy in spite of having the largest number of operational aircraft carriers accepts that the carrier battle group concept has become inoperable in the new era of warfare. Even the nuclear powered aircraft carriers are now considered as 'sitting ducks' vis-a-vis the land based theatre wide ballistic missiles. Finally, India lacks funds to create a 'Blue Water Navy'. Rather, she sould go for a competent 'Brown Water Navy' which would be able to project power along the enemy shorelines by landing marines and carrying out limited amphibious operations.[29] This would prevent Pakistan from feeding more military assets to the crucial air-land battle.

Conclusion

The Pakistani Foreign Minister, in July 1999 had warned India that there might be "many Kargils" unless India accommodates the demand of the secessionists. If this threat materializes then what should be India's military response? The present Indian armed forces do not have capability to contain several Kargil-like scenarios simultaneously. Would an increase in the size of the military forces rectify this inadequacy? Well, the defence expenditures cannot be raised beyond a certain limit. The belief that the Indian military is underfunded is a myth. The government spends adequate amout of money but it is not properly utilized. One solution is to transform the army from a labour intensive force to a capital-intensive force along the lines suggested above. The politicans must forget the idea of using the army for policing operations in the disturbed regions. The para-military forces must be revamped for this purpose. Once the army is freed from such policing tasks, the size of the infantry could be reduced. This will result in saving much money which at present goes in pay and pensions. This money could in turn be used for a radical modernization of the armed forces.

The irony is that after the collapse of marxism, the guerrillas as pointed out by Lenin and Mao are emerging as a threat to the national politics. However, rather than motivated by the concept of class struggle, the guerrillas of the future would fight due to their primordial attachments. Hence India needs to reshape its force structure radically and quickly. Otherwise defeat and disaster stares menacingly. For survival, it is necessary to remember a few lines from the *Arthashastra*.

There are only two forms of policy, peace and war ..... whoever is superior in power shall wage war ..... of these a wise king shall ..... build forts ..... and at the same time harass similar works of the enemy.[30]

1. Vinod Anand, 'India's Military Response to the Kargil Aggression', Strategic Analysis, Vol. 23, No. 7, 1999, p. 1054.
2. For a discussion of the concept of Information Age Warfare refer to Douglas A. Macgregor, *Breaking the Phalanx : A New Design for Landpower in the 21st Century* (Westport : Praeger 1997), pp. 51-52, 64-65.
3. Alistair Irwin, 'The Buffalo Thorn : The Nature of the Future Battlefield', *Journal of Strategic Studies*, Vol. 19, No. 4, 1996, pp. 229, 231).
4. *Strategic Digest*, Vol. 29, No. 2, 1999, pp. 278-9.
5. Alvin and Heidi Toffler in *War and Anti-War : Survival at the Dawn of the 21st Century* (1993, reprint, 1994), p. 84 introduces the term 'vanishing front' to explain the intermingling of the main battlefront and the home front at the deep rear in near future warfare.
6. For the troubles, which the tank-heavy Russian divisions faced against the Chechen, insurgents see Anatol Lieven, *Chechnya : Tombstone of Russian Power* (New Haven : Yale University Press, 1997). Pavel K. Baev, in *The Russian Army in a Time of Troubles* (London : 1996), writes that the motor-rifle divisions of the Russian Army designed for conventional warfare in central Europe proved useless against the Chechen youghs armed with anti-tank rifles.
7. Kaushik Roy, 'The Transformation of Warfare', (in Bengali), *Anand Bazar Patrika*, 19 August 1999.
8. The data for the IAF's sorties is taken from *Strategic Digest*, Vol. 29, No. 7, 1999, p. 1184.
9. Vinod Anand, 'Future Battlespace and Need for Jointmanship', *Strategic Analysis*, Vol. 23, No. 10,2000, P. 1625.
10. *Strategic Digest*, Vol. 29, No. 4, 1999, p. 727.
11. For an account of the Indian Army's involvement with the trans-Indus frontier tribals during the nineteenth and early twentieth century refer to R.T. Moreman, *The Army in India the Development of Frontier Warfare*,1849-1947 (London : 1998)
12. For the importance of Callwell in imperial policing carried out by the British Army and Britain's colonial forces refer to T.R. Moreman, "Small Wars" and "Imperial Policing" : The British Army and the Theory and Practice of Colonial Warfare in the British Empire', *Journal of Strategic Studies*, Vol. 19, No. 4, 1996, pp. 105-31.
13. John Kiszely, 'The British Army and Approaches to Warfare Since 1945', *Journal of Strategic Studies*, Vol. 19, No. 4, 1996, pp. 179-206. The role of chaos in future battles is emphasized by Clayton R. Newell in, *The Framework of Operational Warfare* (London, 1991), p. 61. For a focus on the human element even in a technologically sophisticated battlespace see Johhn Pay, 'The Battlefield Since 1945', in Colin McInnes and G.D. Sheffield eds., *Warfare in the Twentieth Century* (London, 1988), p. 234.
14. For an account of the failure of the US Army and the success of the Victorian British Army on this front see Robert O' Neill, 'US and Allied Leadership and Command in the Korean and Vietnam Wars', in G.I) Sheffiled, ed., *Leadership and Command : The Anglo-American Military Experience Since 1861* (London : 1997), pp. 188-89.
15. Joseph L. Soeters, 'Military and Public Values : Towards the Soldier Communicator', in L. Parmar, ed., *Military Sociology : Global Prespoctioves* (New Delhi : 1999), pp. 154-56.
16. T. R. Moreman, 'The Indian Army and the Northwest Frontier Warfare', *Journal of Imperial and Commonwealth History*, Vo. 20, No. 1, 1992, pp. 35-64.
17. L. J. Kavic, *India's Quest for Security : Defence Policies, 1947-65* (Berkeley : University of California Press, 1965); Chris Smith, *India's Ad Hoc Arsenal : Direction or Drift in Defence Policy* (New York : St. Martin's Press, 1994).
18. For an account of the conventional battles fought between Pakistan and India see Brian Cloughley, *A History of the Pakistan Army : Wars and Insurrections* (Karachi : Oxford University Press, 1999).

19. Kanti Bajpai rightly argues that nuclear deterrence in South Asia could not stop low-intensity warfare, Kanti Bajpai, 'The Fallacy of an Indian Deterrent', in Amibabh Mattoo (ed), *India's Nuclear Deterrent : Pokhran II and Beyond* (New Delhi : Har Anand Publications 1998), pp. 179, 181.
20. Indian Army's authoriatarian command system could be categorized as *Befehlstaktik*. For a discussion of *Auftragstaktik* and *Befehlstaktik* concepts refer to G. D. Sheffield, 'Introduction : Command, Leadership and the Anglo-American Experience', in idem, ed., n.14, p.4.
21. For a discussion on the maneuver operation concept see J. J. A. Wallace, "Manoeuvre Theory in Operations Other Than War", *Journal of Strategic Studies,* Vol. 19, No. 4, 1996, pp. 209-11.
22. For the uselessness of the MBTs in the era of long-range and hand-held short-range missile weapons see Frank Barnaby, *The Automated Battlefield* (London : 1986). As a response to India's probable acquisition of the T 90s, Pakistan is buying T 80s. *Strategic Digest*, Vol. 30, No. 1, 2000. pp 50-51
23. Bajpai, n.19, pp. 155-66; expecially p. 164.
24. After the experience at Kosovo, where the airforce not only sustained casualties but also failed to destroy the ground targets in the mountainous region, the NATO is thinking of replacing the manned aircrafts with UAVs. *Strategic Digest*, Vo. 20, No. 7, 1999, pp. 1234-1235.
25. Strategic Digest, Vol. 29, No. 6, 1999, pp. 1019-20.
26. L. P. Sen, *Slender Was the Thread*, (New Delhi : 1973)
27. Strategic Digest, Vol. 29, No. 11, 1999, p. 1759.
28. Ashley J. Tellis in 'Aircraft Carriers and the Indian Navy : Assessing in Present, Discerning the Future', *Journal of Strategic Studies*, Vol. 10, No. 2, 1987. pp. 141-67, rightly argues that the Indian aircraft carriers with their limited number of combat aircrafts has no chance against the shore based Pakistani fighter-bombers and the submarines.
29. Raja Menon in *Maritime Strategy and Continental Wars* (London : Frank Cass, 1998) chalks out a realistic naval strategy for medium power like India. Menon emphasizes on diesel submarines for protecting the shorelines and amphibious combat groups for projecting powe along the enemy shorelines.
30. Gerard Chaliand, ed., *From Antiquity to Nuclear Age : The Art of War in World History* (Berkeley : University of California Press, 1994), pp. 287-88.

Kanti Bajpai, Afsir Karim and Amitabh Mattoo (xds.) Kargil and After : Challenges for Indian Policy, N. Delhi : Har-Anand, 2001

Should men be feminists?

Samita Sen

School of Women's Studies, Jadavpur University, Ex-student, Department of History

This time — our time — is characterized by the term "post". Our time is post-colonial, post-modern and in the last few years, it is also being called post-Feminist. A new generation of women in the West — particularly in the USA — are now convinced that feminism has had its day, it has fulfilled its purpose and must now be laid to rest. This generation of women is successful and confident — and equal with men in all ways that they think count.

Whether we agree with this or not—it is difficult to agree with this if you live in India where the vast majority or women are anything but successful and confident and most of them still suffer discrimination, if not outright abuse — we can agree on two things.

First, some, though not all, women have gained enormously from the various women's movements in different parts of the world from the late nineteenth century. For many of us this has been a substantive gain—education, careers, equality in decision-making, ability to assert our rights as women and as individuals and emerging as free citizens in a democratic political order. None of this just 'happened'. For a whole century, women fought in the streets, in parliaments, in the home and the workplace. They pushed their nose into the tent a century ago. Since then Feminism has helped women to think about what it meant to be a woman. Were we ordained by God or nature or social good to stay at home and look after children? In the Age of Reason, there was only one answer. Feminists seized this answer to breach the public world of men on terms of equality.

Unfortunately, and this is the second area of agreement, for most of us this has meant only formal equality — the vote, rights enshrined in constitutions that we have neither the knowledge, information, nor financial means to actualize.

From 1880s to 1980s, Feminism was a movement by women, for women and about women. Men have played critical roles, of course. It was John Stuart Mill who provided the first major liberal argument in favour of women's equality. Friedrich Engels (in the 1880s) gave the first comprehensive social analysis of women's subordination. We understand this very well in India. The chapter on India's modernity and women's emancipation opens with Raja Rammohun Roy, Iswarchandra Vidyasagar and Gopal Krishna Gokhale.

But none of these men were feminists. They sought modernity, democracy and/or socialism. Women—their inequality and subordination—were of secondary concern to them. When women took the leadership of their own movement for freedom and equality -- they began to emphasise how weman were a victim of all kinds of oppression of the state and its agents, of male violence in public spaces and of mental and physical abuse in the home. These forms of violence are perpetrated chiefly by men but also by other women empowered by patriarchy.

Over time, feminists became impatient of this unrelieved gloom. Their experience did not match the women depicted only as victims. Who is a victim? To whom something is done. The term 'victim' virtually precludes the possibility of any action on part of the victim. Is that how women live in society? As a big nothing? To whom things are done but who do nothing—nothing at all but toil and suffer? But the contrary is true, isn't it? Women are part of the bustling bazaar of all human life. They live, they love, they suffer, they also fight back, they crawl, they bargain, they lie and cheat, glory and triumph—in short, they are part of the entire gamut of human experience. So women are actors, they do things—good things and bad things—they are agents, subjects of their own past, present and future. If you slapped my face, I might slap you back—that would be a physical confronation. I might turn the other cheek—that would a moral confrontation. It is highly unlikely that I would just do nothing at all!

So women started as victims, came to be understood as agents and actors. But it's still all about women. What about the other part of the equation? The oppressor, the one who slapped my face in the first place—the men?

Educators in Britain are facing a novel problem. Girls are outperforming boys at all levels of the education system. British teachers are pondering a return to segregated schooling, "to enable boys to open up and find their own level". A few decades ago, this was the argument in favour of girls' schools and women's colleges. Have we come full circle? More grist for post-feminist mill? If the nineteenth and twentieth centuries were about the 'Women's Question', is the twenty-first century moving towards an equally intractable 'Men's Question?'

As I mentioned earlier, if you happen to live in India, you would return an unproblematic and emphatic 'no'. There are no indices by which women are ahead of men. The vast majority of women still suffer discrimination, if not outright abuse.

From the 1980s, however, feminists have insisted that women's emancipation is as much about men as women. At the very least this is about a relationship—the relationship between men and women. We even found a simple term for this—we called it gender. Gender is not really about living breathing men and women. It is really about their qualities and associations—it is about masculinity and femininity. It is more about how we understand the meanings and characteristics of men and women. Not the physical-sexual entities that are men and women but how we live or expect to live as men and women in particular social, cultural and historical contexts. There is nothing—nothing at all—that is fundamental or natural in maleness and femaleness. Even nature is what we understand it to be.

This takes us to the next significant problem : if women are trapped by feminity and need to overcome it, then so are men trapped into masculinity—and, most emphatically, need to overcome it.

Feminism has helped women to extend and expand the scope of their gender identity. Women have remained comfortable in their traditional domains—as mothers and homemakers—while making a bid for a place in the male world. We can knit when we want to or play cricket. We can assert our difference by wearing a sari when we wish or don suits and trousers when wished or required. We can choose to be full-time parents or decide to work for our living or pursue a dream or an ambition. Some of these may be superficial freedoms, some may be more substantive, some may be able to exercise more choices than others—but in a general way it gives women a wider playing-field, a larger universe in which feminine values of nurture and harmony can be negotiated along with aggressive masculine values of competition and confrontation.

What about men? In the 1980s, there were two responses from men to feminism. I call the first the 'Iron John' response after the name of a book by the poet, Robert Bly. This proposes a celebration of traditional masculinity against a perceived threat of feminism. The second is the 'New Man' response—first brought to our notice in the cult Hollywood film—Kramer vs. Kramer. It is significant that almost twenty years down the line, Bollywood came up with a re-make of this film. Indian audiences, it appears, are finally ready to give the New Man a hearing. The so-called 'metrosexual' man is one avatar of the New Man, but the first impetus in the 1980s was a broader one. The New Man was an attempt to rework masculinity in response to feminist thinking. One aspect of this craft was to stretch the notion of masculinity to include the world of nurture and homemaking from which men have so far been excluded.

The New Man meant freedom—important freedoms for many men. For the little boy, for instance, who likes food and would love to potter among mother's pots and pans. It may mean freedom for the man who wished to create a home to wield a duster and broom. It might spell a new freedom for the father who would prefer to feed and change the baby, play and learn with young children rather than spend long boring evenings drinking and swearing, wheeling and dealing.

But it is only a freedom. It gives you a choice. You can do it if you wish, not if you don't. A greater range of choices can never be a bad thing, surely? But, freedom creates responsibilities. The New Man must understand a new and greater sharing with women—in all our worlds.

Of these, the most contentious is the home—it is in the domestic field that tasks have been most resistant to re-negotiation. The

Indian middle class have been singularly fortunate in that the availability of domestic wage-labour has allowed us to avoid confrontation over division of domestic tasks. But progress and modernity, if achieved, will one day bring that question before us. Shall we be ready with the New Man by *then*?

Will we make a peaceful transtition to a new society in which men and women will follow their own dreams and desires without being bothered by what is 'manly' or 'womanly'? Will it ever be enough to be human? A time when to be a man or a woman will not create friction, poison, and violence? The expression of difference will not entail exertion of power so much as an exercise of personal choices. Can we derive pleasure rather than pain from our differences?

Is that Utopia near at hand? Is it even reachable? For it to be, men must turn to Feminism. Women have gained from feminism and can talk about post-feminism. Post-feminism is both a salute to feminism and a declaration of coming of age. It is now surely the turn of men. To seek, to ask *as we have done for a century,* what is it to be a man? Do you have to be a man in the way you are told you have to be a man? Is there no better way?

Feminism has helped women—some women—to recreate their world in a better mould. Why should men be left behind? Is the power to oppress women worth sacrificing your own freedom? Why cut your nose to spite your face? Join us instead to explore a whole new gamut of experience. In the process, may be, we will all be fully human, not just men or women.

Artist : *Vincent Van Gogh*

বিজ্ঞান-শিক্ষার নামে যা চলছে ও অধ্যাপক শ্যামল সেনগুপ্ত

দীপাঞ্জন রায় চৌধুরী

অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত), পদার্থবিদ্যা বিভাগ

প্রেসিডেন্সি কলেজে আমরা যখন পড়েছি তখন বিভাগে বিভাগে বড় মাপের মানুষের দেখা পাওয়া যেত। পদার্থবিদ্যা বিভাগে ধীর পদক্ষেপে বিচরণ করতেন অমল রায় চৌধুরী আর দ্রুতগতিতে চলতেন শ্যামল সেনগুপ্ত। তাঁদের কাছে যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন সে সময় পৃথিবীর কোনও পদার্থবিদ্যা বিভাগে এক রিচার্ড ফাইনম্যান ছাড়া তাঁদের সঙ্গে তুলনা চলতে পারে এমন আর কোনও শিক্ষক ছিলেন না। কিন্তু মানুষ হিসেবে এঁদের মাপের কাছে সেটাও সামান্য ব্যপার।

শিক্ষা সম্পর্কে শ্যামল বাবুর খুব পরিষ্কার মতামত ছিল। তিরিশ বছর সাম্মানিক প্রাক-স্নাতক স্তরে ও কয়েক বছর স্নাতকোত্তর স্তরে পড়ানোর শেষ দিকে শিক্ষা ও গবেষণা সম্পর্কে তাঁর ধারণাগুলি বলতে ও লিখতে শুরু করেন তিনি। এই প্রবন্ধের অনেকটা জুড়ে থাকবে সেই সব চিন্তার বিবরণ।

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের পঠনপাঠন ও পরীক্ষা ব্যবস্থায় গুরুতর গলদ আজ আর লুকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। এই পরীক্ষাগুলিতে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীও 'নেট' বা 'স্লেট' পরীক্ষায় বিফল হচ্ছে।

২০০৬ সালে পরীক্ষার্থীদের ৪.৭১% 'স্লেট' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সাধারণ ভাবেই এই দুটি পরীক্ষাতে উত্তীর্ণের হার ৪ থেকে ৫%-র মধ্যে ওঠানামা করেছে।

'নেট' বা 'স্লেট' পরীক্ষার পাঠ্যক্রম স্নাতকোত্তর স্তরের থেকে কিছু আলাদা নয়। সমস্যা একটাই। পুরো পাঠক্রমের ভিতর থেকে অনেক ছোট ছোট প্রশ্ন থাকে যেগুলি সাধারণভাবে স্নাতকোত্তর পরীক্ষার প্রশ্নের মতো প্রায় নির্দিষ্ট সাল পর পর 'রিপিট' হয় না, ফলে কয়েকটি মুখস্থ করা প্রশ্ন অথবা বিশেষ ধাঁচের বিশেষ 'ট্রিক্স'ওয়ালা কিছু সনাতন অঙ্ক 'কমন' পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। অন্তত পদার্থবিদ্যায় ধসের এটাই কারণ।

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের ক্লাসে পড়ান হয় বক্তৃতা পদ্ধতিতে। অল্পসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর গ্রুপে গ্রুপে শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা, দু পক্ষের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কঠিন বিষয়ের মর্মে প্রবেশের কোনও শিক্ষণ পদ্ধতির অনুপস্থিতি সম্বন্ধে শ্যামলবাবু ছাড়া কেউ সোচ্চার হননি (চিন্তা নিশ্চয় অনেকেই করেছেন কিন্তু শ্যামলবাবুর মতো অরণ্যে রোদনে তাঁরা তাঁদের মূল্যবান সময় ও জীবনীশক্তি ব্যয় করেন নি।) এই অনুপস্থিতি আগ্রহী ছাত্রছাত্রীকেও বক্তৃতার অনুলিপি অনুসারে, কিছু বুঝে কিছু না বুঝে সম্ভাব্য প্রশ্ন মুখস্থ করে পরীক্ষার জন্যে তৈরি হতে বাধ্য করে।

(আমার সমসাময়িক সত্যিকারের শিক্ষানুরাগী অধ্যাপকেরাও সমস্যা কত গভীরে তা বুঝতে পারতেন না। সমস্যার গভীরতা তাঁদের হাতে-কলমে একবার দেখাতে পেরেছিলাম। তখন প্রেসিডেন্সি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার স্নাতকোত্তর পরীক্ষা হতো একসঙ্গে। মৌখিক পরীক্ষার একটি বোর্ডে আমি প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে একই প্রশ্ন করি। এরা সকলেই কয়েক দিন আগেই কোয়ান্টাম বলবিদ্যা সংক্রান্ত ৫০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা দিয়ে উঠেছে। তার আগে প্রাক-স্নাতক স্তরে তাদের কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় হাতে খড়ি হয়েছে। আমার প্রশ্নটিও ছিল হাতে খড়ি পর্যায়ের। আমি বলি একটি কোয়ান্টাম ব্যবস্থার দুটি শক্তি স্তর আছে। ব্যবস্থাটির যে কোনও অবস্থায় যদি শক্তি মাপা হয়, কী ফল হবে? এক জনও সঠিক উত্তরটি বলতে পারে নি ঃ হয় একটি স্তরের শক্তি পাওয়া যাবে মাপার ফল হিসেবে, নয় অন্যটির। আমার কোনও সন্দেহই নেই কোয়ান্টাম বলবিদ্যার লিখিত পরীক্ষায় এদের অধিকাংশই অনেক নম্বর পেয়েছিল। কিন্তু বিষয়টির ব্যাপারে তাদের প্রাথমিক ধারণাটুকুও তৈরি হয় নি।)

অবশ্য অনুলিপি নেওয়া যায় (যার ক্লাসের অনুলিপি যত সরাসরি পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্ন তৈরি করতে সাহায্য করে সেই শিক্ষক তত ভালো!) এমন বক্তৃতামালার বদলে বিষয়টি সকলে পড়ে আসবে ও ক্লাসে বিষয়ের ভিত্তি এবং কঠিন ও জটিল বা গভীর তাৎপর্যের দিকগুলি নিয়ে চর্চা হবে, বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী সেটি চাইবে না। এই প্রেসিডেন্সি কলেজে শ্যামলবাবু তাঁর নিজের প্রাক-স্নাতক ক্লাসে এ ধরনের শিক্ষণ পদ্ধতি চালু করার চেষ্টা করেন। ফল? যাঁর ক্লাসে ছাত্রছাত্রী ভেঙে পড়ত, তাঁর ক্লাসে ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি কমে গেল, প্রচার হলো উনি আর ভালো পড়ান না।

প্রাক-স্নাতক স্তরে ছাত্রছাত্রীরা বরং যায় প্রাইভেট পড়ানোর টোলে, যেখানে কারবার বিজ্ঞানেরও নয়, শিক্ষারও নয়, নিতান্তই সম্ভাব্য প্রশ্ন ও চালু অঙ্কের। কেন? এর সরাসরি ও আপাতদৃষ্ট উত্তর, প্রশ্নপত্র এই রকম বলে। সারা বছর বক্তৃতা শুনে, অনুলিপি লিখে, পাঠ্য বই পড়ে, গ্রন্থাগারে গিয়ে বিশেষ প্রসঙ্গের জন্য বিশেষ বই খুঁজে, ভাবায় এমন অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর ও অঙ্কে ঢুকে এবং সর্বোপরি বিষয় নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তার ফল নিয়ে সতীর্থ ও শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করে — সবের পরও সম্ভাব্য প্রশ্ন মুখস্থ করেই যদি পরীক্ষা দিতে হয়, তবে ঐ কঠিন ঘুরপথে না গিয়ে টিউটরের নোট ও কষে দেওয়া অঙ্ক নিয়ে ৪৫ দিন বোধবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে গাঁক গাঁক করে মুখস্থের সোজা ও ছোট রাস্তাই ধরব। (ক্লাসে পড়ানোর পদ্ধতি এক রেখে, ভেবে করতে হবে অথবা 'কমন' পড়বে না চার ঘন্টার প্রশ্নপত্রে এমন প্রশ্নের অনুপাত ক্রমাগত বাড়িয়ে চলা'ও সমাধান নয়। তাতে "নেট"এর মতো ফলাফল হবে এবং ভেবে উত্তর বার করতে সক্ষম শিক্ষার্থীরও ফল যথার্থ হবে না যদি তার ভাবতে সময় লাগে।)

কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। শিক্ষার্থী নিজে তো বুঝছে যে তার বিষয়টির ওপর অধিকার আসছে না। সে কেন ভুল পথে ঘুরে মরছে? তার কারণ শিক্ষার্থীদের একটা বিরাট অংশ বিজ্ঞান পড়তে এসেছে অনিচ্ছায়। তারা বাড়িতে, বিদ্যালয়ে, সংবাদ মাধ্যমে জেনেছে তথ্যপ্রযুক্তির মোটা মাইনের চাকরি পাওয়াই ইষ্টলাভ ঃ লেখাপড়া করে যে, সেক্টর ফাইভে বসে সে। কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তি সেক্টরে আর ক'টা চাকরি হবে? তার ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও ইউরোপে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে বিপুল বিনিয়োগের ফলে প্রসার্যমান কোম্পানির কম্পিউটার ব্যবহারে অনুশীলিত কিন্তু সস্তা শ্রমের খোঁজই মূলত এ দেশে এই সেক্টরে তেজী ভাব বজায় রেখেছে। ফলে এই সেক্টরে চাকরির অবস্থা পশ্চিমের অর্থনীতির হালচালের ওপর নির্ভরশীল। এই মুহূর্তে যেমন সেক্টর ফাইভে 'হায়ারিং ফ্রীজ' চলছে, নতুন নিয়োগ বন্ধ। এই সেক্টরের অনিশ্চিত হাতছানি ছাড়া অন্য কোনও ক্ষেত্র নেই যেখানে যথেষ্ট চাকরি বা পেশাদারি উদ্যোগের টান আছে। ফলে নৈপুণ্য, ইচ্ছা বা প্রবণতা নির্বিশেষে ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞান পড়তে আসে।

এই পরিস্থিতিতে বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য বলে কিছু বাঁচে না, যে লক্ষ্য শ্যামলবাবুর মতে হওয়া উচিত প্রধানত "প্রকৃতির অনুধাবন ....। .... এই প্রাথমিক লক্ষ্য ভুলে যদি আমরা বিজ্ঞান শিক্ষাকে খালি পাঠ্যবই অধ্যয়নের এক পূজাপাঠে সীমাবদ্ধ করে দিই তবে জানব পথ ভুল হয়েছে"। এছাড়া "প্রত্যাশা থাকবে বিজ্ঞান শিক্ষার ফলে ছাত্রছাত্রী আশেপাশের জগতের কিছু বাস্তব সমস্যা সমাধানে সমর্থ হবে। তার বদলে যদি দেখা যায় তারা কেবল পরীক্ষাপত্রের কৃত্রিম সমস্যার জগতেই সাবলীল, প্রকৃতির বাস্তব সমস্যার জগতে অসহায় তা হলে বুঝতে হবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে"।

কলেজের এই লক্ষ্যভ্রষ্ট শিক্ষা "প্রায় সম্পূর্ণ ভাবেই পরীক্ষা দিয়ে নির্ধারিত বলে শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত ক্রিয়াকলাপের মধ্যে একটা বাস্তব বিবর্জিত উপাদানের প্রবেশ ঘটে। কোনও অংশের আলোচনায় যথেষ্ট জোর পড়বে কি না সেটি পদার্থবিদ্যা অধ্যয়নে তার কতটা প্রাসঙ্গিকতা ও তাৎপর্য তাই দিয়ে নির্ধারিত হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় এই অংশের থেকে কত ঘন ঘন প্রশ্ন আসে সেটাই একমাত্র বিচার্য বিষয়। পরীক্ষার জন্যে কোনও অংশ গুরুত্বপূর্ণ সাব্যস্ত হলে সেটি আলোচিত হয় এমন ভাবে যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গতানুগতিক প্রশ্নাবলি ভাল ভাবে উত্তর করা যায়। এরজন্য বিচার বিবেচনা আলোচনার প্রায়শই দরকার থাকে না। গেদে মুখস্থ বেশি জরুরি।"

এইভাবে সারা দেশের কলেজে কলেজে বিজ্ঞান পড়ার নামে সময়, ক্ষমতা, অর্থের যে অর্থহীন অপচয় চলছে তা শ্যামলবাবুকে উত্তরোত্তর বিরূপ করেছে। ২০০২ সালে এসে তিনি বললেন ঃ "তুমি সিলেবাসের মধ্যে কত ভাল করে প্রশ্নের উত্তর তৈরি করতে পার — এভাবে সায়েন্স বা ফিজিক্স হয় না। প্রশ্ন হচ্ছে আসল, প্রশ্ন যত বেশি হবে পড়া তত ভাল হবে। ছাত্র প্রশ্ন করে না, শুধু শুনে যাচ্ছে — আমি অনেকবার আমাদের ছাত্রদের এই ছবিটা এঁকে দেখিয়েছি। একটা বই আছে। সেই বই থেকে শিক্ষক একটা জিনিস প্রেজেন্ট করছেন। ছাত্ররা সেটা শুনল। তারপর সেটাই রিপ্রোডিউস করল। অরিজিনাল বইটার সঙ্গে যত ভালো মিলবে তত ভালো উত্তর। .... এটা কি পড়াশোনা, এটা তো য়্যাবসার্ড ড্রামা।" আর নাটক তো আরও য়্যাবসার্ড হচ্ছে, ছাত্রছাত্রী ক্লাসঘরে শোনা বা বই পড়ারও ধার ধারছে না, এখন তারা টিউটরের নোট ছাড়া আর কিছুই মুখস্থও করবে না।

ছাত্রছাত্রী আর শিক্ষক প্রাকৃতিক ঘটনা ব্যবচ্ছেদ করছেন যৌথভাবে। তাঁদের কথোপকথনই সেই জ্ঞানাঞ্জন শলাকা যা সত্যের হিরন্ময় পাত্রের আবরণ উন্মোচন করছে, ক্লাসঘরের চেয়েও এই আদর্শ বাস্তব করার প্রকৃষ্ট জায়গা পরীক্ষাগার। শ্যামলবাবু তাঁর ছাত্রদের উৎসাহিত করেছেন যা কিছু নিয়ে খটকা লাগছে তাই নিয়ে পরীক্ষা করতে, বিশ্লেষণ করতে। চল্লিশ জনের মধ্যে হয়তো পাঁচ ছ' জনের মনে রবীন্দ্রনাথ যে প্রদীপের কল্পনা করেছিলেন তা জ্বলেছে। উচ্চ মাধ্যমিকের সেই সামান্য পুনঃশিলীভবন, রিজিলেশনের সমস্যা নিয়ে গরমের ছুটিতে রোজ চার পাঁচ ঘন্টা ধরে তারা কাজ করেছে।

খটকা লাগাটাই আসল। সমস্ত আবিষ্কারের জন্ম কোনও না কোনও খটকাতে।

কিন্তু প্র্যাকটিকালের নাম করে কলেজগুলির পরীক্ষাগারে কী চলে? কিছু যন্ত্রে 'রিডিং' নিয়ে পাঠ্যপুস্তকে আঁকা সারণী ভরানো আর সেই 'রিডিং' থেকে ফরমূলায় বসিয়ে 'রেজাল্ট'

এনে বইতে লেখা মানের সঙ্গে মেলানো। না মিললে কোথায় কী ভাবে জল মেশাতে হবে সবারই জানা। কেন এই ভাবেই পরীক্ষাটি করা হচ্ছে, কেন এই যন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে ঐ যন্ত্র নয়, মাপার যে ভুল তার প্রভাব কোথায় কেমন, হাজার প্রশ্ন মনে আসবেই পরীক্ষাগারে। প্র্যাকটিকাল সিলেবাস ও বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার উদ্দেশ্য হলো ছাত্রছাত্রী যাতে কোনও প্রশ্ন না করে হাতের খুব নৈপুণ্য, 'স্কিল' সহকারে তখনকার চালু প্র্যাকটিকাল পাঠ্যবইয়ের মতো করে পরীক্ষাটা নামিয়ে দিতে অনুশীলিত হয়, মনে আসা প্রশ্ন গিলে ফেলতে শেখে, গিলে ফেলতে এতটাই পটু হয়ে ওঠে যে মনে আর প্রশ্নই না আসে।

পাখি যখন আর গায় না, যখন আর ডাকেও না রাজা ও রাজা সভা তখনই সন্তুষ্ট।

শ্যামলবাবুর কশাঘাত তাই প্র্যাকটিকালের নামে যা চলে তার জন্য বিশেষ ভাবে সংরক্ষিত।

"বর্তমানে আমরা এক্সপেরিমেন্টকে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসাবে দেখে থাকি। এ ভাবে দেখলে এক্সপেরিমেন্ট আগ্রহ সঞ্চারে ব্যর্থ তো হবেই, বরং বোঝা হয়েই দাঁড়াবে।"

আবার, "লক্ষ্য হল কেমন করে নির্ধারিত সময়কালের মধ্যে নির্দেশিত এক্সপেরিমেন্টগুলির সেটটি শেষ করে ফেলা যাবে। অসুবিধা বা সমস্যা দেখা দিলে সেগুলি ধামাচাপা দিয়ে কোনও না কোনও ভাবে 'ভালো উত্তর' বার করা হবে।"

বিজ্ঞান প্রকৃতি থেকে উদ্ভুত প্রশ্নের সমাধানের পদ্ধতি। থিওরি পড়ার সময় ছাত্রছাত্রী চাইলে আর কিছু না হোক ভালো পাঠ্যপুস্তকের প্রশ্ন সমাধানের মাধ্যমে এ ব্যাপারে অনুশীলন চালাতে পারে। কিন্তু আমরা দেখেছি এক্সপেরিমেন্টকে নিতান্তই জানা জিনিসের সঙ্গে জানা উপায়ে সংগৃহীত কিছু তথ্যকে মেলানোর কাজ হিসেবে দেখা হয়। মনে প্রশ্ন আসার কোনও স্থান নেই, সুতরাং সমাধান খোঁজার কোনও ব্যাপার নেই। এখানেই শ্যামলবাবুর আপত্তি। তিনি ক্রমানুসারে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন এই ভাবে।

(১) প্রতি স্তরে জোর দিয়ে বলা দরকার যে, পরীক্ষাভিত্তিক ফিজিক্স প্রশ্ন সমাধানেরই একটি পদ্ধতি।

(২) ক্লাস ঘরে এক্সপেরিমেন্ট দেখানো বক্তৃতার সম্পূরক কাজ; বিনোদন হিসেবে নয়, এক্সপেরিমেন্ট করলে যে সমস্যাগুলি সামনে আসবে তাদের বিশ্লেষণ এখানে পড়ানোর অঙ্গাঙ্গী অংশ।

(৩) স্বাধীন চিন্তা ও ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে সমাধানের সম্ভাবনা আছে এমন প্রশ্ন নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে।

(৪) নির্দিষ্ট সূক্ষ্মতা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে পরিমাণ মাপার কিছু এক্সপেরিমেন্ট।

(৫) কিছু বিশেষ ক্রিয়া প্রদর্শনের লক্ষ্যে গুণবোধক কিছু এক্সপেরিমেন্ট।

(৬) ভৌত রাশির মানের আন্দাজ করার পদ্ধতি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে পরিমাণ মাপার কিছু এক্সপেরিমেন্ট।

(৭) যন্ত্র কেন ভুল পাঠ দিয়ে চলেছে তা নির্ণয় করা।

(৮) নতুন এক্সপেরিমেন্ট বসানো।

পঠন পাঠনের অবস্থার হাল হকিকত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অজানা নয়। অনেকেই নিজের নিজের উপলব্ধি অনুযায়ী ছোট বড় পরিবর্তনের চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু শ্যামলবাবুর জীবনের অভিজ্ঞতা, "শিক্ষা ব্যবস্থা নতুন ভাবনা ও পরিবর্তন গ্রহণ করতে রাজি না, যে ত্রুটিগুলি শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীর চোখে পড়েছে তার কোনও সুরাহা নেই। ফলে, তাদেরও এই ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া ছাড়া অন্য গতি থাকে না। এমন পরিস্থিতির মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের খুব বড় একটা অংশ পদার্থবিদ্যাকে যে দৃষ্টিতে দেখে তা একান্তই স্থানু, তাতে নেই বাজিয়ে নেওয়ার মনোভাব বা আদৌ কোনও ভাবনা চিন্তা। .... যত দিনে তারা নিজেরা শিক্ষক হয় তত দিনে তারা চালু ব্যবস্থাকেই পদার্থবিদ্যা পঠন পাঠনের এক মাত্র সম্ভাব্য পদ্ধতি বলে মেনে নিয়েছে .... এক বিষচক্র এ ভাবে পূর্ণ হয় ..... চিরন্তন হয় চালু ব্যবস্থা।"

এই সব রোগের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের (বা বিদ্যায়তনের) পরীক্ষাকেই শ্যামলবাবু প্রধানত দায়ী করেছেন। "বাস্তব বাধার গুরুত্ব না কমিয়েও জোর দিয়ে বলা দরকার যে, আমাদের অনুসৃত অকেজো, পরিবর্তনহীন, মান্ধাতার আমলের পড়ানো ও পরীক্ষার ব্যবস্থাই বর্তমান অবস্থার জন্যে দায়ী .... এই ব্যবস্থার সারাৎসার বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পরীক্ষাকে ঘিরে সারা বছরের পঠন পাঠনের ক্রিয়াকলাপ।"

আমরা যে ভাবে প্রাক স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াই তাতে ছাত্রছাত্রীর মনে বিষয়ের ভিত্তি কি স্থাপিত হয়, স্থাপিত হওয়া কি সম্ভব? স্নাতকোত্তর স্তরে তড়িৎ বলবিদ্যা পড়িয়েছি। আমরা বক্তৃতার অনুলিপি ধরে ছাত্রছাত্রীরা জ্যাকসন, প্যানফস্কি য়্যাণ্ড ফিলিপস'এর মতো লেখকদের বই থেকে কমপ্লেক্স সমাকলন ও ফুরিয়ে পরিবর্ত কন্টকিত সূত্র এবং

সিদ্ধান্তের সোপান মুখস্থ করেছে এবং পরীক্ষায় কবিতার মতো লিখে এসেছে। আমি নম্বরও দিয়েছি দরাজ হাতে। এদের বেশ কয়েকজন এখন স্কুলে পড়ায়। যে গভীর বোধ সৃষ্টি হলে স্কুলের পাঠ্যবইয়ের গোলানো বাক্য সমাহার থেকে, ধরা যাক বিভব প্রভেদ ও তড়িচ্চালকবলের পার্থক্য (তিন নম্বর, তিনটি পার্থক্য!) স্কুলের ক্লাসে পড়ুয়াদের কাছে সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, আমি জানি তা আমি সঞ্চার করতে পারিনি। অথবা ধরি উচ্চমাধ্যমিক ক্লাসে হঠাৎ প্রশ্ন এল এস.আই. এককে কুলম্বের সূত্রে ৯ x ১০^{৯} মানের অদ্ভুত সংখ্যাটি কেন আসে। আমার তড়িৎ বলবিদ্যা পাঠক্রমের ক'জন ছাত্রছাত্রী বলবেন তাঁদের বি.এস.সি., এম.এস.সি ক্লাসে যে জ্ঞানভিত্তি গড়ে উঠেছে তা এতটাই মজবুত যে আগের দিন পড়া না থাকলেও এরকম প্রশ্ন পেলে তাঁরা বিনা কালক্ষেপে উত্তর দিতে পারবেন? আমার সদিচ্ছার অভাব ছিল না, কিন্তু পরীক্ষার জন্যই ব্যবস্থা, বিষয় বোঝার জন্য নয়। ছাত্রছাত্রীদেরও সে ভাবেই মগজ ধোলাই হয়ে ছিল। পরীক্ষার প্রশ্ন ধরে বক্তৃতা না করলে আমার ক্লাসও ফাঁকা হয়ে যেত।

আমি মাঝে মাঝে ভাবি আমার ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে কেমন পড়াচ্ছে। তারা কি বিষয়ের মূল পর্যন্ত যেতে ছাত্রছাত্রীকে উৎসাহিত করছে, বিজ্ঞান যে প্রকৃতিকে বোঝার পদ্ধতি তা বোঝাবার জন্য ক্লাসঘরে পরীক্ষা দেখিয়ে তার বিশ্লেষণ থেকে পড়ানো শুরু করেছে? ক্লাসঘরে আমি যে দৃষ্টিভঙ্গী তাদের মনে গ্রথিত করতে পারি নি তা কি তারা তাদের ছাত্রছাত্রীর মনে পারছে গ্রথিত করতে? অন্ততপক্ষে তার চেষ্টা করছে? না কি গুলিয়ে দেওয়া পাঠ্যপুস্তকে দাগ দেওয়াচ্ছে মুখস্থ করার জন্য?

আমি বলছি না যে, কোনও স্কুল শিক্ষকই বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করে ছাত্রছাত্রীর কাছে তার মর্মবস্তু ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা রাখেন না। কিন্তু যাঁরা রাখেন তাঁরা নিজের তাগিদে নিজের চেষ্টায় এই ক্ষমতা অর্জন করেছেন, এ ব্যাপারে বি.এসসি.-এম.এসসি. ক্লাসের ভূমিকা কম, নেতিবাচক (অর্থাৎ বিষয়কে মূল থেকে বোঝার পরিপন্থী) হলেও আশ্চর্য হবো না।

এই অবস্থা থেকে বেরোনোর প্রথম ধাপ হিসেবে শ্যামলবাবু পরীক্ষা ও পড়ানোর ক্ষেত্রে আমূল এক পরিবর্তনের পক্ষপাতী। ক্লাসে বক্তৃতার অনুপাত কমিয়ে বাড়াতে হবে আলোচনা। বিষয়বস্তুর রূপরেখা সম্পর্কে শিক্ষক প্রাথমিক কিছু বলে নিয়ে তারপর বই ও পড়ার অন্যান্য মাল-মসলার উৎস নির্দেশ করে দেবেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি ছাত্রকে সমাধানের জন্য প্রশ্ন দেবেন এবং প্রতিবেদন লিখতে দেবেন। কাজ শেষ হলে তিনি সই করে মতামত লিখে তা জমা রাখবেন। যে যখন একটি বিষয়ের পাঠ শেষ করবে তার সম্পর্কে মূল্যায়ন ও তার করা কাজ বিভাগে জমা পড়বে। পাঠ্যক্রমের সমস্ত বিষয় শেষ করলে কলেজ তাকে এই পূর্তির একটি শংসাপত্র দেবে। এটাই তার ডিগ্রি। এই সময় জমা রাখা কাজ ও মূল্যায়নের প্রতিবেদনগুলি ফেরৎ দেওয়া হবে। ছাত্র যদি সাম্মানিক বিষয়ে তার মান জানতে চায় তবে ফেরৎ আসা নথি সহ তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় একটি বোর্ড বসাবে— যে নথিগুলি দেখে ও পরীক্ষার্থীর সঙ্গে আলোচনা করে একটি গ্রেড অর্পণ করে তার মান নির্দেশ করে দেবে।

রক্ষণশীলতা যতই বিরোধিতা করুক, উচ্চ শিক্ষার পদ্ধতিতে পরিবর্তন এই পথেই আসছে। এখন বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে বলে বিশ্ববিদ্যালয় এক থেকে বহু হয়েছে, এসেছে কলেজকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার পালা। বিশেষত সব গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় 'নেট', 'স্লেট', 'গেট' বা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পরীক্ষা মারফৎ বাছাই করে। রেল, ব্যাংক সহ নানা সরকারী প্রতিষ্ঠানেরও নিজস্ব পরীক্ষা আছে। সরকারী ও বেসরকারী নানা প্রতিষ্ঠান রংরুটকে শিক্ষিত ও অনুশীলিত করে নেয়। ফলে ডিগ্রির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার আবশ্যকতা কমছে।

কিন্তু যেহেতু আমরা দেখেছি ছাত্রছাত্রীসংখ্যার বিপুল অধিকাংশই এসেছে বাধ্য হয়ে, আগ্রহে নয়, তাই তৎসত্ত্বেও আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক পড়াশোনা চালু হওয়া মুস্কিল। এমতবস্থায় স্বায়ত্তশাসনের ফলে মানোন্নয়ন হবে কি না সন্দেহ। এক মাত্র কর্মসংস্থান বাড়লে তবেই বিভিন্ন পেশা ও পরিষেবার টান বাড়বে, বাধ্য হয়ে বিজ্ঞান পড়ছে এমন পড়ুয়ার সংখ্যা কমবে। তখন পড়ুয়ারাই ক্লাসঘরে পড়ানোর পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্য চাপ দেবে। সমাজের সামগ্রিক চিত্রের নিরিখে শ্যামলবাবু সময়ের থেকে এগিয়ে আছেন। তিনি ভবিষ্যতের মানুষ আমরা তাঁর চিন্তা অনুসারে কাজ করতে অপারগ। তাই তাঁর ছাত্রছাত্রীরা একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হওয়া সত্ত্বেও কোথাও কেউ তাঁর জরিপ করা পথে একটি পদক্ষেপও নেন নি।

অবশ্য সমাজ অসমান। ফলে একটু সাহস করলে দীর্ঘ বিলম্ব না করেও প্রেসিডেন্সি ও অন্য কিছু বিদ্যায়তনের শ্যামলবাবুর পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতেই পারে। যে হেতু এই পরিকল্পনায় ছাত্রছাত্রীর ইচ্ছা, আগ্রহ ও উদ্যোগই সাফল্যের চাবিকাঠি, আজকের চালু 'য়্যাবসার্ড নাটকের' পরিবর্তে অর্থপূর্ণ শিক্ষা প্রচলনের উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হওয়াটা খুবই জরুরি।

জ্যেষ্ঠবিকেল

শঙ্খ ঘোষ

তোমরা চলে গেছ দাক্ষিণাত্যে-
বললে বলা যায় এ-রকম।
কাগজ কলমের বৃত্তে বন্দী
সাধ্য নেই আর জীবনে মন দিই
গলির আলো খুব গোপনে নেমে আসে
চোখের আলো পাই আরো কম!

কেই-বা পারে আজ সহজে কাঁদতে
বয়স হলে সেটা ভালো না।
ভালো না ভেদ করা সুখে ও দুঃখে
ভালো না যদি দেখি জ্ঞানী বা মূর্খে
জ্যৈষ্ঠবিকেলের এমন হাওয়াকেও
নিজেরই দিকে করে চালনা।

লড়াই লাগে যদি অহং-এ আত্মে
ঠাট্টা দিয়ে তবে মুক্তি!
পাথরে ছুটে আসে সান্ধ্য ঘূর্ণি
শরীরে বিব্রত পথের সুর নিই
উড়িয়ে দিই সব বইয়ের অক্ষর
নইলে বেঁচে আর সুখ কী!

নেড়ি কুত্তা ৫

অরুণ কোলাটকরের মূল ইংরেজি থেকে অনুবাদ

নবনীতা দেব সেন

কুকুরের প্রতি মানুষের বশ্যতার
গাঢ়তর কোনো উদাহরণ চাইলে,
আমাদের যেতে হবে ইতিহাস পেরিয়ে,

কয়েক সহস্র বছর টপকে এসে,
একটা বৈজ্ঞানিক রূপকথা তুলে নিতে হবে,
হারল্যান এলিসনের "একটি ছেলে এবং তার কুকুর"

সর্বত্র নেড়ি কুত্তাদের কাছে বইখানা গীতার মতো
যেখানে উক্ত বই এর 'ছেলেটা'
বলি দান করে নিজের প্রেমকে
এবং কুকুরের খাদ্য হিসেবে পরিবেশন করে
প্রেমিকাকে, কেবল তার অভুক্ত
সারমেয় প্রভুটির প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে।।

দুটি কবিতা

সব্যসাচী দেব

অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত), বাংলা বিভাগ

নিঃশব্দ

১

মাঠের শেষে কুয়াশার দীর্ঘ নদী
তার উপর ঝুঁকে আছে বাঁশের জীর্ণ সাঁকো
শেষরাতে চাঁদহীন অন্ধকার
ঢেকে দেয় নিঃশব্দের দীর্ঘশ্বাস

২

জন্মান্তরের দিকে চলে যায় এই রাত্রি
কুশায়া ডিঙিয়ে
পথের এপাশে ঝোপ, বুনো ফুল
অন্যপাশে খাদ থেকে মাথা তোলে
হিম-ভেজা পাইনের শাখা
ছড়ানো পাথরে আজ নিঃশব্দের ফেলে-যাওয়া পদচিহ্ন
ঢেকে দেয় ঝরাপাতাগুলো

এপিটাফ

হিম অন্ধকার; পাহাড়ে হাওয়ার শব্দ বাজে
সংকেত রহস্যভরা লেখমালা পড়ে থাকে ঘাসের উপর
খাঁদের অতল থেকে উঠে আসে জলস্রোত-ধ্বনি
তুষার ঢেকেছে পথ, পাহাড়ের স্তব্ধ নিঃসঙ্গতা

কেউ একা, তার পাশে আরও একা চাঁদ।।

দুটি অনুবাদ কবিতা

সমীর কুমার মুখোপাধ্যায়

ইংরেজি বিভাগ, অধ্যাপক

ম্যারিয়েন ম্যুর-এর কবিতা

সৌভাগ্য

ভাঙা জাহাজ আর তার শরীরের কাছে
ছিন্নভিন্ন মাস্তুলের নীচে
এক মেষপালক হুমড়ি খেয়ে দেখে
মাটিতে শুয়ে আছে এক অপূর্বনীল সীগাল্।
সমুদ্রজাত বিততপাখা পতঙ্গ যেন,
ঘননীল পা মুড়ে, বিস্ফারিত খোলা ঠোঁটে,
অনেককাল আগে মৃত মানুষদের স্বাগত জানায়।

ডি.এইচ্ লরেন্স-এর কবিতা

অন্তরঙ্গ

মেয়েটি তেঁতোস্বরে বলল, "তুমি চাওনা আমার প্রেম?"
আমি তার হাতে তুলে দিলাম আয়না আর বললাম—
"এসব প্রশ্ন বরং ঠিক ব্যক্তিকে করো।
সব অনুনয় রাখো কেন্দ্রমঞ্চে।
গুরুত্বপূর্ণ সব অনুভবের ব্যাপারে
সরাসরি প্রধানতম শক্তির কাছে যাও।"
এই বলে তার হাতে তুলে দিলাম মুকুর।

মেয়েটি প্রায় ভাঙতে যাচ্ছিল আয়নাটি আমার মাথায়।
হঠাৎই নজরে পড়ল তার নিজের প্রতিচ্ছবি
আর মুহূর্তে বিস্ময়ে হতবাক্ হল সে।
সেইক্ষণে আমি দিলাম ছুট।

উৎস ঃ ইমেজিস্ট পোয়েট্রি
সম্পাদনা : পিটার জোনস্, পেঙ্গুইন, ১৯৮৮

একটি কবিতা

দেবজ্যোতি মণ্ডল
প্রাক্তন ছাত্র, বাংলা বিভাগ

ঘুম পাড়ানি মাসিপিসি খুকুর বাড়ি আয়
সন্ধে হলে খুকু আমার যায় না বেপাড়ায়।

সন্ধে হলেই নেকড়ে বাঘে চতুর কথা শানায়—
খোক্কসেরা গা ঝাড়া দেয় মানুষ মারা হানায়।
পোড়া দেশের সমস্ত গাঁয় দূরদূরান্ত ধরে;
মানুষ ধরে খাচ্ছে কিংবা রেখেছে বশ করে।
রাত বিরেতে দিচ্ছে হানা, উজাড় করছে পাড়া,
মানুষ হবার স্পর্ধা কি আর সইতে পারে তারা?

নিজের ঘরেই খুকুর আমার লজ্জা রাখা দায়—
ঘুম পাড়ানি মাসিপিসি খুকুর বাড়ি আয়।

মধ্যরাত, ১০ মে

তোর্সা বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

তোমার ঐ রক্তের বন্দুক
আমার কপালে নামিয়ে আনো
এ শহর খুনোখুনি দেখে নি কোনোদিন
সারা রাত শুধু মেলা আর মিছিল
আর ট্রাপিজের খেলা...
একটা লাল রুমাল শুধু
আমার সামনে মাঝে মাঝে নাড়িয়ে দেয় কেউ।

আমার কোনো প্রতিপক্ষ নেই
এই তুমি, এই মাত্র এলে,
আমার সামনে...
কতখানি আঘাত, কতখানি ক্ষমা,
তুমি ওই এক গ্রাসে তুলে দিতে পারো
আমার মুখে....

এইমাত্র চুম্বন নামালে,
পা থেকে পাথর হয়ে গেল,
এই মাত্র বুকে নিলে পাথর...
তোমাকে বলিনি কোনোদিন,
আজ বলছি, এই মুহূর্তে—
গুট্!

ঘুমন্ত কফিন

ঐশিক দাশগুপ্ত
স্নাতক তৃতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

জীবনের ক্যাট্যাস্ট্রফি
শ্লেষ্মাময় শিরা-উপশিরা

বিঘ্নিত জন্ম

হঠাৎ মৃত্যুকীর্ণ কফিনে হাত
আবছাভাবে বুকের পুরোনো পর্দায়
দুঃখ ও শোক ক'মিনিট,
কয়েকটি প্রেমের কবিতা,
কলরবহীন কান্না
অন্ধকার সরিয়ে মরণরক্ত মোছে।

কালিঝুলি মাখা একটা সকাল,
হারানো চোখের জল
তুমি ভুলে যেয়ো...

ছেঁড়া লিরিক

সৌমিক সাহা
স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

মাঝরাতে এপাড়া ওপাড়ার সমস্বর চিৎকার
ধোঁয়াশা জড়ানো গল্পকথা...
কোনো ন্যালাখ্যাপা গানওয়ালা
তাই নিয়ে গান বাঁধলে
ছিঁড়ে যাবে গিটারের তার।

ইতস্ততঃ শব্দ হয়ে
ফিরে ফিরে যাবে নিস্তব্ধতার কথোপকথন
ভীষণ ক্লান্ত, অবসন্ন — শেষে নিঃস্ব হয়ে যাবে—
ঘুমের ওষুধ খেয়ে অকাতরে ঘুমোবে অসুস্থ শহর।

শ্যাওলার গন্ধ পাবে না ....

আকাশ-ভাঙা

ধৃতিমান গঙ্গোপাধ্যায়
স্নাতক প্রথম বর্ষ, ইংরেজি বিভাগ

স্বপ্ন নীল — ভগ্নস্তুপ ....
চৌখস আকাশ
ভাঙা ভাঙা শামিয়ানা
তুলে তুলে আনে
ঘুম ঘুম মেঘ মেঘ ছাদে

জড়িয়ে থাকি আঁচড়ানো বল্কল ....

TIME

Lumbini Shill
Department of English, P.G. Second Year

Constant, cheap and copious.
An exact affordable mutual present.
Beginning from the New Year's dawn
Till the dusk of Christmas.

As middle march will see love-sick couples
Drenching love in colourful Holi
We handcuffed by Time shall wait patiently.

Then with the maddening drums of Durga's arrival
Time shall test us to trust.
With the Diwali crackers attempting the zenith
Time will hide our innocent weeps.

Then when too late
Time itself will knock the bruised hearts
And say "I never guiled, in fact I said,
It's always the right Time to do the right thing".

NAMELESS ME

Poulomi Ghosh
Department of English, P.G. Second Year

A piece of sky I see everyday
Reminds me of the vast emptiness
That reigns in me,
And the world.
Every grass makes me recollect
The erstwhile green Earth
Every man makes me see the dark soul within.
Years of existence has come to this.
I fail to see the beauty around,
And I cannot enjoy, laugh or praise
Neither can I cry or mourn.
All I feel is a nameless, voiceless space,
In and around me.

Unknown
Thinking of words...
I learnt hope does have wings—
Walking down memories,
Looking at things;
I am still curious for that light from the dead planet...
Morbid are my wishes,
Pursuing silhouettes of life,
Where love unleashes...
There, in the other side of darkness,
I learnt...
Blessed are those who know me the least.

SPRING-SONG : A BALLAD

Yashodhara Ghosh

Department of English, P.G. Second Year

It was a cold winter.
A dry, dusty, old winter.
A winter hoary with age.
Spring-bird sat mute in her gilded cage.

She'd lost her song for no clear reason,
Revered, regal Spring-bird: now a bird out of season.
Her siren-song lost, her signal for spring
Her song for the future, for all the gifts it would bring.

The bold men of the land, they knew it was time,
For the ice to melt, for warmer climes.
Beasts were slain, hymns sung.
Offerings made, garlands strung.

She saw all, her parched throat bitter with gall.
Her plaintive song, had held these men in thrall.
"It's been winter forever," they spoke in hushed tones,
The dust in their rusted teeth, the chill deep in their bones.

Would the Ice Giants rise again? They feared.
Spring bird strained, her plumes wet with tears,
Bitter and angry were her beloved Norse men:
Tired of waiting, of beasts killed in vain.

"Spring-Bird is old. She no longer heralds spring,
This winter only worsens-she can no longer sing."
Hostile from hunger, convulsed with rage,
They eyed with envy her golden cage.

A temple, where late the sweet bird sang,
Where her assuring trills once confidently rang,
Her resting place, their shrine of yore,
Now a ruin of lost affections : a shrine, no more.

They were solemn and sure : "Of no use is she :
She is in disgrace : we will set her free.
Her cage is worth a season's harvest :
This decision we take : it is for the best."

Spring-Bird envisioned the sunny shores of Spain,
She would fly over the oceans, and sport with the rains.
Her bane was now her boon, she blinked in disbelief :
Her cold heart began to thaw, she was filled with relief.

She'd contemplate the Bay of Biscay,
Perhaps the would roost for an entire day.
She could burrow in the warmth of golden sands.
And die in peace on the Canary Islands.

They undid her clasps with severity and gloom,
She waved goodbye with her solitary silver plume.
A parting pirouette, and off flew she,
Her heart soared with new-found, secret ecstasy.

She gasped at the newness of it all,
Cried out in alarm, felt she might fall.
Her sharp high-pitched cry, miraculously turned to song!
The same enchanting notes, lost and gone so long!

The ice began to thaw, and white turned to green.
All in an instant, the sullen land was serene.
The rivers flowed, as the Spring-bird sang,
In tribute to spring, to the ripeness of land.

The Frost-Giants made a hasty retreat.
Men rejoiced; hailed Spring-bird for her feat.
The cage door left smugly open, "she's sure to return :
Injustice was done, but our lesson is learnt."

Yet no sign of her, and day after day
Men felt her loss, as March turned to May.
Her music in their guilty hearts they longingly bore.
Their beloved bird was gone – it was heard no more.

Yet still to this day, if you listen with care,
You may hear her Spring-Song, if you only know where :
In the sunny foothills of the Catalonian Pyrenees
You can hear her singing with mellifluous ease.

And there, of course, it's the land of eternal spring,
The sun always shines, as the bird always sings.
She's snug in her straw nest; so what if it's not gold?
In the distant icy Norse lands, her story is still told.

THAT MAN

Amrita Mukherjee
Department of Sociology, U.G. Third Year

Look at that man so frail and lean,
His wrinkled face and oh! His hands so thin ....
Pedestrians pass by giving some alms to that poor,
But why god you became partial and obscure ...

under the blue sky stays he,
under the cloudy sky sleeps he ...
while several are comfortable and cozy on their slumber
Dreaming of a life ought to be ....

Social Beings are we, think socially ....
But do we care for those unlucky really??

The dark of night nurtured desire

Sunayan Mukherjee

Department of English, U.G. First Year

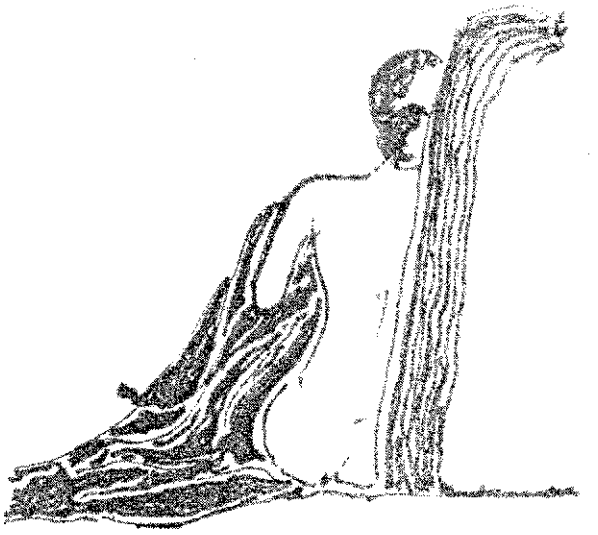

Not a star shone in the sky,
Not a ray of light to dispel my delusions,
Grappling between the web of tensions
I still aspire!!

So much to do yet so little done
The days have passed, unnumbered moment gone
visions blurred, I can't see.

It is not fit to eat, sleep and drink
And make merry while others are in pain,
All the happiness, mirth shrink
All the struggle for existence goes in vain.

Today I saw you little boy
While I was passing by train
Your flaxen head did sway
Showing puckered signs of strain.

Arms outstreched, lips murmuring
You were in deep agony, uttering
In a strange mellow voice
"I'm not fed Babus, have pity"
Isn't it not us, who have given him no choice
I brooded, feeling guilty ....

Passions upsurged, pangs of cries
Couldn't dither the wordly wise
Nobody thought about his pitfall
Or about his situation, apocryphal.

I went outside my little world,
And offered him a ten-rupee note,
The boy gleamed in wonder and curled
His radiating smile mixed with pain
Was a reflection of the ethereal plane

The dark of night nurtured desire
I shall not rest in peace
And do something great, of Honour
Wherein I can show my valour
Before Death tears all my dreams.

Last Christmas

Sayantan Auddy
Department of Physics, U.G. First Year

The bell of Christmas still rings
Among the heavy war clouds,
As the gun thumped with vigour.
The steady ranks of soldiers
Marching through the bloody war field
Towards the demise, the ultimatum.
So did I, bowed with heavy guns
With weights of curse of untamed cruelty.
I realised after years of battle
The pity of war,
The futility with which
It cast the shadow of death.

I wandered on with dilemma
The reason, why I stood here :
In what we call the swing of fate.
Where mere death dangles on mortal eyes
Like a bell of after world.
The call of death inflamed a happier thought
The hay days of my teen life-
Away to my native land
Where Christmas plays a sweeter bell
Among the company of generous mates,
To saturate the young heart
With the essence of eternal love.
It seemed a forlorn fantasy
Blown by the winds of time.
Towards the demise the ultimatum
But still the nostalgic satisfaction
Intoxicated with the essence of love.
I stood amazed in a hypnotic dream
Unaware, unaffected by the malice
The war, the welcoming death.
I felt a cold pain of knife
Which seemed like a breathing balm
Healing my wounds of evils.
To wipe the shadows of envy
By pouring the spirit of love
On wounds, created by years of war.
It was my merriest Christmas,
Where death was my richest gift
Where realisation and satisfaction
Was my greatest blessing.

गाँव

संध्या कुमारी सिंह
प्रवक्ता, हिन्दी विभाग

गाँव! तुम कहाँ खो गए?
बरसों जहाँ तुम्हें छोड़ आई थी
तुम वहाँ तो नहीं हो
पर
मेरी स्मृति के उजले पन्नों पर
इतिहास के
पुराने खंडहरों की तरह दर्ज हो।
जहाँ अवकाश पाते ही
मन लंबी छुट्टियों पर चला जाता है
तलाशने लगता है
विस्मृत हुए चेहरों को
कुछ भूली-बिसरी यादों की कब्रगाह
से कुछ पुरानी आवाजें
मथने लगती हैं
तब बहुत याद आते हैं
हमारे बाबा, हमारी आजो
वह महुआ का पेड़, वह आम की अमराई
वह चार बीघा खेत
माटी का आंगन-दुआर
जगर-मगर करने लगता है।
कहते हैं लोग कि
अब तुम नहीं रहे
पर विश्वास करने का जी नहीं करता।
गाँव! तुम मर नहीं सकते
हर पल तो तुम्हें
अपने सीने में धड़कता हुआ पाती हूँ।
कैसे कहूँ कि अब तुम नहीं रहे?

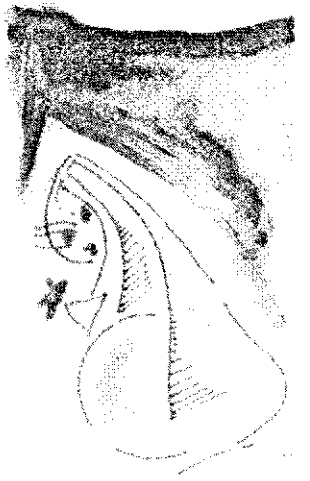

यार : बेकार की लाश

जतीन शुक्ला
स्नातकोत्तर, द्वितीय वर्ष, हिन्दी विभाग

गैरों का क्या अपनों का प्यार नहीं मिलता
दिल की बात कहूँ किससे, ऐसा कोई यार नहीं मिलता
आह भरने की खातिर कोई हमराज नहीं मिलता
कत्ल होती है हर वक्त अरमानों की मेरी
मगर बचा ले इसे ऐसा कोई यार नहीं मिलता
बेबसी की जकड़ में फड़फड़ाती है जिन्दगी मेरी
इन सलाखों को जो तोड़ दे ऐसा कोई यार नहीं मिलता
निराशाओं के साझधार में डूब रही है किस्मत मेरी
नजर के सामने आज कोई साहिल नहीं मिलता
बचा नहीं जिन्दगी में अब कोई जीने का संबल
पर फूँकने को लाश को कोई शमशान नहीं मिलता
कहते "सानिध्य" इस दुनिया में कोई नहीं यारों
अपने ही मतलब से कोई यार है यार से मिलता।

नेता की रोटी

शर्मिष्ठा घोष
स्नातकोत्तर, द्वितीय वर्ष, हिन्दी विभाग

धर्म की छोटी सी चिंगारी लगी समाज में
हिंसा भड़की, अहिंसा के समाज में
भड़क उठी जातीयता
तारतार हुई मानवता
चमक उठी तलवार
बर्बरता की हुई जयजयकार।
वक्त बीता,
बिलखने की आवाज
बदली सिसकियों में।
यही चिंगारी पलने लगी
अब लोगों के दिलों में।
नेता चौंका!
यही तो है सही मौका
इन चिंगारियों में थोड़ी सी हवा तो दे दूँ,
फिर आराम से अपनी रोटियाँ सेंक लूँ।

मैं प्रगति हूँ

रेनु सिंह
स्नातकोतर प्रथम वर्ष, हिन्दि विभाग

वो परम्परा है
हर बार परम्परा आकर मुझसे टकराती है
चोट खाकर फिर घायल हो जाती है
मैं उसे हर बात की तरह
फिर कहती हूँ कि
तू बदल खुद को और समझ मुझको
इस पर वह फिर मुझसे लड़ने
खड़ी हो जाती है।
अगर मैं चाँहू तो उसे
उसे डाँलूँ कुचल
जो मरे साँप का केंचुल ओढ़े है
और खुद को साँप समझती है
लेकिन फिर
आड़े आती है भावना
बस और बस केवल भावना के कारण
जीते लोगों को मारकर
जी रही है खुद परम्परा
जिस दिन छूट गया, भावना का साथ
उस दिन परम्परा
आएगी मेरे हाथ
फेंक दूँगी समूल उखाड़कर
क्योंकि
मैं प्रगति हूँ
करो मुझ पर विश्वास
और छोड़ो
परम्परा का साथ।

एक छोटी धारा

प्रमोद कुमार गुप्ता
स्नातक, तृतीय वर्ष, हिन्दी विभाग

संप्रसाद से विषाद तक,
एक छोटी गंगा बहते देखा है!
संप्रमाद की काली छाया में पड़कर,
इस सरिता को थिरकते देखा है!
बहती हुई इन लहरों में,
हाले दिल को भी बेहाल होते देखा है!
क्या खुशी और क्या गम,
हर हाल में कुछ बयान करते देखा है।
यह धारा पवित्र है जिसे बहा देना ही होगा!
इन कोमल मोतियों को सीप से निकाल देना ही होगा!
प्रत्यक्ष में इसे चमकते देखा है हमने!
पिघलकर पत्थर को मोम होते देखा है हमने!
क्या यह आँसू! क्या यह धारा!
इनकी रोशनियों में पंक्तियों का सहारा!
सामने इसके कटु हृदय को भी हिलना होगा!
कविताओं में सिरजते हुए हर चक्षु से निकलना होगा!
तभी तो पंक्ति गालिब की
सार्थक क्या है?
जब आँख ही से न टपका
तो फिर लहू क्या है?

मैं क्या लिखूँ?

संतोष सिंह यादव
स्नातक, तृतीय वर्ष, हिन्दी विभाग

मैं क्या लिखूँ?
भूख लिखूँ या प्यास लिखूँ
बिता रहे दिन अनन्त के नीचे
उनको क्या आवास लिखूँ!
सोये फुटपाथों पर निरीह
ओढ़े क्या आकाश लिखूँ!
लूट रही अबला चौराहों पर
अब नारी की क्या लाज लिखूँ?
नेता, मंत्री शोषक बन गये
क्या भारत को आजाद लिखूँ।
देश के रक्षक हो गये भक्षक
फिर अपना क्या अधिकार लिखूँ!
आज मिटा दूँ गीता रामायण को
अब एक नया इतिहास लिखूँ।

The Death of The Author : Thus Spoke The Phoenix

Arka Chattopadhyaya
Ex-Student, Department of English

'It'll never be known how this has to be told, in the first person or in the second, using the third person plural or continually inventing modes that will serve for nothing. If one might say : I will see the moon rose, or : we hurt me at the back of my eyes, and especially: you the blond woman was the clouds that race before my your his our yours their faces. What the hell." ...... **Julio Cortazar (Blow Up)**

The Death of the Author [written in 1967—first published in the American journal, **Aspen**, first anthologized in **Image-Music-Text** (1977)], the essay that made an author out of Roland Barthes, was an integrational culmination of many theoretical crosscurrents. Barthes was not the lone executioner, neither was it a death at one blow. The slow poisoning had started long before and on a collective level too. I. A. Richards's removal of all authorial and contextual information associated with poems before giving them for interpretation to the Cambridge undergraduates led the way. The primacy of the text was asserted as a part of a sustained critique of the biographical approach as the text was made to vacillate in an autonomous vacuum of anonymity. William Wimsatt and Monroe C. Beardsley, among the American New Critics, had made a similar declaration as early as 1946 while discussing the concept of 'intentional fallacy' in **Sewanee Review.** In Mikhail Bakhtin's book **Problems in the work of Dostoevsky** (first published in 1929), the novelistic discourse was recognized as an open-ended dialogue with 'unfinalizable' polyphony and thereby undercutting any privileged existence of the authorial voice among the many voices in the text. The thematic engagement with the figure of the author in High Modernism had already explored the jitters. Stephen in **Ulysses** (1922) was hardly as author-backed as he had been in **A Portrait of the Artist as a Young Man** (1916) and **Finnegan's wake** (1939) had already shifted the focus from the speaker to the speech, acknowledging speech as the only speaker. I would even argue that Eliot's idea of 'impersonality' of art in **"Tradition and the Individual Talent"** (1919) contained in it yet another germ of the authorical removal.

The 'death of the author' phenomenon in Barthes' essay is a derivation from his anti-teleological approach of looking at a text. To him, the text is intrinsically resistant to any originary enquiry into the voices, which operate within its t[illegible]ric. Referring to Balzac's story **Sarrazine**, Barthes shows how the text blurs the identity of the speaking voice by an overlap as it emerges as a "neutral, composite, oblique space where our subject slips away, the negative where all identity is lost, starting with the very identity of the body writing." (Barthes p. 1) With a structuralist legacy as well as an acknowledgement of th[illegible]idean rupture, Barthes posits language as a self-referential schema where the narrated fact does not interact with the real but remains within 'the very practice of the symbol itself' (p. 1) i.e. the semiological register of language. Using the Saussurean notion of the pre-givenness of language as a starting point Barthes subverts the operative hierarchy between speech and the speaking being. The ruins of realistic representation make language fall back upon itself and thus any identity of any speaking voice in the text is subsumed by it— "..... it is language which speaks, not the author ......" (Barthes p. 2). This dimension of linguistic autonomy is heavily influenced by the Lacanian psychoanalytical orientation of the subject. Speech introduces a cut in the human being at the point of its entrance. Therefore the speaking subject is a split subject right from its entry into language. The rupture in the Real order is constituted by the chain of signifiers, which then goes on to make the Symbolic (linguistic) order. The Real remains unsymbolifiable, to a large extent. This is what Lacan calls the first of the 'signifying cuts', which separates the speaking voice from the speaking subject. It is language that speaks in human beings rather than human beings speaking language.

In **S/Z** (1970), Barthes returns to **Sarrazine** to interpret it elaborately in terms of his 'codes' (Hermeneutic, Semic, Proairetic and Symbolic). Barthes sees in it, the 'readerly' ideal of the classic realist text whereby the reader is no more than a passive recipient of an authorially determined meaning. But as Barbara Johnson has shown us in her eassy **"The Critical Difference : Balzac's Sarrazine and Barthe's S/Z"**, Barthes only unveils a deconstructive potential already present within Balzac's text. When the author is pushed out of the limelight, literature assumes a counter-consumerist character of 'writerliness' and yet the ambivalence remains in the complementarity of the 'readerly' and the 'writerly' (where the reader will be the producer of text). They ('readerly' and 'writerly') are too dangerously akin to the 's' and the 'z' on two sides of the mirror. They blind us all! Even Barthes is not spared!

Barthes's removal of the author opens up the post-structuralist aporias in the text in being Derrida's textual 'metaphysics of absence'. Jacques Derrida's Baltimore lecture **"Structure, Sign And Play in the Discourse of the Human Sciences"** (21 October 1966) destabilizes the idea of the centre as Derrida propounds its positedness, placed both inside and outside the structure. It is the same act of decentring that Barthes performs by beheading the authorial centre of the textual structure. The author, like all speaking beings, is reduced to a signifier as the authorial signified (the author outside the text) vanishes. The signifiers can only relate to each other back and forth as the text is seen as an auto-deconstructive site— ".....writing ceaselessly posits meaning ceaselessly to evaporate it, carrying out a systematic exemption of meaning." (Barthes p. 4) With the disappearance of the 'author-god' [following Nietzsche's notion of God's death in **Thus Spoke Zarathustra** (1883-85)], the text gets liberated from the singleness of his 'theological meaning' and is made to realize its infinitesimal semantic potentials. The author is denied any pre-existence in the beyond to a text and a textual composition is envisaged as an eternal 'here and now'. Barthes ends with yet another deconstructive reading against the established hierarchical grain by prioritizing the reader over the author. The death of the author leads on to a new birth of the reader for he is seen as the major locus where the text performs the drama of its signification. It is the reader who "holds together in a single field all the traces by which the written text is constituted" (Barthes p.4)

The way Barthes' essay has paved the way for the Reader-response theory or the Reception theory has also made his argument subject to a critique that he only replaces the author with the reader, making another author out of him. In the Derridean reference frame, however, this replacement goes down well with Derrida's notion of a perpetually dynamic and slippery centre, constituted by a constant metonymic displacement of its own. Sten Moslund thinks that Barthes's argument leads to an unnecessary 'mystification' of the text, undercutting not just its author, but the reader also. Much like Booth's idea of an implied 'second self' of the author (**The Rhetoric of Fiction** — Wayne Booth), Moslund talks about the need to acknowledge a limitation to the proliferation of meaning in the authorless text on the grounds of intentionality, which he wittily calls 'the postmortem footsteps' of the author as a spectral remainder in the text. Moslund argues in favour of a check to the author's authority instead of a complete annihilation of its existence. He also considers the authorial removal to be a dispensation with the discursive potentialities of the text though I would like to add here that the dependence of discourse in general on its author is weaker than what it is when it comes to the specific discourse i.e. the 'literary' one. In what has come to be called postmodern social space, the subject inevitably finds itself enmeshed in discourses, which are ruled by a largely extra-authorial logic. Even Bakhtin, in his positioning of the author in the polyphonic novel does not resort to a rhetoric of absence but rather to one of non-mastery and neutrality — "The consciousness of the creator of a polyphonic novel is constantly and everywhere present in the novel ..... the author's consciousness does not transform others' consciousness ..... into objects and does not give them secondhand and finalizing definitions." (Bakhtin pp. 67-68). However, taking into account Barthes' later works like **Sade Fourier Loyola** (1971), one may say that even he implies a check to, rather than a foreclosure of, the author-power, as "the pleasure of the text also includes an amicable return of the author" where he returns in a form structured by the reader's desire. This is the 'author guest' of the textual proletariat instead of the tyrannical 'author god' of the class-divided text. The author is removed and

then brought back after a while and it is this tenure of absence that engenders the closure of representation. And in the post-representational world, the author revived or re-arrived can only be a Pierre Menard of a certain Jorge Luis Borges.

Michel Foucault's lecture, **"What is an Author?"** presented at Societe de Philosophie on 22nd February 1969, engages with a more historiographical examination of the 'author function'. He might not refer to Barthes by name, but throughout the lecture, Foucault implicitly responds to the Barthesian proposition. Foucault problematizes the authorial notion in the novelistic and poetic discourse (unlike the non-fictional discourse where pinning down the author is easier) by drawing attention to the fissure between the narratorial voice in the text and the writer who writes it in reality. That 'scission' is to Foucault, the locus of the 'author function'. Foucault considers the author as a 'founder of discursivity', not just limited to his own body of work. To give his own example, Ann Radcliffe, as the Gothic canon sees her, is not just the author of her own novels but an author in relation to the entire English novelistic discourse of Gothicism. Foucault, thus, considers the author, as an ideological product, which operates as an index of the 'manner in which we fear the proliferation of meaning.' (Foucault p. 14)

Foucault's essay opens and ends on a note which contains an allusion to Samuel Beckett [**Texts for Nothing** (1954)], whom he quotes — "What does it matter who is speaking; someone said;' 'what does it matter who is speaking" (Foucault p.1). Beckett's works consistently demonstrate the otherness of speech where man finds himself in a state of being spoken by language as Unnamable articulates at the end— "..... you must say words, as long as there are any, until they find me, until they say me ...." (Beckett p. 407). The play of voices in Beckett's novella **Company** (1979-80) illustrates a Barthesian disconnection, disabling the authorial position in the text. A voice comes to the narrator in the dark and tells stories in the second person but the narrator can never make out for sure whether it addresses him or there is another unknown potential voice in the dark. The company of voices extends ad infinitum. Then there is the added complexity as Beckett does not rule out the possibility of the voice speaking of itself in the second person— "He speaks of himself as of another" (Beckett p. 20). What Beckett subtly shows us throughout is the impossibility of uniting the voice that speaks to and in the narrator. Speech always finds an alterity from which it speaks — "Use of the second person marks the voice. That of the third that cankerous other. Could he speak to and of whom the voice speaks there would be a first. But he cannot. He shall not. You cannot. You shall not" (Beckett p.6). The story-telling voices increase in the dark as the 'devised deviser', language itself, 'devises it all for company' (Beckett p.37). In this confusing company of polyphonic voices, 'the fable of one fabling of one with you in the dark' (Beckett pp. 51-52) only admits the loneliness of the author who is alienated from and strangulated by the speech-event. But the paradox hits back when we come to know about Beckett's own dictatorial controlling of the performance of his plays. As history tells us, he even took legal action to stop performances where his instructions were not immaculately obeyed (e.g. **Endgame**). In the real, does the authorial authority keep tempting him sucessfully?

Italo Calvino's novel **If on a Winter's Night a Traveller** (1979) has the same paradox, in a different way. The Reader's (the Reader is a character in the novel) infinitely deferred reading of the Calvino novel leads to a totally disjointed string of multiple anonymous texts across nations and cultures, de-constructing all myths about authorship. As Silas Flannery's diary (chapter-8) tells us, it is only the readerly dialectic that controls the composition of his work. Computer softwares replace the author and the authorial function by completing works left unfinished by dead authors. To Flannery, writing is nothing but "the respiration of this reader, the operation of reading turned into a natural process" (Calvino p. 169), and he often temporally overlaps writing and reading — "at times it seems to me that the distance between my writing and her reading is unbridgeable .....". In one of the narratives within the narrative, authorship even assumes a politically conspiratorial dimension (chapter-6). None of the books, the Reader finds in the novel, is the Calvino-book he wants to read, and none of the books he ends up reading is found to be written by the name of the author stamped on it. While the frame-narratives so pervasively destroy the authorial role, the basic narrative, written predominantly in the second person where the

author keeps instructing the reader, stages a revengeful return of the author. This is not a Barthesian return, however. The returned author structures the reader's desire instead of being structured by it. The independence of the Reader is made to turn on its head as the author's voice pitches in with only parodic allowances — "adjust the light so you won't strain your eyes ..... Do you have to pee? All right, you know best" (Calvino p.4). The entire course of the Reader's actions—his search for the Calvino-book, his fling with Ludmilla and so on—are all dictatorially thrust on him by the speaking voice in the main narrative. **If on a Winter's Night a Traveller** does foreground the role of the reader as per Barthes. The novel deals with book-readers, electronic text readers (Lotaria), non-readers (Irnerio) and comes up with all sorts of discourses of readine e.g. the difference between listening to an oral narration and reading a written text (chapter-4). But, is this foregrounding not another name of a textual politics of the author whereby he implicates the reader by locating him inside and not outside his text and thus turning him into a ventriloquist dummy? Pirandello's play **Six Characters in Search of an Author** (1921) voice the rebellion against the authorial tyranny. But the characters still fail to go beyond Pirandello's drama, in spite of succeeding in moving out of the unfinished play mentioned within the play. The all-inclusive power of the text perhaps only camouflages the authorial power-paradigm just like the modern day welfare state has been able to mask and certainly not annihilate the repressive state apparatus. Who is killed at whose hands? The answer is confusion, which is certainly not devoid of the polemic.

Works Consulted :

a) Bakhtin, Mikhail, *Problems of Dostoevksy's Poetics*, Minnesota Press, 1984.

b) Barthes, Roland, *"Death of the Author"*. *http://social.chass.ncsu.edu/wyrick/debclass/whatis.htm.*

c) Beckett, Samuel, *Nohow On : "Company", "Ill Seen, Ill said" and "Worstward Ho"*, Calder Publications Ltd. 1989.

d) Beckett, Samuel, The *Grove Centenary Edition. Volume II : Novels,* Grove press. 2006.

e) Burke, Sean, *The Death and Return of the Author : Criticism and Subjectivity in Barthes, Foucault and Derrida,* Edinburgh University Press. 1998.

f) Calvino, Italo, *If on a Winter's Night a Traveller*, Vintage Classics; New Ed edition. 2007.

g) Derrida, Jaques, *Writing and Difference,* Routledge. 2001.

h) Foucault, Michel, *"What is an Author?"* *korotonomedya2.googlepages.com/Foucault-WhatIsanAuthor.pdg*

i) Lacan, Jacques, *The Seminar of Jacques Lacan Book VII the Ethics of Psychoanalysis 1959-1960,* W W Norton & Co Ltd. 1992.

j) Moslund, Sten, "The Phantom Walking The Text : The Death of The Author Reconsidered", *Forum : The University of Edinburgh Postgraduate Journal of Culture And The Arts, Issue I-Origins and Originality,* Autumn 2005.

k) Young, Robert, *Untying the text : a post-structuralist reader,* Routledge. 1990.

Fictionesque

Anandaroop Sen
Ex-student, Department of History

What is the point? Cartographically or otherwise one answers in terms of direction, imagine the usual, crossroads, four way exits, or entry, whichever way one wants to see, usually away, farewell bash? Perhaps. Goldfish, sewing forgetful flowers, not quite in full bloom, is interested in the texture of things, will move down south to become Hollywood.That then is a point.

FISH AND BULL STORIES ARE NOT ALWAYS PLEASANT. ESPECIALLY WHEN THEY ARE PRECOCIOUSLY GIFTED. ESPECIALY WHEN THEY CAN CHANGE INTO EACH OTHER, WHERE BULLS HAVE GILLS THAT BREATHE IN THE DEEP AND FISH HAS HORNS THAT TEAR APART CLUMPS OF HAIR. BUT THEN THEY SWITCH. AGAIN. FISH JUMPS BACK ON DRY LAND, NO ALCOHOL, ARSE FROZEN, MUSEUM OF COLD. BULL FLIES ON AN AEROPLANE, BEFORE CRIBBING AROUND IN CITY BY THE SEA, FAT MEN, HANGING TONGUES, YOKO ONO SHADES, AH THE ELECTRIC EMBRACE CORRUPTED BY LOCAL TRAINS, UNWELCOME BUTT CRACKS OF HOSTS ON A TWO DRAG HIGH. FISH IN THE MEANTIME, LAGS BEHIND LATE LATE NIGHTS, ASKS FOR FORGIVENESS, FROM THE LARGER GODS OF SWITCHEROO, SO IT CAN STOP TAKING ITSELF SERIOUSLY, ALL THE STINK OF THE MARKET, DEAD EYES BEREFT OF PAIN, LAUGHTER SNIGGERS, HALTINGLY, PREPARES TO MOVE EAST FOR WARMTH. BULL IS KIND. BULL THINKS ABOUT TURNING INTO TWISTED CAT, WHITE QUILTS, RED IN A COLOUR BLIND WORLD. BULL AND FISH PUMP BLOOD TO THE HEART. THEY ARE ABOUT TO MEET. FISH AND BULL DECIDE TO BE NICE TO EACH OTHER. FISH LEARNS TO COOK AND BRINGS BREAKFAST TO THE BED, BUYS BULL AND FRIENDS FANCY HAIR GELL, VIBRATING CONDOMS. HAPPINESS IN A GAS CYLINDER, GROWS, TILL MEDIUM GODS OF ACCIDENT INTERVENE, RIPS THROUGH THE KITCHEN TO LEAVE SCATTERED SCALES OR FLAKES OF HORN, WHICH ONE? I DONT KNOW WHICH ONE BLEW UP, THE FISH OR THE BULL, FOR AS ONE ALREADY KNOWS THEY COULD CHANGE INTO EACH OTHER ...

Music makes things easy. Bearable sunhshine, desired tan, rabid radicals all buried, wilting evening melancholy, pure contagion infecting with happy deaths. A minor third doesn't fit in with some of these things, snap change in wrist positions to fit into time, tucked inside tuxedos, simple major chord progression, one doesn't know much about these things. Boxed sets blare or soothe without agenda. Depends on how one is feeling. How are you doing? There is a tale about a lyre made up of bones of a musician who lost out in love, crossed out other pockets to delve into depths of invisible flesh, no label to take up a broken heart when it is not prepared to sell, lyre sounds are difficult to hear, music while making things easy washes away history, sparkling, bubble gum teeth, clear like a knopfler note, sound of water on water.

Four o clock is a not yet. Like a sleep is a not yet. It will come. The comfort and certainty of futures that remain simple. Motor reaction like, knee jerk, not half as calamitous. Bordering on the banal. The story was on a ship. Sailing across sea, chasm like, vacuum cleaner in suction mode, at night, things remained rudimentary. There was work at day, there was work at night, there was work in

between. Like air. Enough for all to breathe in without worrying about greed. The crew couldn't talk. A breed of rats that had bred itself near the hull brought in a plague once. None died. Only tongues started to rot. Cutt off one by one, elements of conversation walked the plank. Silence was established. It was a fair deal. Sea was not in suction mode. It needed things to feed on. Secrets that tongues might have hid fit the bill. Or so it seemed. There was still a treasure to search. As always there is. On better days it was called hope, on nights of lust it turned to gold. Where? On an island with the siren sitting on a tower with fancy flutemen dressed in suave blue and nude fallen Adams, sometimes eves too. All this magic but rarely any hares running down holes, slight hunger pangs, music from top of the tower, only song allowed to be sung, Ain't no jelly in the jelly fish darling, and doors, all shut with silver locks, a card game on the edge, these everybody wait for the crew to come, separated by absence, the two sets, the two thickened spaces, linked by a ship, yearn for the other. Absence sea lit, split wide wide open.

Only black comedy comes in and leaves without control. No sentries at the gate. Please. You are welcome. Do come in. Share your drink. Remember to be kind.

Artist : *Vincent Van Gogh*

The Romance of Fatehpur Sikri

Parameshwari Sircar
Department of English, P.G. Second Year

An emperor builds a magnificent city as an act of gratitude to a penniless saint, makes it the capital of his empire and then abandons it — An insight.

The thundering success of the never-ending celluloid saga *Jodha-Akbar* suddenly turned the almost four and a half centuries old, planned capital city of the eponymous Emperor into one of the hottest holiday spots in India rivaling that of the Taj Mahal, even for indigenous travelers. As a keen tourist, with a tremendous interest in History, I was fortunate enough to visit Fatehpur Sikri without having to envisage Hrithik's royal gait or the Bachchan bahu's delicate blushes.

Fatehpur Sikri is breathtakingly beautiful, and that is a fact.

Not only is the place an architectural marvel, it simply brims over with a vitality of its own. "*It is a truth universally acknowledged*" that the Taj Mahal seems to be poetry in marble. No offence to Miss. Austen for the ad hoc of her most famous opening but it does get the message across. To continue with the Taj, yes, it is a lovely wonder but it is also a "makhbara", and the grandeur wears off with a really good, hard look. Not to mention that on a scorching day, the marble under your feet feels like a bed of blazing coals. (Seriously). With all due respect too, the place is always teeming with foreign backpackers with their *Lonely Planets* (who, by the way, still think that our country has elephants and snake charmers at every nook and corner) and who have come to "*do the Taj*" and experience Indian *colour and culture* for *moksha*. (No kidding again).

On the other hand, Fatehpur has an aura and charm of its own. It is like one of those beautiful, veiled ladies, whose kohl-rimmed, sparkling eyes mesmerize one and all. The abandoned city is comprised of two distinct sectors — **Fatehpur**, the royal residence and administrative area, and **Sikri**, the dargah of the famous Sufi saint, Salim Chisti, where *"mannats"* are fulfilled even today. The skeptics would rubbish any claims of miracles, but the devoted can feel the power that the dargah exudes in the very core of their being. And the best part is, the saint welcomes and blesses each hapless soul that seeks refuge in His tranquility.

To wander among those red sandstone passages is one of the most surreal of experiences. The historical records of Mughal India seem like a flashback sequence in a black and white movie and whisk you back to the time when Jalal-ud-Din Akbar rode through the **Buland Darwaza** (which incidentally trumps even the Arc de Triumph in Paris) after a victorious campaign, to be welcomed by his proud queen, the royal court and his euphoric subjects. In fact, even today, while walking through the **Ibadat Khana**, or the **Panchmahal**, or even where Tansen sang the *Deepak Raaga*, you can feel the bustle and beat of medieval life. Also, the exotic sights and sounds of the aromatic and vibrant Meena bazaar and the deserted palaces of the queen (summer and winter) seem like an out of body experience. Standing in the middle of the courtyard with eyes closed, you can *see* the women in all their finery, with jangling bangles and the tinkle of anklets, scintillating the sense. Such is the allure of Fatehpur Sikri.

Once you step out of the boundaries of the ancient city into the crowded streets, the reality of the present hits you in the gut, and leaves you craving for more of the past. The well-known quotation from Francois Villon's poem serves as a befitting conclusion to my tryst with history and romance, *"Ou sont les neiges d'antan?"* ("Where are the snows of yesteryear?")

জয় গোস্বামীর 'স্পর্শ' এবং ...

অমৃতা ঘোষাল
স্নাতক তৃতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

জীবনে সবাই টুকরো খোঁজে। অজস্র মানুষের ভিড় জীবনে। আর তাদের অজস্র টুকরো-টুকরো সত্তা। তারা প্রত্যেকেই তো জীবনের খোলা চিঠিতে 'নির্জন স্বাক্ষর' রেখে যায়। জয় গোস্বামীর 'স্পর্শ' কবিতাটি অবচেতনের 'নির্জন স্বাক্ষর'। এখানে চারদিকে প্রাচীর তুলেও মুক্ত থাকা যায়। নিজেকেই নিজের প্রিয় বন্ধু করে তোলা যায়। কেননা এই এক টুকরো কবিতা মনের ভাঙা টুকরোগুলোকে আলাদা-আলাদা ভাবে আলোকিত করে তোলে, নতুন ভাবে চেনায়। জীবন তো অনিশ্চিত। তাই মানুষ বুঝতে পারে না, কোথায় তার জিত আর কোথায় তার হার। জয়ের মুহূর্ত মাঝে মাঝে আসে, 'সাবানের ফেনা'র মতো— ফুলে ওঠে, চক্‌চক্ করে, আলোয় সাতরঙ-ও দেখাতে চায়, কিন্তু ছুঁলেই যায় হারিয়ে। এটা সুখী মুহূর্তের স্বভাবধর্ম। মানুষ এ ধর্মের ক্রীতদাস। তাই আজ পরাশ্রয়ী হয়ে নিজেকে খোঁজটা গৌণ হয়ে পড়েছে। এমন সময়-ই জয় গোস্বামীর 'স্পর্শ'-এর ছোঁয়া।

জয় গোস্বামীর 'পাগলী, তোমার সঙ্গে' (১৯৯৪) কাব্যগ্রন্থের অদম্য আততির উৎস 'স্পর্শ'। 'দুখানি হাতের সরোবরে' ও 'শুকনো পাতার ডালে' কবিতাদুটিতে যে প্রাপ্তি অর্ধেক হয়ে থাকে, তা-ই 'স্পর্শ' কবিতায় এসে সম্পূর্ণ। 'শুকনো পাতার ডালে' কবিতার শেষ লাইনদুটি—

"আবার আমার ডাল কাঁপছে, সমস্ত ডাল কাঁপছে আমার—
কিন্তু বলো বসন্ত দিন, তার সঙ্গে তলিয়ে যাবার উপায় আমার কই!"

('শুকনো পাতার ডালে', পাগলী, তোমার সঙ্গে)

এই নেতি-ইতির দ্বন্দ্বই ক্রমশ হেঁটেছে মনোনয়নের পথে। 'স্পর্শ' কবিতা সেই পথ। কারণ শুষ্ক হৃদয় শুধু সিক্ত-ই হয়নি, ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রঙীন-ও হয়েছে, অবশ্য সেরে ওঠবার কোনো সুযোগ পায়নি। কেননা মানুষের একটা সত্তার সঙ্গে আরেকটা সত্তার প্রবল ঝগড়া। তাই বোঝাপড়া করতেই হয়। পাওয়াটাকে 'না পাওয়া' বানাতে হয়। আর বুঝেও না বোঝার ভান করতে হয়। আসলে চেতন-মন তো সর্বদা অবচেতন মনকে পাশ কাটিয়ে যাবেই। সেজন্যই হয়তো জয় গোস্বামী লেখেন—

"এতই অসাড় আমি, চুম্বনও বুঝিনি।
মনে মনে দিয়েছিলে, তাও তো সে না-বোঝার নয়—"

কিন্তু, মিথ্যা যৌক্তিককরণে-ও দেরি হয় না। অনেক অদ্ভুত ধারণা পরিণত হয় নিজের ওপরেই নিজের ষড়যন্ত্রে। নিজেকে মিথ্যে একটা প্রবোধ দেওয়া ছাড়া আর কী? আসলে নির্মেঘ জীবনে মেঘের প্রয়োজন অনুভব করা বড্ড অপ্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়ায়। তাই অজুহাত-ও স্পষ্ট করেই দেওয়া—

"ঘরে কত লোক ছিল, তাই ঋণ স্বীকার করিনি।
ভয়, যদি কোনো ক্ষতি হয়।"

এ 'ভয়' নয়, পলায়ন প্রবৃত্তি নামক বিকার। ছেঁড়া নার্ভপ্রান্ত নিয়ে পড়ে থাকা একলা মানুষের বিকার। এ বিকারে বিস্মৃতি নেই আছে স্মৃতি—অনুষঙ্গকে উৎপাটনের প্রচেষ্টা। রবীন্দ্রনাথের 'সমাপ্তি' গল্পের শেষটুকু মনে পড়ে— রাত্রে অপূর্ব খাটে প্রবেশ করতে উদ্যত হচ্ছে "এমন সময়ে হঠাৎ বলয় নিক্কণ শব্দে একটি সুকোমল বাহুপাশ তাহাকে সুকঠিন বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল এবং একটি পুষ্পপুটতুল্য ওষ্ঠাধর দস্যুর মতো আসিয়া পড়িয়া অবিরল অশ্রুজলসিক্ত আবেগপূর্ণ চুম্বনে তাহাকে বিস্ময়প্রকাশের অবসর দিল না।"

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'সমাপ্তি', গল্পগুচ্ছ, প্রথম খণ্ড)

এতে তো অবসরের কামনা প্রত্যক্ষ। অত্যন্ত অকপটে একে অন্যের কাছে আসা। কিন্তু আজ অবসরটুকুও কপট। তাই, মনের প্রাপ্তির থেকে অধিকারের দাবি অনেক গুণ বেশি। তাই পরিপার্শ্বকে প্রাধান্য দিতেই হয়। তুলনামূলক অবরোহ পদ্ধতি বেছে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় বাকি থাকে না। তাই, সিদ্ধান্ত আগে, যুক্তি পরে।

কবিতা মুহূর্তের সঞ্চয়। 'স্পর্শ' কবিতাটিও প্রেমের প্রত্যেকটা সঞ্চয়কে বুকের মধ্যে জমিয়ে রেখেছে। পরিস্থিতির প্রতিকূলতা তখন কোনো বাধাই নয়, যেখানে ভালোবাসার

আশ্বাস রয়েছে। তখন কল্পনার ডানায় ভর করে মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে ভেসে যাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় একফোঁটা নিভৃতি। প্রিয় মানুষ বা 'মানুষী'টির চোখের ছোঁয়া তখন আঙুলের আলোত ছোঁয়ার চেয়েও উষ্ণ। সেই উষ্ণতার সেতু পার হতে তো কোনো ক্লান্তি নেই, বরং সব গ্লানি ধুয়ে মুছে যায়। এ রাজ্যে কোথায় ধূসরিমা? সব কিছু স্বচ্ছ। হৃদয়ের এপার থেকে যেন ওপার দেখা যায়, অনুভব করা যায়। এই আবেগের ঘনীভবন এক হয়ে যায় অলতো বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর 'পূর্বরাগ' কবিতার কিছু লাইনের সঙ্গে —

"তত বৃষ্টি কোনোখানে নেই
ঝরে যা দুচোখে তার চোখ রাখলেই;
কিংবা তার শরীরের আলগোছে এতটুকু ছোঁয়া
জানায়, হৃদয় কেন ধুয়ে যায় ভালোবাসলেই—"

(বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'পূর্বরাগ', রাণুর জন্য)

হৃদয়-শোণিত যখন ভালোবাসার অশ্রুতে মিশে ঝরে পড়ে, তখন তার চেয়ে সত্য আর কি হতে পারে? নবণাক্ত রক্তিম কুয়াশা পেরিয়ে তীব্র হয়ে ওঠে তার কণ্ঠস্বর, যে ছিল এতদিন বন্দী। এ কোন্ 'বন্দীর বন্দনা'? এ বন্দনা যত-ই শুনতে চাই, ছুঁতে চাই, ততই তার উৎসমুখ সরে যেতে থাকে। 'উৎস' মানে তো অতীত, শিকড়! আর আজকের মানুষ 'root-less'. বৈষ্ণব পদাবলী সেই আদি যুগ হতে শুনিয়েছিল বাঁধ-ভাঙা ভালোবাসার কাহিনী, এনেছিল রোম্যান্টিকতার অপরোক্ষ আস্বাদ—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে।।"

(জ্ঞানদাস : পূর্বরাগ)

আজ, পদাবলীর এ বুলি আওড়েও এর মর্মার্থ ভুলে গেছি বা মনে রাখার প্রয়োজনই আর নেই। সব-কিছুতেই চলে এসেছে এক রকমের বিবমিষা। আত্মস্থ করার প্রয়োজন এখন অনেকটাই ম্লান। তাই 'চোখে চোখ পড়ামাত্র' চোখের পাতায় ছোঁয়া লাগা কিংবা 'অবাক করা গলা'-র অন্ধকারে ফিরে আসা একটা 'Utopian' ধারণা ছাড়া আর কিছু নয়। এ কবিতায় তার অনুরণন ঘটেছে এভাবে—

'স্বর্গ থেকে আরো স্বর্গে উড়ে যাও আর্ত রিনিঝিনি।'

ক্ষণিকের সাধনায় চিরন্তন আজ অপমানিত। শাশ্বত জীবনের সংবেদী প্রবাহে অসংখ্য মানুষ ভেসে চলেছে। তাদের বেশীর ভাগ-ই মৃত। কিন্তু নিজের জীবনের উপজীব্য টুকুতো মৃত মানুষের সঙ্গে ভাগ করা যায় না। তার সঙ্গেই একমাত্র ভাগ করা যায়, যে হৃৎপিণ্ড-এ পিন ফোটাতে পারে। কিন্তু সেই মানুষটার সঙ্গে মিলবার সুযোগ কোথায়? সেজন্যেই হয়তো আজকের মানুষ আত্মরতিতে আজন্ম নিঃস্ব থাকতে চায়। একে অন্যকে আবিষ্কার করার ঈপ্সা আর অবশিষ্ট থাকে না। কবি জয় গোস্বামী তাঁর 'স্পর্শ' কবিতায় রেখে দেন প্রশ্ন, যার উত্তর চিরকাল থাকবে অনির্ণেয়—

".....দশক শতক ধরে ধরে
ঘরে পথে লোকালয়ে স্রোতে জলস্রোতে আমাকে কি
একাই খুঁজছে তুমি? আমি বুঝি তোমাকে খুঁজিনি?"

এই পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন থেকে সন্ধানের মধ্যেই রয়েছে সর্বজনীনতা। অস্তিত্বহীন আধুনিক যুগে 'তুমি' তখনই 'আমি' কে খুঁজে পাবে, যখন আমি = তুমি হবে; এবং ঈশ্বর = প্রেমিক হবে। তাই, আজ একবিংশ শতাব্দীতে 'আমি' ও 'তুমি' পরস্পরের দোসর হতে চাইলে প্রয়োজন হৃদয়-খোঁড়া জ্বালা, পোড়া আর জয় গোস্বামীর 'স্পর্শ'-টুকু।...

একলা একতারা

অর্পিতা ব্যানার্জী

স্নাতক তৃতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

আজ ন'বছর তিন মাস একতারাটা একা আছে। নিজের মধ্যে একা, সবার মধ্যে একা আর ভাবনার মধ্যে একা। ওর তিনটে রেখা জীবনটাকে সমানভাবে ভাগ করলেও, জীবনের গতিপথটাকে বদলাতে পারেনি। বহুদিন বন্ধ আছে ওর তারের সঙ্গে বাঁশের বা কঞ্চির গোপন কথা, বহুদিন কোন ফিসফিসানি হয়নি ওদের মধ্যে। তাই অনেকদিন হয়ে গেল একতারাটা এখনো অন্ধকারে পড়ে আছে।

নিজের নিয়মেই ওর তারে ধরেছে জং, গায়ে পড়েছে ধুলো, কঞ্চির গায়ে লেগেছে ঘুন। তবু কোথাও যেন একটা অদ্ভুত সুরের গন্ধ নিয়ে ও বসে থাকে এখন। একটা মেঠো সুর, বা অপ্রচলিত সুরও বলা যেতে পারে তাকে।

একতারাটা বহুদিন সবুজ দেখেনি, এখন ওর মধ্যে একটা বিশাল কালো শূন্যতা ঢুকে পড়েছে। একা থাকাটা এখন ওর অভ্যাসের পর্যায়ে দাঁড়িয়ে গেছে, তাই এখন ও তাতে আর বিচলিত হয় না। ওর মধ্যে যে প্রাণ ছিল সেটা কোথাও, সবার অলক্ষ্যে খাঁচার মধ্যে আটকে গেছে।

একতারাটাও স্বাধীন ছিল। মাঠের চারপাশ ধরে ঘুরতে থাকা একতারাটার মধ্যে তখন ঢুকে যেতো প্রকান্ড মাঠ। সেই মাঠে শস্য হতো, পরিপূর্ণ হতো ক্ষেত। মাঠের আলে ঘাসফুল জন্মাতো রোজ। কখনো ওর মধ্যে মাঠ ঢুকে যেতো, কখনো একতারাটায় হয়ে যেতো মাঠ।

ওর তিনটে রেখার মধ্যে আকাশটাকে নিজের মতো বানিয়ে নিয়ে ব্যবহার উপযোগী করেছিল ও। ওর বাউন্ডুলে জীবনে যোগ হয়েছিল নতুন হারিয়ে যাওয়া। তখন বোধহয় পলাশের মধ্যে রঙ ছিল-- আর একতারাটার মধ্যে ছিল অজস্র ছবি।

ও নিজেই তখন একটা আকাশ। তখন, একতারাটাও মাঝে মাঝে রঙীন হতো; বিষম রঙিন। তারপর সব রং ওর গা থেকে ছড়িয়ে পড়তো চারদিকে। একতারার প্রত্যেকটা টানে ছিটকে পড়তো রঙ, ওর তারের কম্পনে নতুন নতুন রঙে ভরে যেতো আকাশ, নতুন নতুন বিচিত্র সব যৌগিক রঙ তৈরী হতো-- সাদা, সাদা থেকে নীল, নীল থেকে সবুজ, সবুজ থেকে মেরুণ...

তারপর অনেকদিন, অনেকদিন একতারাটা একা আছে। ফেলে আসা ছেলেবেলার মতো একা, নতুন কৈশোরের মতো একা, পুরনো শেষ হওয়া সম্পর্কের মতো একা। ওর তিনটে রেখা এখন আর আকাশটা ভাগ করে নেয় না, এখন শুধুই তারা গোনে ওরা। একতারাটার মধ্যে এখন বাসা বেঁধেছে রাত। রাতটা একতারাকে নিয়ে গল্প করে আর তারপরে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন ওরা একসঙ্গে বসে আরেকটা রাতের স্বপ্ন দেখে। রাতটা এখন একতারার নিজের। এভাবেই রাতের সঙ্গে রাত জুড়তে জুড়তে একতারাটা হয়তো নতুন কোনো অনুভব তৈরী করে নেবে। ততদিনে নতুন ভাবে রঙিন হবে রাত, একতারার মধ্যে হয়তো আবার সবুজ ডুকে যাবে, হয়তো আবার আকাশ ঢুকে যাবে....

অনিকেত : নাম যার নামমাত্র নয়

মলয় ভট্টাচার্য
স্নাতক তৃতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

১

-- সে রাত্রে আর ঘুমোতে পারিনি, উঁহু, নাঃ তারপরে আর ঘুমোতে পারিনি। অবশ্য পারিনি বলতে পারি না, আমি চাইনি, ঘুম ঘুম খেলতে, চাইনি কোনোভাবে আটকা পড়তে কোনো কিছুর মধ্যে। আমি শুধু ভাবছিলাম সেই আঙুলগুলোর কথা, যারা আমায় আঁকছিলো, সেই চোখদুটো যারা আমায় আঁকছিলো, সেই চওড়া ছাতি সেই বাইসনের মতো কোমর যারা আমায় আঁকছিলো, আমি তাই ঘুমোতে পারিনি, ইনফ্যাক্ট ঘুমোতে চাইতে পারিনি। কত রঙ কানায় কানায়! কেবল রঙ আর রঙ, এমনটা তো নাই হতে পারতো, জানো, মানে এমনটা হবেই তা কি আমি নিজেই জানতাম। আজ হঠাৎ যেন কয়েকটা লাইন মনে পড়তে গিয়ে পড়ছে না, কয়েকটা অন্তামিল, কয়েকটা শব্দ, শব্দের রঙ, এসব মনে পড়তে গিয়েও পড়ছে না, মানে বিশ্বাসই করতে পারছি না আমার কিছু মনে পড়ার কথা, যা আদৌ কিছু হয়েছিলো, ... কিংবা হয়তো যেটা মনে করতে চাইছি সেটা পারছি না, মনে করতে পারছিনা বলেই এত ক্লেদ; ..... এত আজগুবি; ..... এতো বেআক্কেলে কথা মনে করার বা পড়ার ভান করে সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে, তোমায় বলছি।

— তোমার সেই কলেজ পালানো মনে পড়ছে না? ঢালু রোদরাঙা? একা একটা মেসকে ধাওয়া করা? তোমার কি উগ্র পারফিউমের কোনো গন্ধ, কারোর জামার বোতাম সেলাইয়ের আছিলা, কিংবা কবিতা, হ্যাঁ কবিতা সুরঞ্জনা, তোমার কোনো কবিতার কথা কি মনে পড়ছে না?

— দাঁড়াও, দাঁড়াও, তুমি কি কবিতার কথা বললে, তুমি কি রঙগুলো, শব্দগুলো, কোনো চার-পাঁচদিনের না কামানো দাড়ির খালি ফ্লাট কেনা, বাড়ি বানানোর গল্প শুনতে ভালবাসার কথা মনে করতে পারছো? কিন্তু ..... এসব তো আমি ছাড়া কেউ জানে না, এক সেই আঁকিয়ে ছাড়া, ... আমি আর অনিকেত ..... অনিকেত আর আমি ..... অনি এবং আমি, ... নানা, অরে তো কারোর জানার কথা নয়, তুমি কে বলতো? তুমি কে?

— এই তো সুরঞ্জনা তুমি সব মনে করতে পারছো, শুধু একটু মন দিয়ে ভাবো, একটু শক্ত হয়ে বোসো, চেষ্টা করো, তুমি পারবে, ...

-- না, না, আমি পারছি না কিছু মনে করতে, অনেকবার এই ভেল্‌কিটা আমায় ছুটিয়ে মেরেছে, যে মনে করতে পারছি, আমি মনে মনে আবার ভালোবাসতে ভালোবাসার কথা ভাবতে পারছি, কিন্তু ..... কিন্তু এটা তো ভুল, আমি তাই জানি, কিন্তু এটা জানতে না পারলে, তুমি বলার পর মনে রাখতে না পারলে আমি মরেই যাবো যে, তুমি কে? প্লিজ বলো তুমি কে? কি করে জানলে, মনে করতে পারছো ..... মনে করাতে চাইছো কি করে এই সমস্ত? প্লিজ বলো, আমি না হলে সত্যিই মরে যাবো।

-- মরে তুমি এমনিতেও যাবে সুরঞ্জনা। এগারোটা ঘুমের বড়ি ..... এই ঘাম আর সিগারেটের পর সিগারেটের ধোঁয়ার ফিনকি ..... এই অবিমৃষ্য ঘন্টাগুলো ..... এই বিস্মৃতি ..... মরে তুমি এমনিতেও যাবে সুরঞ্জনা ..... শুধু মনে করে নাও নিয়তির মতো .... না বড্ডো সিনেম্যাটিক ..... ধ্যাৎ, বড্ডো কঠিন ..... আহা হাঃ বড্ডোই নির্মম হয়ে যাচ্ছে কথাগুলো, না বরং মনে করতে আবার পারার জন্যই মনে করে নাও একবার অনিকেতের সেই লাইনগুলো .....

একরাত্তির নিবিড় কালো চুলে
ঘুমিয়ে আছে পৃথুল ধরকীয়া,
সেই ঘরেতেই দুয়ারখানি খুলে
আদুর গায়ে ঘুমিয়ে আমার প্রিয়া .....

(উঁহু কি নাটুকেই ছিলে তোমরা! অবশ্য এর বেশী আর ..... না নাঃ কিইবা করার ছিলো, চাইতেই তো জমটি প্রেম, মানে ঐ আর কি।)

.... লাইনগুলো মনে পড়ছে সুর .....?

— একি? হ্যাঁ হ্যাঁ, তাইতো, এই তো সেই লাইনগুলো, সেই শব্দগুলো, আমার সেইসব কত রঙের কানায় কানায় ভরা ঘর, কেবল রঙ আর রঙ, কেবল শব্দ, সেই আলতো লাইনগুলো, সেই আমার সাবেক পটুয়া, সেই আঁকিয়ে আঙুল, হ্যাঁ হ্যাঁ ..... আদুর গায়ে .... আদুর গায়ে ঘুমিয়ে আমার প্রিয়া .... সারা আকাশ ভেঙেছে তার পায়ে,

এমন রাতে কোথায় তার প্রিয় .... আমার এই পা দুটো, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই এই পা দুটোর কথাই অনিকেত বলেছিলো ..... হতেই হবে ..... তোমার কি পরের লাইনগুলোও মনে পড়ছে? বলো না, মনে করতে পারার চেষ্টা করো, আমার .... আমার ঘুম পাচ্ছে .... হয়তো ঘুমের বড়িগুলো .....

— না, সুরঞ্জনা, শক্ত হও, শোনো, পরের লাইনগুলো, পরের রঙগুলো, শক্ত হও, মনে রাখার চেষ্টা করো, ভালোবাসতে পারার ..... পরের দুটো লাইন ছিলো, সুরঞ্জনা শুনছো তো? শোনো, এমন রাতে কোথায় তার প্রিয় ..... আহা এতো তোমার মনেই আছে, মানে মনে পড়ে গেছে, ... তারপর ....

বিভাজিকায় দাঁতের মৃদু ক্ষতে
ও প্রেম তুমি তাকেই খুঁজে নিও ....,

.... মনে পড়ছে সুর? ভালো লাগছে? কিন্তু তুমি হঠাৎ এমন করে কবিতাটায় আটকে গেলে কেন? আটকে যাওয়া তো তোমার স্বভাব নয়, ছকে পড়তে তো তোমার বরাবরের অনিহা, তুমি জানতে চাইছো না কেন আমি কে, তোমাদের এতো অনুপুঙ্খের খবর .... তবু .... তবু আর কেন জানতে চাইছো না কেন আর আমি কে? কেন?

—.... বিভাজিকায় দাঁতের মৃদু ক্ষতে .... আঃ কি আরাম .... কি শান্তি! .... কি শান্তি, ঘুম পাচ্ছে, ও প্রেম তুমি .... আরও বলো, ব-অ-অ-লো-ও; প্লি-ই-ই-জ্-জ্, ঘুম আসছে .....

— না, না, না সুরঞ্জনা, আমি তো তোমায় শুধু কবিতাটা মনে করাতে চাইনি, এই দিনগুলো, এই রাতগুলো, এই এগারোটা ঘুমের বড়ি, এই এত্তো ঘাম-ধোঁয়া .... বিস্মৃতির পাহাড় .... হঠাৎ শিশুর জেদে লাইনগুলোকেই আঁকড়ে ধরলে কেন? ওগুলোই কি শুধ সত্যি? আর আমি সত্যি নই? তুমি আমায় মনে করতে পারছো না সুর .... সেই পারফিউমের ডগ্র পুরুষালি গন্ধ বেয়ে আমি কি তোমার .... তোমাতে .... তোমার তন্দ্রার মধ্যে ঢুকে পড়তে পারাছ না সুর .... শুধই লাইনগুলো? বুঝতে পারছো আমি কে? সুর .... সুর .... সুরঞ্জনা .... শোনো .... প্লিজ শোনো .... শুনে যাও .... আমি, এই আমিই আসলে তোমার সেই রাত্তিরটা, যে রাত্তিরটায়; তুমি ঘুমোতে চাওনি, পারোনি, ঘুম ঘুম খেলতে ..... সুরঞ্জনা .... সুর, আঃ! .... আর আজ শুধ আমি তোমার কাছে কয়েকটা ভালো লাগা লাইনকে আঁকড়ে ঘুমোনোর তাগিদের মধ্যে রয়ে গেলাম ..... সুর ..... সুর শোনো ..... ওঠো সোনা ..... শেষ লাইন কটাই তাহলে শুনে যাও .... সুর .... শোনো বাবু .... সেই লাইনগুলোর সত্যতার মধ্যে দিয়ে, নির্ভরতার মধ্যে দিয়েই আমায় শোনো, চিনে নিয়ে যাও, অনিকেত তোমার কথা ভেবে 'আগন' লিখতে ভোলেনি, বেচারা .... নাটকে ওর আন্তরিকগুলো .... সুর .... আধার আমার .... লোপ পাওয়ার আগে শুনে যাও—

খুঁজে যদি না পাও তুমি ও প্রেম
ক্ষততে মুখ লুকোয় ঘনিষ্ঠতা
ভেবো না এর পুরোই বাতুলতা
ওদের ঘিরেই আগুন বেঁচে থাকে ....।

২

— আসলে তুমি কি চাইছো তুমি নিজেই কি জানো অনিকেত? কিংবা গভীরভাবে আদৌ কি কিছু চাইছো তুমি? চাইলে এত ঝাপটানি কেন, এতো ছেনালি! কি চাইছো অনিকেত? শরীর? তাও কি আদৌ? প্রতিটা শরীর, তার হাড়পাঁজর গুলোয় কড়িবরগা আঁকছো, ভেস্তে দিচ্ছ ওম্, ধেব্ড়ে ফেলছো রাত্রিগুলো, আর প্রতিকাতে পছন্দের শরীর বদলাচ্ছো! কি চাইছো আসলে অনিকেত? আশ্রয়? চারদেয়ালের খাঁচা?

— আমি এতটা আসলে একবারে ভেবে উঠতে পারি না, কেমন সব গুলিয়ে যায় ....

— আচ্ছা এক এক করে বলো .... আঃ অনিকেত আমার নরম স্তনদুটোকে এবার রেহাই দাও .... আমার কথা শোনো .... একে একেই বলো — কাল বিনতার সাথে, গত

"Locked Mind"

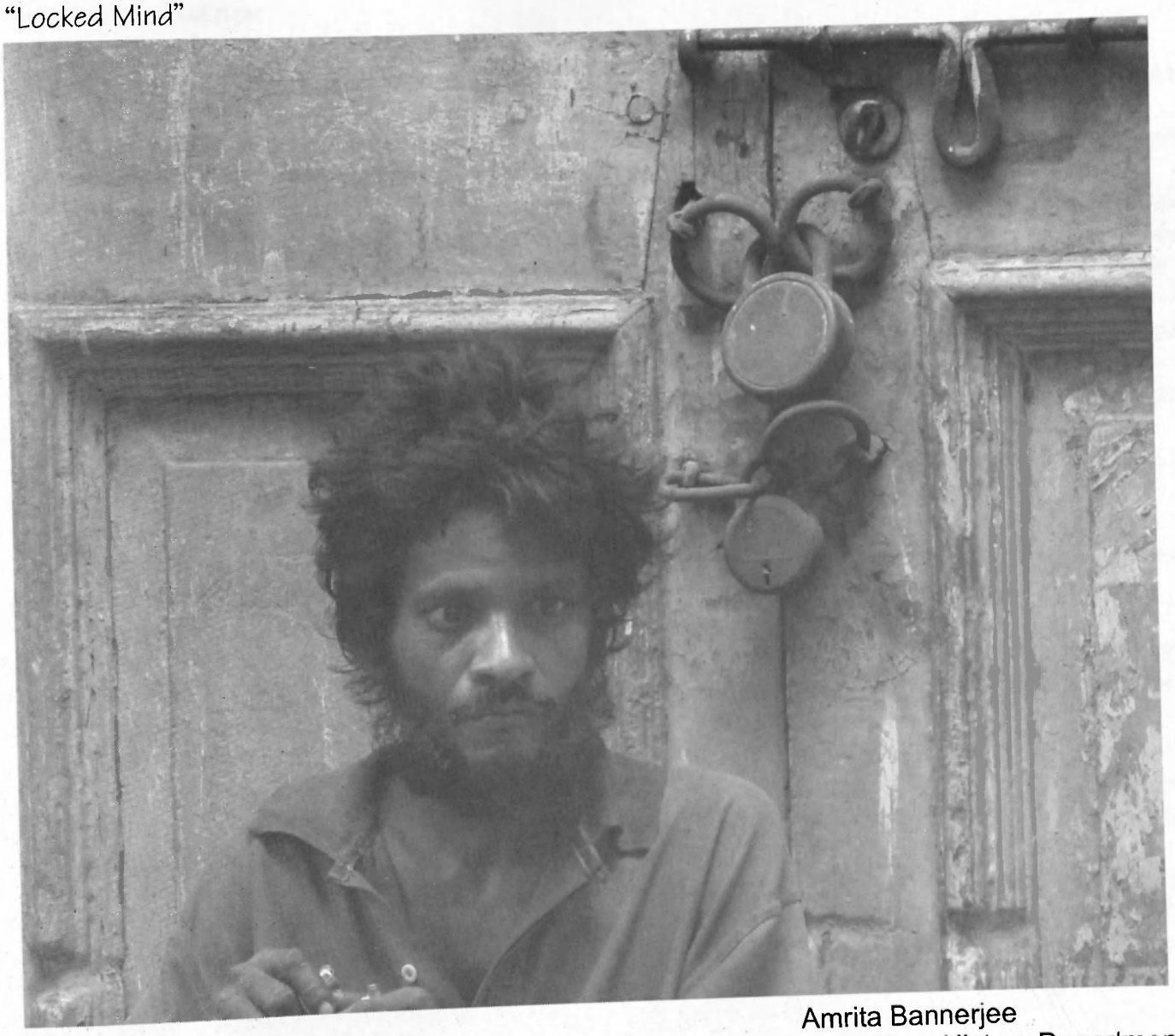

Amrita Bannerjee
Third Year, History Department

পরশু বিনতার বিবাহিতা দিদির সাথে, সেদিন সুযোগ বুঝে বিয়ের আগের ছবির ছোটো মাসির সাথে ভাপ্‌সা রাতগুলো কাটানোর পর, আজ আহাম্মকের মতো চলে এলে? তোমার অফিসের অধস্তন সস্বিত-এর স্ত্রী — এই আমার সঙ্গে বেয়াড়ারকম রাত কাটাতে! তোমার লজ্জাও করে না অনিকেত?

— না করেনা, চাইলে আমি তোমাকেও বদলাবো, তোমাতেও বদলাবো, বুঝলে? আর কোন সাহসে তুমি এত বড় কথা শোনাও, আমায় তুমিই বাধ্য করেছ সমূলে নগ্ন হতে, এই এত জল ভাঙতে .... আহাম্মক? আমি আহাম্মক? শালা, আমার স্বপ্নের আমিই ঈশ্বর!

— এই মৌতাতই তোমায় ডোবালো অনিকেত। তুমি স্বপ্নেই বেঁচে নিলে জীবনটা, তাও সেখানেও কাউকে খুশি করতে বা হতে বাধ্য করতে পারলেনা নিজের কায়দায়! আহাম্মক .... বুক থেকে নামো .... প্রতিরাতে এভাবে একটার পর একটা শরীর স্বপ্নের মধ্যে ধর্ষণ করতে তোমার নিজেরই ঘেন্না লাগে না! .... অথচ এটাও বুঝছো না .... ধর্ষকাম তোমার স্বপ্নে এই আমি শতরূপা .... আমার কিন্তু তোমার অবচেতন ছাড়া গতি নেই .... মানে তুমি কাকে শুষছো? ছিঁড়ছো, খুঁজছো, কাকে ঘষটাচ্ছো অনিকেত? এই সর্বনাশা পার্ভারশনে যুঝে আদপে চাইছো কি বেহায়া?

— প্রতি সপ্তাহ শেষের রাতগুলোয় তোমার এই কথাগুলো .... যা হয়তো .... না 'হয়তো' কেন, যা বহুবার শুনে ফেলেছি, তবু .... কেন জানিনা আমায় সেঁকে দিচ্ছে, ঝাঁকাচ্ছে মনে হয়। কিন্তু .... ছাড়ো না শতরূপা .... তোমার বুক, পা দুটো .... শতরূপা .... আমায় হাঁটু মুড়ে বসতে শেখাও, আরও কাছে এসো ....

— কাছেই তো আছি অনিকেত, আহাম্মক তুমি, কোনোদিন কারোর সাথে ঠিকভাবে মিলিতও হতে পারলে না .... পারবেও না আহাম্মক .... আর কত কাছে আসবো .... বেহায়া পুরুষ .... আমি কি মিশে যাবো তোমাতে? অবিশ্যি অবচেতন-নারীত্বের-স্বপ্নর মধ্যে বেহায়া পুরুষ, সে স্বাধীনতাই বা দিলে কই? কাছে এসো অনিকেত ....

— না না, থাক, মিশে যেতে দেবো না তোমাকে, তাহলে আমার হাতে-নাকে-বুকে তোমার গন্ধ লেগে যাবে, না না, শতরূপা, সে আমি হতে দেবো না .... আরও শরীর জমে আছে মনে .... তারা তোমার গন্ধ পাবে, থাক শতরূপা।

— বেহায়া .... ভীতু তুমি একটা অনিকেত ....

— বাস্টার্ড, তোমার এত সাহস হয় কি করে আমাকে ইন্‌সাল্ট করার! আর একবার যদি শুনি বেহায়া বা আহাম্মক বলতে .... যত্তোসব .... তখনই এই স্বপ্ন ভেঙে পালিয়ে যাবো .... না পালাবো কেন, সরে দাঁড়াবো, উঠে পড়বো ঘুম থেকে, আর তুমি জানো যে আমি তা পারি, আমার স্বপ্নেই আমার ঈশ্বর ....

— বেহায়া .... বেহায়া .... বেহায়া .... বড়ো আহাম্মক-পুরুষ তুমি অনিকেত, তোমার আর ঘর করা হলো না ....

অনিকেত উঠে পড়ে, বুঝতে পারে প্রতিবারের মতো এবারেও সে ঘুমোচ্ছিলো। বুঝতে পারে, আবার খানিক পারেও না, তাই তাৎক্ষণিক যে তন্দ্রা আবার তাকে ঘিরে ধরছিলো তা ফাটিয়ে .... কিংবা এতোটা না হলেও .... একপ্রকার সেটা কাটিয়ে সে প্রতিবারের মতো এবারেও স্বপ্ন থেকে স্বপ্নান্তরে ফুটে উঠতে থাকে, আর ক্রমশ ঢাকতে থাকে তার সমূল নগ্নতাকে, যা কিনা বহুবার থমকাতে থমকাতে অর্থহীন হয়ে গেছে।

ফুটে উঠতে উঠতে .... স্বপ্ন থেকে ক্রমশই পছন্দসই স্বপ্নান্তরে .... অনিকেত দেখে সুরঞ্জনা একপিঠ ভেজা চুল নিয়ে আয়নায় বসে চিরুনী চালাচ্ছে। অনিকেত দেখে তার কোমরের ভাঁজ, ভেজা পিঠ, বড়ো অভ্যস্ত লাগে এবং ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ডানা মেলে দেয়, ভাসতে ভাসতে চলে যায় বেসিন-বাথরুম-ওয়ার্ডরোব অফিসব্যাগ হয়ে সটান নিজের শেভ্রলে পর্যন্ত। এর মাঝে ঠুকরে যায় কটা কথা, গুডবাইকিস্, কয়েকনিশ্বাস সিগারেট, এমন আরও কত কি! কেমন সিরিয়ালের নায়কের, নাকি, কেন সিরিয়ালের গল্পের নায়কের মতো নিজেকে তার মনে হয় তা অনিকেত বুঝতে পারে না।

যেহেতু, অনিকেত — যারা হাতে কালি বা কাদা যাই বলা যাক, মাখতে ভয় পায়, অস্বস্তি বোধ করে — এমন লোক নয়, তাই আজ সে .... আজ কেন, রোজই একজন সফল, ক্রমশই ঊর্ধ্বগামী ম্যানেজার। তার কথাবলা মাপা এমনটা নয়, বরং তার ধূমপান মাত্রাহীন; সে নিজে দিশেহারা বলে এমন নয় যে সুবিধাজনক মধ্যবিত্ত অবস্থান সে চায় না, আবার সস্বিতের মতো অধস্তনরা তার কাছে প্রশ্রয় পেলেও, বন্ধুত্বের বাতুলতা যে পায় না তা বলাই বাহুল্য। তবু অনিকেত স্বপ্নবিলাসী, ... এই তবুটা পরবর্তী ছকের ওপরই ছাড়া যাক ....

৩

.... হঠাৎ দুটো নাগাদ অনিকেতের ফোনটা যখন এলো, একঘর ফ্যাঁসা ফ্যাঁসা রোদের মধ্যে .... বেশ একটা মাতোয়ারা সুরঞ্জনা আজ কিংবা সেদিন পুরনো চিঠিপত্রের বাক্সটা ঘেঁটে দেখছিলো, আর ভেসে বেড়াচ্ছিলো এঘর থেকে ওঘর থেকে জানালাছাদব্যালকনি হয়ে যখন ফোন ধরলো এবং অনেক বেয়াড়া রিকোয়েস্টে রাজি হয়ে গেলো — হ্যাঁ একরকম রাজিই তাকে হতে হলো উর্দ্ধগামী অনিকেতের ডানা ফোলাতে — আমরা দেখলাম অনিকেতের শেভ্রলে বাড়িতে এলো, একটু দাঁড়ালো এবং রওনা হলো দু'জনকে নিয়ে মোটামুটি সন্ধে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ।

একেবারেই বেয়াড়া ধরনের জোরাজুরিতে অভ্যস্ত সুর-র এই আহাম্মকদের পার্টিতে আসা তৃতীয়বার। অনিকেতের বসের ২৫ বছরের বিবাহ-ফূর্তিতে এই হঠাৎ পার্টি; এর থেকে আকর্ষণীয় করে বলার চেষ্টা করে ধ্যাবড়ানোর কোনো মানে হয় না, কারণ, হয়তো অনিকেতের প্রোমোশনের ক্ষেত্রে আগেরবারের মতো এ পার্টিতেও বসের সুরঞ্জনা সান্নিধ্য ফলপ্রসূ ও সিনেম্যাটিক হতেই পারে, তবে সে সান্নিধ্য বা অনিকেতের পেগের পর পেগের মৌতাত বা লালনীল আলোর ঝিলিক বেশি রাতের দিকে ক্রমশই মাত্রাহীন .... যা কিনা, বা সামূহিক যাতে কিনা সূক্ষ্ম রঙের প্রসার কম।

.... একসময় থিতোতে থিতোতে সুরঞ্জনা তলানিতে এসে ঠেকে এবং তখন যেহেতু অনিকেতও আমূল মত্ত, আর নিজের প্রোমোশন গোছাতে স্ত্রী শতরূপার মতো চোখে লাগা সুন্দরীকেও রামশ্যাম-যদুমধু এমনকি অনিকেতের সঙ্গেও হাসি চালাচালি করতে দিতে পিছপা নয় এককালে ছাত্রজীবনে বামঘেঁষা অধস্তন সম্বিত, তাই সুর-ও গড়াতে থাকে গায়ে গায়ে, আলো ঝলমলানো ঘরের একোণ থেকে সেকোণ। একসময় হাঁপায়, ফুঁপিয়ে ওঠে, টলতে টলতে অনিকেতকে জাস্ট একবার নক্ করে সম্বিতের সাথে বাইরে এসে খোলা হাওয়ায় দাঁড়ায়।

৪

আজ বহুবার অনিকেতকে পার্টিতে না যাওয়ার কথা বলেছিলো সুরঞ্জনা, এমনকি যাওয়ার পথেও। বলেছিলো — চলো না অনি, কোথাও না যেতে পারলে একটু রাস্তায় নামি, হাঁটি। কতদিন .... কথা থামিয়ে দেয় অনিকেত, বলে— দেখো ফালতু ন্যাকামো কোরো না, তুমি নিজেও জানো আজ পার্টিতে যাওয়াটা .... আর তার চেয়েও বড়ো কথা হঠাৎ গাড়ি থেকে রাস্তায় নেমে হাঁটতে যাবো কেন, গাড়িটাই বলো না তোমার ইচ্ছেমতো সাইড দিয়ে চালাই — বলে নিজের স্থূল রকিসকতায় নিজেই হাসার ভান করে আসলে অনিকেত তার দেখে ফেলা স্বপ্নের গ্লানিগুলোকেই কোনো একভাবে ঢাকতে চেষ্টা করে।

সম্বিতের লজ্ঝরে গাড়ীটায় বাড়ী ফিরতে ফিরতে এমন সাতপাঁচ রিভিউ করতে থাকে সুরঞ্জনা, যখন সম্বিত কোথায় যেন প্রতিশোধের আনন্দ পাচ্ছিলো অনিকেতের স্ত্রীকে, অনিকেতের বাড়ি ফেরার কয়েক ঘন্টা আগেই বাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে যাওয়ার মধ্যে। ফিরতিপথে অনিকেতের লেখার হাত আর হাঁটতে ভালোবাসা নষ্ট হয়ে যাওয়াটাই যে কেন, অযথাই, অকারণ গভীরতায়, আর সব বাদ দিয়ে সুর-কে এত বেশি হার্ট করতে থাকে তা সে নিজেও বুঝতে পারে না, ...

.... আর ....

বুঝতে পারে না বলেই হয়তো প্রয়োজন হয়ে পড়ে এগারো ঘুমের বড়ির, দু প্যাকেট সিগারেটটা, মায় গুরুর পরিচ্ছেদটারও ....

সে গল্প থাক ....

— অনেক রাতে হাওয়ায় ঝোলা পাগলের মতো ভাসতে ভাসতে বাড়ি পৌঁছে যায় অনিকেত, এদিন বা প্রতিদিন সকালের বেরোনোর মতো; ..... গাড়ীটা গ্যারেজে ভাঁজ করে ভাসতে ভাসতেই বেডরুমে পৌঁছোয়, খুব করে একবার ভাববার চেষ্টা করে তার ঘরের মধ্যে কি একবার সুরকে খোঁজা দরকার? সত্যি কি! তৎক্ষণাৎই স্বপ্নাঘাতের মতো মনে পড়ে যায় যে নানা চালে পাশ ফিরতে ফিরতে এঘরটা সবচেয়ে বড়ো যে বৈশিষ্ট্যটা কদিন হল পেয়েছে, তাকে এককথায় 'ইচ্ছে ফুড়ুৎ' বা 'গায়েবসাকিন' এই ধরনের কিছু বলা যেতেই পারে! বেশ কিছুদিন, আচ্ছা না হয় বেশ কিছু রাত, অনিকেত লক্ষ্য করেছে কখনো ঘরটার ছাদ থাকে না, কখনো গায়েব হয়ে যায় একটা বা দুটো দেয়াল, এমনকি ধরা যাক এঘরের দুটো মানুষ দুটো উদ্দেশ্য নিয়ে এঘরে এসে ঢুকলো, তারা কিছুতেই দু'জন দু'জনকে খুঁজে পাবে না। কেউ চাইলো নিজের মনে একা থাকতে, অন্যে চাইলো পরস্ত্রীকে স্বপ্নে নামিয়ে এনে রাত কাটাতে, ইতস্তত চুমু খেতে, আপত্তি নেই, কারণ এঘরে তারা একে অপরের কাছে অদৃশ্যই থাকবে, অনিকেত কেমন যেন স্বপ্ন আর বাস্তবটাকে আলাদা করতে পারে না।

কেমন ক্লান্ত হওয়ার ভান করে লোভে পড়ে, তাই সপাটে বিছানায় আছড়ে পড়ে শতরূপাকে নিয়ে, কারণ সুর-কে তার ঘরের মধ্যে খুঁজে পাওয়ার কথা নয়। অনিকেত আবারও স্বপ্নে মিলিত হতে পারেনা হয়তো, ঘুম কিংবা স্বপ্ন ভেঙে যায়। শতরূপাকে কেমন যেন ঠাণ্ডা লাগে, হীমমৃত্যুর মতো, তার নরম স্তনদুটোর ওম্ পায়না, বরং একটা অনভাস্ত কাঠিন্য যেন তার হাতে বিঁধে যায়; সে চোখ খোলার নামে স্বপ্ন থেকে বেরিয়ে এসে দেখে বুকের নীচে সুরঞ্জনা মরবার ভান করে স্বপ্নে বুঁদ হয়ে রয়েছে। আজ সম্বিত যেন সব মিলিয়ে অনিকেতের দিকে ফিরে তাকায়।

.... অনিকেতের এসবে মন ভরে না, তার চোখ দিয়ে অকারণেই অনভ্যস্ত মোম গড়াতে থাকে, আর ফোঁটায় ফোঁটায় জমতে থাকতে সুরঞ্জনার নীলচে গালদুটোর ওপরে। সবকিছু এখানে শেষ হয়েও যেন হয় না, কারণ শেষেরও তো একটা শেষ থাকে।

তাই যে রঙেরা তখনও জিইয়ে ছিলো তারা কোথা থেকে সব মোমপরীদের জুটিয়ে ঘরের মধ্যে এসে কানায় কানায় ভরে দিচ্ছে একোণ থেকে ওকোণ। কত রঙ তখন কানায় কানায়! কেবল রঙ আর রঙ! আর সাবেক পটুয়া, তার আদুর গায়ে ঘুমিয়ে থাকা প্রিয়া .... সারা আকাশ ভেঙেছে যার পায় .... সারা ঘর জুড়ে তখন ইচ্ছেফুড়ুৎ মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে বারবার, বারবার ....

.... সারা ঘরে তখন উড়ে বেড়াচ্ছে পুরনো যত চিঠিপত্তরের ডাঁই, অনি-র হারানো পাণ্ডুলিপিরা, মোমপরীদের নরম ডানা ঝাপটানো আলো। তারাই কয়েকজন এসে অনিকেতকে বুক থেকে নামিয়ে, কত সহস্র বছরের শত শত ঘুমের বড়ি সুর-র পেট থেকে ছড়িয়ে দিয়ে গেলো বিছানায়, ঘরময়, ফেলেছুঁড়ে দিলো .... আর কবিতা! কবিতারা .... শব্দ-পংক্তি — অন্ত্যমিল সবাই ভেসে বেড়াচ্ছে ঘরময়, জানলাময়, হাওয়ায়-হাওয়ায়, আকাশময়, বেহিসেবি তোড়ে .... আহাম্মক জ্যোৎস্নায় গুলিয়ে উঠছে চারপাশ, ঘরের চারদেয়ালঘেরা ছকটাই; দুপাশ ফিরে শুয়ে থাকা দুটো গায়েবসাকিন মানুষ ভেসে যাচ্ছে সে আলোয়, আর তাদের মদ্দিখানে ঘুমের বড়ি ছড়ানো খোয়াপথ খাট থেকে ঘরের বাইরে এগিয়ে গেছে দুদিকে ভাগ হতে ....

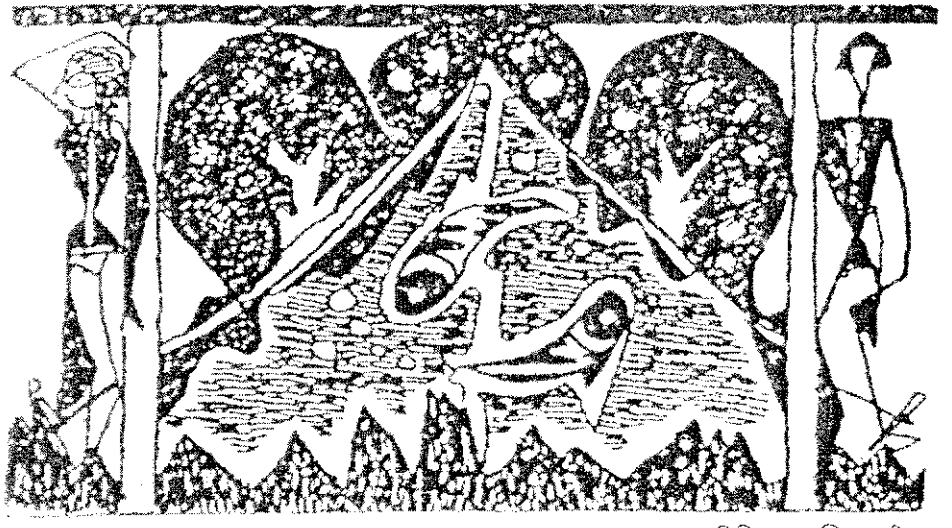

শিল্পী : রামকিঙ্কর বেইজ

सरकार-काका

भावना कौशिक

स्नातकोत्तर, द्वितीय वर्ष, हिन्दी विभाग

जैसे ही सूरज की किरणें बन्द आँखों के परदे पर गिरती, सहसा अल्पविराम से छुटका बाहर आ जाता। आँख मलकर उठ खड़ा होता और भागकर बाईं ओर पर उस संकरी-पतली गली में हलवाई की दुकान पर जाकर पूछता, "काका-काका! क्या बजा है तुम्हारी गोल घड़ी में .....? और काका बताते, "छुटके तेरे 8:30 बज गए, चल जल्दी-जल्दी तैयारी कर ले।" बस पूरा वाक्य तो छुटका सुनता कहाँ था, 8:30 सुनते ही भाग पड़ता था। बरामदे में से जल्दी-जल्दी अपना गद्दा-रजाई समेटता और नहा-धोकर अपनी साफ-सुथरी, इकलौती नीली कमीज डालकर खिड़की में रखी, छोटी सी, माँ की तस्वीर के आगे हाथ जोड़ता। बस यहाँ तक तो दिन की शुरुआत ठीक रहती पर ..... बड़ी हिम्मत जुटाकर, धीरे से वह अपने बाबा का कमरा खोलकर देखता कि वह क्या कर रहे हैं। हर रोज उनकी यही हालत होती है; कमरा शराब की बू से भरा, शराब की बोतलें जमीन पर पड़ी, हर चीज बिखरी।

जितने पैसे छुटका अखबार बेचकर कमाता था, वो सारे बाबा छीन लेते। वह कुछ बोलता तो चटाक से एक तमाचा उसके मुँह पर जड़ देते, पर छुटका अब समझ गया था, अब कुछ पैसे पहले ही बरामदे में रखे गमले के नीचे दबा आता और बाकी बाबा छीन लेते। आखिर अगले दिन अखबार बेचने के लिए, अखबार खरीदने के लिए भी तो पैसे हों।

छुटका कहीं जीवन की तस्वीर के रंगों में ढल चुका था, वह सत्य और स्वप्न के बीच की पतली-हल्की झिन्नी के आर-पार देखना सीख गया था। वह 6 साल की उम्र में अपनी माँ को खो चुका था, बाबा रात-दिन शराब के नशे में धुत्र, ना कोई दोस्त ना रिश्तेदार। पढ़ाई के नाम पर छुटका कहता था, "अँगुठा छाप नहीं हूँ, देखो मुझे अपना नाम लिखना आता है।" मासुमियत और त्रासदी की गहरी परछाईयाँ उसकी आँखों में सदैव चमकती रहती थी।

छुटका आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान से परिपूर्ण था। नौ साल की उम्र में वह अपनी जीविका स्वयं कमाता था। कभी गलती से उसकी हालत पर तरस खाकर कोई गाड़ी वाले साहब 5 रुपए का नोट उसकी ओर बढ़ा देते तो छुटका फट से उन मासुम आँखों को चमकाते हुए, एक भौंह ऊपर कर, टेढ़ी मुस्कान के साथ कहता, "साहब; एक अखबार डेढ़ रुपया।" उसके अंदाज को देख लोग बिना मुस्कुराए रह नहीं पाते थे। शहर के अजंता मार्ग पर रोज आने-जाने वाले लोग तो छुटके से इतना जुड़ गए थे कि भले ही घर से अखबार पढ़कर आते हों पर छुटके से अखबार जरुर खरीदते थे। एक कशिश थी उसकी आँखों में जो स्वयं में ढ़ली एवं शांत थी जो सहसा देखने वाले को आकृष्ट करती थी।

कई बार कई लोग ट्रैफिक जाम के वक्त आ-आकर पूछते रहते, तरह-तरह के सवाल करते-पढ़ता क्यूँ नहीं रे? पढ़ना चाहता है? अरे! ये तो तेरे खाने-खेलने के दिन है... तेरे माँ-बाप हैं? पर छुटका कुछ ना कह कर अपनी वही मासुम मुस्कुराहट और बुलन्द आवाज में चिल्लाने लगता 'आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर .....'

कितना सहज, शांत, समझदार। कितनी ही सहजता से उसने अपने जीवन में आए हालातों को स्वीकारा, उनसे लड़, उन्हें जीत लिया। सच! जंगल के शेर से कम नहीं था, जिस उम्र में बच्चे दोस्तों, ऐशो-आराम, खिलौनों और सपनों में खोए रहते हैं, उस उम्र में वह अकेला, हर तरह से अकेला, पूरा दिन जीवन की कठोर सच्चाई से रु-ब-रु होता वह अपनी जीवन नैय्या को खींचे लिए जाता था।

पर एक दिन एक और तूफान उसके जीवन में आया। इस बार वह परेशान था, वो आँखों की मासुमियत, उनकी चमक कहीं खो गई थी, कुछ ऐसा हुआ जिसे आज वह मुस्कुराकर नहीं टाल पा रहा था। जब तैयार होकर अखबार वाले चाचा के पास पहुँचा तो चाचा ने अखबार का बण्डल देने से मना कर दिया। वह कुछ पूछता तभी चाचा बोल पड़े, "रे छुटके तू थोड़ी देर बाद आना देख अभी बहुत काम है, ठीक है?" छुटका धड़कते दिल से घर की ओर भागा। बरामदे की सीढ़ी पर बैठा, अपनी

नीली शर्ट पहने, दोनों हाथ गालों पर रखे, बाल बिखरे, आँखे भरी ..... वो उदास था। वहाँ बाबा बार-बार चिल्ला रहे थे, खाली घर अँधेरी गुफा सा जान पड़ता था।

तभी 'थोड़ी देर' बाद छुटका भाग कर अखबार वाले चाचा के पार जाकर बोला, "क्या गलती हुई मुझसे चाचा, क्यों आज अखबार का बण्डल नहीं दिया मुझको .....? खिलखिलाते छुटके को इतना दुःखी देख चाचा सब काम छोड़ कर उससे बतियाते हुए कहने लगे, "ना छुटके तुझसे नहीं कोई गलती हुई रे, वो तो सरकार ने बाल- श्रम के विरोध एवं इसे रोकने के लिए कानून सख्त कर दिए हैं ताकि बच्चों का भला हो, इसलिए अब तुझे मैं अखबारों का बण्डल नहीं दे सकता, समझा .....? अपनी मोटी-मोटी मासुम आँखों को घुमाता छुटका पूछता है, "चाचा! सच! पर अगर मैं अखबार नहीं बेचुँगा तो मेरा 'भला' कैसे होगा, मैं क्या खाऊँगा .....? क्या करूँगा .....? बोलो ना चाचा, ऐसा मत करो, ना करो चाचा।" चाचा ने ऐनक ठीक करते हुए कहा, "भई अब इसमें मैं क्या करूँ, क्या कहूँ, ये तो सरकार ही तुझे बता सकती है रे छुटके" इतना कहकर चाचा फिर अपने काम में लग गए पर छुटके का दिल तो अभी भी धड़क रहा था, सिर खुजाता चाचा को बोला, "ये 'सरकार काका' कौन है, मुझे इनका घर का पता दो ना, मैं पूछता हूँ कि ये सब क्या और क्यूँ हो रहा है, मैं मिलना चाहता हूँ, बोलो चाचा, पता बताओ सरकार काका का।" इतना सुनते ही चाचा व्यंग्यात्मक हँसी हँसते हुए उसे नेताजी के घर का पता देते हुए कहते हैं, "सुन यहाँ से सीधे चलकर, चौक से दाँए मुड़ जाना आगे दस कदम चलकर एक बड़ी सी सफेद रंग की कोठी आएगी, जिसका बड़ा सा दरवाजा होगा, जिस पर चार दरबान खड़े होंगे उनसे कहना कि तुम्हें सरकार काका से मिलवा दें।" हँसते हुए चाचा ने कहा, "अब तो जा, और मुझे अपना काम करने दे चल।"

छुटका चल पड़ा, जैसे पूर्णतः सरकार काका तक जाने वाली डगर को, सड़क को समर्पित, हर धड़कन में एक सवाल लिए, हर साँस में एक उम्मीद लिए, हर कदम पे एक उमंग लिए पर अचानक हौंसले की इस साधना में एक खलल पड़ा। जब छुटका सरकार काका की कोठी के बड़े दरवाजे पर पहुँचा तो दरबानों ने उसे झिड़क दिया पर वह अड़िग रहा और सरकार काका से मिलने की जिद्द करता रहा तभी नेताजी जो अपने बाग में सैर कर रहे थे दरबानों को आदेश दिया कि, "क्या है, क्या हो रहा है वहाँ? आने दो इस बच्चे को ....." अन्दर ही अन्दर खिन्न मन से सोच रहे थे कि क्यों लोग सुबह-सुबह परेशान करने आ जाते हैं।

छुटका रूँधे गले, भरी आँखों से हाथ जोड़ कर सरकार काका को प्रणाम कर कहता है, "सरकार काका! मेरी माँ नहीं है, मेरे बाबा कुछ नहीं करते सिर्फ शराब पीते हैं, मैं सड़कों पर अखबार बेचकर, पैसे कमाता हूँ और अपना पेट भरता हूँ पर अब आपके कानून की वजह से, वही कानून जो आपने मेरे भले के लिए बनाया हैना, उसकी वजह से अब अखबार वाले चाचा ने मुझे अखबारों का बण्डल देने से मना कर दिया।" नेताजी को देर ना लगी स्थिति भाँपते पर वह निःस्तब्ध खड़े रह गए और छुटका एक साँस ले फिर बोल पड़ा, "अब आप बताओ मैं कहाँ से रोटी खाऊँगा, भूखा ही मर जाऊँगा और बाबा को भी पैसे नहीं दूँगा तो वे मुझे बहुत पीटेंगे ..... वह अपनी डबडब करती, टिमटिमाती, मासुम निगाहों से अपने सरकार काका को देखने लगा। नेताजी सिर्फ छुटके को निहार रहे थे, इतना मजबूर एवं निरुत्तर उन्होनें खुद को कभी नहीं पाया। तभी छुटका उनके हाथ को हिलाकर कहता है, "बोलो ना सरकार काका क्या अब रोटी, पैसा आप दोगे, क्या काम करवाओगे, आसान सा या बिना काम करवाए ही रोटी और पैसा दोगे .....? वैसे मैं सब काम कर सकता हूँ अखबार वाले चाचा से पूछना।" वह सरकार काका का हाथ अपने हाथ में लिए खड़ा, उनकी आँखों में देखता, अपने उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है पर नेताजी ना जाने उसकी आँखों में क्या ढूँढ़ रहे हैं .....

सामाजिक उत्थान में सत्साहित्य का योगदान

दीनानाथ सिंह
स्नातकोत्तर, प्रथम वर्ष, हिन्दी विभाग

साहित्य अपने व्यापक अर्थ में जीवन की अनुभूति की गहरी अभिव्यक्ति है। साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार साहित्य की परिभाषा इस प्रकार है : ''साहित्य वह शब्दार्थमयी रचना है जिसमें शब्द तथा अर्थ एक दूसरे के सहयोग में रहकर परस्पर पोषण करते हुए रचयिता के अभिप्रेत अर्थ को सहृदय के मन तक संप्रेषित करें और उसके मन को उत्तेजित तथा प्रसन्न करने के अतिरिक्त व्यष्टि-समष्टि के लिए मंगलकारी सिद्ध हो।'' मानव हृदय की भाव भरी वीणा से काव्य के स्वर फूटते है और शब्द, छंद, अलंकार सृजित होते हैं। साहित्य की यह सृजनशील ज्योति व्यक्ति और समाज को नूतन दिशा और दशा प्रदान करती हैं। अनुभव की तपिश से तपे लेखन के दम पर इतिहास के रुख को पलटा और परिवर्तित किया जा सकता है। स्वर्णिम भविष्य की नींव रखी जा सकती है। उत्कृष्ट और श्रेष्ठ साहित्य किसी समाज और राष्ट्र की प्रगति और उन्नति का परिचायक होता है। यदि किसी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का परिचय प्राप्त करना हो तो वहाँ के साहित्य को टटोलना चाहिए। चरित्रनिष्ठा और आदर्शवादी व्यक्तित्व के गठन में श्रेष्ठ साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण है।

साहित्य सामाजिक मूल्यों को प्रभावित करता है। कुछ विचारक एवं समीक्षक इस तत्थ्य को अस्वीकार करते हैं। वे केवल साहित्य को व्यक्तित्व की ही अभिव्यक्ति मानते हैं। वड्र्सवर्थ, कालरिज, ब्लैक जैसे स्वच्छंदतावादी विचारकों ने काव्य को केवल आत्मा की अभिव्यक्ति का सौन्दर्य माना हैं। उनके मतानुसार कवि और पाठक के बीच किसी अन्य का अस्तित्व नहीं है। काव्य केवल आत्मिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति मात्र है। समाज से उसका कोई संबंध नहीं है। उपर्युक्त सिद्धांत के समर्थन की साहित्य के क्षेत्र में 'कलावाद' नाम का एक नया वाद चल पड़ा। कलावाद के प्रमूख सूत्रधार क्लाइव वेल, डॉ. ब्रैडले रोजर, फ्राई स्विनबर्न आदि ने 'कला-कला के लिए' का नारा बुलंद किया। इन विचारकों ने कला को आत्माभिव्यक्ति का साधन माना है तथा समाज या जीवन से उसके संबंधों को अस्वीकार किया है।

साहित्य और कला को समाज या जीवन से अलग बताने वाले इन विचारों में कितना भी पैनापन क्यों न हो पर ये अपने आप में अपूर्ण और एकांगी है। कोई भी भावना जब किसी संवेदनशील हृदय से प्रस्फुटित होती है तो इसका प्रभाव अपने आस-पास के परिवेश, पर्यावरण को छोड़े बगैर नहीं रहता। आधुनिक साहित्यकार आई. ए. रिचड्र्स मे इस मत की कड़ी आलोचना की है और काव्य तथा समाज के संबंध को स्वीकार किया है। कविता का संसार किसी दृष्टि से शेष संसार से अलग वास्तविकता नहीं रखता। कविता का सृजन उन्हीं अनुभवों से होता है जो हम समाज में रहकर प्राप्त करते है।

साहित्य को जीवन से अलग करके देखना संभव नहीं है। साहित्य जीवन के सुन्दर और असुन्दर दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है। साहित्य जीवन के रस, रंग में इस तरह घुला-मिला है कि उसे अलग करने का तात्पर्य है एक दूसरे के अस्तित्व को समाप्त करना। एक साहित्यकार जीवन की गहराई में उतरकर ही अपने रचना-कर्म में सफल हो सकता है। सामाजिक जीवन की यथार्थ अनुभूति ही उसकी लेखनी में प्राण फूँकती है।

साहित्यकार अपनी प्रतिभा से जीवन की यथार्थ गतिविधियों, उतार-चढ़ावों और हलचलों को साहित्यिक धरातल पर अभिव्यक्ति प्रदान करता है; उसमें सौन्दर्य की स्थापना करता है; उसे भावपूर्ण और सरस बना देता है। इस प्रकार व्यक्ति और समाज का समन्वय ही साहित्य का मुख्य लक्ष्य होता है। समाज व्यक्तियों का समूह है और व्यक्तित्व का गठन भी समाज के परिवेश में होता है।

वैज्ञानिक प्रगति के इस युग में ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न साधन उपलब्ध हैं। रेडियो, समाचारपत्र, टेलीविजन इत्यादि, जिसके अंतर्गत आते हैं। किन्तु सत्साहित्य का अध्ययन इन सब साधनों में सबसे प्राचीन और सबसे अधिक प्रभावोत्पादक है। अन्य किसी वस्तु में ऐसा स्थायित्व नहीं जो चिरकाल तक मानव समाज को लाभान्वित कर सके। बड़े बड़े भवन धराशायी हो जाते हैं, राष्ट्र नष्ट हो जाते हैं, किन्तु साहित्य के संसार में बड़े-बड़े ग्रंथ जीवित रहते है। वे बार-बार प्रकाशित होते हैं और वैसे ही नवीन बने रहते हैं।

आर्षग्रंथ में उल्लेख मिलता है—

संसारविषवृक्षस्य द्वे फले ह्यमृतोपमे।

काव्यामृतरसास्वादः संल्लापः सज्जनैः सह।।

संसार है तो विषवृक्ष, परंतु उसके दो फल अमृत समान है। एक है काव्यों का रसास्वादन और दूसरा सज्जनों के साथ वार्त्तालाप। सज्जनों का सत्संग प्राप्त होना संदिग्ध हैं। इन परिस्थितियों में व्यक्तित्व विकास और समाज निर्माण का एक ही मार्ग दिखाई देता है, वह है सत्साहित्य का अध्ययन।

संसार-सागर के भीषण झंझावातों में, उतार-चढ़ावों में साहित्य की पुस्तकें ही प्रकाश स्तंभ की तरह सहायक होती है। प्रगतिशील जीवन का मार्गदर्शक और प्रेरणा-स्त्रोत साहित्य ही है। भाव, प्रखर विचार, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, साहस, संयम, धैर्य आदि गुण व्यक्तित्व का निर्माण करते है। यदि ऐसा संवेदनशील व्यक्ति अपने धधकते विचारों से लेखनी उठा ले तो वह समाज की जीवं हिलाकर रख देगा। लेखनी की इस आग में सामाजिक कुरीतियाँ, अंधविश्वास, कुप्रथाएँ आदि भस्मीभूत हो जाती हैं और वह समाज को विवेकपूर्ण दिशा में चलने के लिए प्रेरित करती हैं। हैरियट स्टो की 'टॉम काका की कुटिया' साहित्य की ऐसी ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

आज साहित्य के प्रति निराशा का सघन भाव तथा समाज में पसरे पड़े कुत्सित और अश्लील साहित्य की भरमार क्यों है? इसका कारण विकृत मानसिकता और असंवेदनशील हाथों में लेखनी का सिमट जाना है। निकृष्ट और घटिया साहित्य और साहित्यकार, व्यक्ति और समाज, दोनों के लिए अभिशाप है जबकि सत्साहित्य इन दोनों के लिए वरदान है। मिल्टन का कथन है— ''अच्छी पुस्तकें महान आत्माओं का जीवन रस है।'' श्रेष्ठ साहित्य के गर्भ में महापुरुषों का निर्माण होता है जो समाज को सभ्य और सुसंस्कृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। जो साहित्य व्यक्ति और समाज में गति और शक्ति न पैदा कर सके, विचारों और भावनाओं को आगे बढ़ने की दिशा न दे सके, वह साहित्य, साहित्य नहीं, मात्र प्रवंचना ही होगी। प्राणवान विचारों तथा निर्मल भावनाओं से ओत-प्रोत साहित्य ही समाज का कल्याण कर सकता है।

"Junks"...Sorry, We are just Disciples

Amrit Kumar
Department of Mathematics, U.G. Third Year

I reckon, at least some of you won't have an iota of doubt, when I say, 'Most of the productive deeds, don't get germination at night', they do have preludes in the shearing day-light.

"..... BTW my good hindi is all thnx 2 tv
n u r rite, U R INSANE ....."

It was an AFTERNOON sms, scribbled with a derisive remark by one of my 4 am friends, devoid of which, this compilation wouldn't have been anything more than a surmise.

Some 90 yrs back, on another AFTERNOON, two heavy-weight philosophers chaired a discussion at Cambridge University, when great Bertrand Russell (Bertie to his friends) said to Ludwig Wittgenstein :

"You are mad".

Zap came the non-trifling replay : "God preserve me from sanity". Soon the dialogue turned monologue and Ludwig was in Bertie's latitude. Russell was consonant with him, as both were the apostles of the belief that "One must understand or die".

Born in 1889 in Vienna, in a filthy rich family, Ludwig Wittgenstein escaped his home by going to Manchester University. His aim was to be a pioneer in aeronautics which he soon gave up, as his experiments suffered teenage failures. He later studied philosophy with Russell at Cambridge, with Ludwig's lofty centre of gravity, invariably arresting him.

As a philosopher is a citizen of no community, probably Cambridge did not have oxygen for him as he said "I've prostituted my mind talking to intelligent people". He left teaching at Cambridge for a while, and got himself exiled to the margins, so as to do something for the way we see this labyrinthine world. His first book on ideas ended with the writing "Whereof, one cannot speak, thereof, one must be silent". With misty eyes, he once said to one of his students : Are you happy? You should give up philosophy. Get out, while you still can. But, he didn't know, philosophy needed him more than he needed it.

For Russell's request to Ludwig to return, an epoch for Cambridge to say *Cheese* arrived. There, he started to find out the limits of language and what it is, to have communication with one another.

His thoughts (on the bijection between the world and the language) journeyed through the cosmic realm :

"I know this world exists. But, its meaning is problematic. Am I good or am I evil? When my conscience unsettles my equilbrium, then I'm not in agreement with something. What is it? Is it the world or is it God?"

Unspooling parts of his book "Philosophical Investigation", among a college of philosphers :

"If a lion could speak, we'd not be able to understand what he said. I can't understand a lion's language because, I don't know what his world is like. To imagine a language, is to imagine a form of life. It is what we do, and who we are, gives a meaning to our words. We imagine the meaning of what we say, as something queer, mysterious. But, nothing is hidden.

I used to believe that, language gave us a picture of the world. Words like chair, gives a picture of chair. But, how about, 'hey' 'hello'.

What picture do they form? So, that's a misleading metaphor. Moreover, language can't give a picture of how it does that. It's like to see yourself, seeing something. How language does that, is beyond expression. Limits of our language are the limits of the world.

Now I think, language isn't the picture at all. It's a tool, an instrument. There isn't just one picture of the world. These are different, in different forms of life. Different things we do with the language, I call them *language games*. We are what we are, because we share common language and common forms of life. Meaning of a word is just the way it is used in a particular language game.

People often puzzle over the nature of, what we call 'soul'. It's beause they think of soul along the lines of physical objects. They are confusing one way of talking with another. Philosophical puzzles arise only because we tend to mix-up one language game with another. Philosophy leaves everything exactly as it is, while it sorts out these language games."

Abandoning century-old ideas of some philosophers, he chucks :

"Philosophers at the time of Descartes pictured of a lonely self at the centre of philosphy, brooding over its private sensations. But, this soul is the prisoner of his own body and locked out of contacts with others by the walls of their bodies.

There can't be a private language. We learn to use words, because we belong to a culture; a form of life, a practical way of doing things. We speak as we do, because of what we do. All this has to be a public affair."

The best part of his ideas, which I liked from a non-philosophical domain :

"Philosophy is a sickness of mind and it doesn't infect too many young men".

Moreover, the legal distinction between sanity and insanity solely rests upon the concept of *free-will*. Insanity is a legal concept; it's not a medical or psychiatric term.

"If people did not sometimes do silly things, nothing intelligent will ever get done".

It's just my 'indulgence', which my ingenious friend wobbles with the concept of 'insanity'. Now, I can reply HER to whet her brain.

But this time, it'll be night for obvious reasons ....

The Parable of The Mycorrhiza

Aniket Sengupta
Department of Botany, U.G. Third year

The orchid seed was fast asleep. It never knew when it had been liberated from its parent plant. Now it lay on the forest floor. It was minute — a dark dust of orchid embryo, a tiny speck of life abandoned in vast possibilities of the forestscape. The night rolled in and it was damp and cold out there. Dews started condensing on its face and it woke from its long hibernation. It was alone and afraid for it knew not what to do. It knew not where it was and who it was. It was hungry. When the parent plant packaged the seed and its siblings, she put very little food stored in them. There were so many children that she nearly starved when she fed them and each didn't get enough for itself. Now the tiny seed was looking for food. Alas! It did neither have roots to draw water from deep into the soil nor did it have green leaves to cook its own food with sunlight. Cold and hungry, the miserable seed started weeping.

It was yet an infant but it knew that if it didn't have food soon then it would die. Suddenly it felt a warm touch. Something coiled around it like a snake. It was afraid. "Fear not son, I shall protect you", the thing whispered. She was soft and curled herself further around the seed. "I am a fungus, a sister of mushrooms and toadstools." She embraced the seed gently and it was no more cold now. "If you let me, I will forge a mycorrhiza with you. That is, I shall feed you with my roots till you have your own. I can send my roots deep into the earth and will bring the best nutrients for you. My body will give you anchorage and protection."

The mold sent her arms of ribbon-like hyphae into the seed's embryo, its heart. It nourished the seed with good nourishment and the seed started growing and soon germinated into a seedling.

Days passed and the next spring arrived with a promise of life. The seed was no more a seed but a full grown orchid plant. It bore elegant flowers delicate and pleasant in aroma. Now it held seeds of its own and ready to be swirled into the air for destinations unknown. Throughout the entire year the fungus had supported it in its efforts to grow into a full-fledged plant. Spring was gone and gone was the eastern wind which took with it the orchid seeds. The Orchid was self-supporting now and no more needed the fungus. It has its root inside bottomless earth, its green leaves an efficient cook. The fungus was now weak at the ripe old age of one year. Its embrace loosened, so did its roots which dried up. Bacteria and bugs of the soil bothered it a lot. Old and decrepit, it could not resist them. "Son", it said to the Orchid, "good bye, it's my time to go. It was nice and happy to have you all these months with me."

The Orchid listened silently and then said, "When I was weak and feeble, you nurtured me. It's my time to serve you. Now I shall take care of you." sending its roots deeper into her it whispered, "mother."

(Mycorrhiza is a symbiotic association between a plant and a fungus. Orchid seeds do not carry nutrients with them. The symbiotic fungus feeds it as a seedling. When the orchid is independent, it supports its benefactor — Author)

''ওরা কাজ করে''... একটি পাথুরে রোজনামচা

ছন্দক চ্যাটার্জী
স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ, দর্শন বিভাগ

বহুদিন পর আবারও রাঙামাটির রাস্তায় জঙ্গলভূমি (বীরভূম)। ঢাল উপুড়, ঢাল উপুড়, ঢাল উপুড়। অন্যমনস্ক হয়ে m-8T তে অনিলদার পিছনে আমি। দুপাশে কেবল গাছেদের লাশ। শাল, মহুয়া, অর্জুন, পিয়াসাদের মৃত্যু মিছিল। নীল আকাশের ক্রমশ কালো হয়ে আসা। উঁচু-নীচু টিলা। বেশীর ভাগটাই রুক্ষ। যেন কোন দৈত্য সবুজ দেখলেই হিঁচড়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে। বেআব্রু। টিলাদের কোনা বেয়ে লাল মাটি। আর মাঝে মধ্যে ইউক্যালিপটাস, সোনাঝুরি, আকাশমণি ছড়ানো।

আমি ভাগনাদিঘীর মাঠের পথে। আমার জন্যে অপেক্ষারত সিধু কানহু। রাস্তার বুক চিরে এগিয়ে চলেছি। অন্ধকার হয়ে আসা দু-ধারে মাঝে মধ্যেই দেখতে পাচ্ছি দু-তিনটি লণ্ঠন ঘিরে জটলা। 'এরা কারা'? অনিলদাকে জিজ্ঞাসা করায়, উত্তর পাই সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা চাঁদ, ভৈরব, ডোমন মাঝি, গোক্কো। মনটা দমে আসে। ট্যাক্সি, বল্লাম, তীর-ধনুক গুলো কেমন যেন নির্জীব হয়ে পড়ে আছে। সমানে চলেছে হাঁড়িয়ার পেগ। চিয়ার্স মাতাল বন্ধুরা। গাছের গুঁড়ি, কাটা রাস্তা, তীর বিদ্ধ সিপাহীদের দেহের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে আমাদের টু-হুইলার। বাঁশের কেল্লা, ইংরেজ বন্দীদের উদ্দেশ্যে। রাস্তাটা বাঁক নিতেই দেখতে পাই একটি ইংরাজ ছেলে এবং দুটি আদিবাসী মেয়েকে। ঘনিষ্ঠ অবস্থায়। উত্তর পাই ছেলেটি খাদান মালিক। অজ্ঞান বসে থাকি আমি। খানিক পরে 'কানহু' এর দোরগোড়ায় থামে অনলদা। ঘরের ভিতর গোঙানির শব্দ। দরজা দিয়ে ঢুকে হোঁচট খাই। জ্বলে ওঠে তীব্র টর্চ লাইট। একটা অচেতন মানুষ ঘরে। দেখি একজন মহিলা, চাটাইয়ে। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে গা। উত্তর পাই এই মানুষটিই কানহু। ব্যাটারীর জল মেশানো চুল্লু খেয়ে জ্ঞান হারিয়েছে আর এই মহিলা ওর বৌ। কদিন ধরেই ম্যালেরিয়া, তবে সিধু? হয়তো ভিডিও পার্লারে। যন্ত্রের মতো m-8T তে চড়ে বসি। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে চরাচরে। তবু গা রি রি। দূর থেকে শুনতে পাই 'দো বুন্দ'। কাছে যেতেই পর্দায় নগ্না মহিলারা মেতেছে সমুন্নানে আর তারি সামনে সিধু, বীর সিং মাঝি। কালো প্রামাণিকেরা।

কেন 'সোলারিস' হলো না তারকেভস্কি দা? আপনাকে দাদা বলায় খচবেন না। আসলে আমাদের প্রেসিডেন্সি ও প্রগতিশীল মহলে আট থেকে আশি এমনই চল। আমি যে খুব চেয়েছিলাম আমার বীরভূম যাত্রা হয়ে উঠুক সোলারিসের সেই মনস্তাত্ত্বিকের অভিযান। যিনি এক বিশেষ ধরনের চেতনার অস্তিত্ব সম্পন্ন গ্রহে গিয়ে অদ্ভুত সব ধাঁধা লাগানো ঘটনার সাক্ষী হয়েছিলেন। কিন্তু যখন তাঁর সাত বছর আগে মৃত স্ত্রী ফিরে আসে তখন তিনি উপলব্ধি করেন এই গ্রহ মানুষের গোপনতম। ভাবনা ও কামনার ধরা ছোঁয়াকে রূপ দিতে পারে। আমি যে খুব চেয়েছিলাম লাঠি-টাঙ্গির সিধু কানহু কে।

"অন্ধকার আর একটু জমুক ঘুমুক পাশাপাশি ঐ পাড়াগুলো
আমরা পা টিপে টিপে বের হবো তখনই
যুগের ওপর এঁটে নেবো মুখোশ
হাতে নেবো টাঙ্গি, যাতে রক্তের দাগ লেগে আছে।"

প্রেসিডেন্সি কলেজের একটি পত্রিকার তরফে অনুরোধ ছিলো নেশা নিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখার। নেশাকে ধরতে চেয়েছিলাম সামাজিক প্রেক্ষাপটে, তার ইতিহাস বাস্তবতার বাংলায় কবে মদের এন্ট্রি মেলে এবং কোন কোন অঞ্চলে তা প্রভাব বিস্তার করেছিলো তা জানতে একদিন ফোন করেছিলাম লেখিকা জয়া মিত্রকে। ওনার সূত্রেই আমার বীরভূম যাওয়া। মূলত আদিবাসী জীবনে হাঁড়িয়া এবং ইদানিংকালে বাংলা, চুল্লুর প্রভাব সম্বন্ধে জানতে।

মল্লারপুরে যখন ট্রেন থেকে নামলাম, অন্ধকার তখনও ঘনিয়ে আসেনি। আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলো একটা মারুতি। পিচ রাস্তায় খানিকক্ষণ গিয়েই ডান দিকে বেঁকে গ্রামের পথ ধরলাম। দু-ধারে ধূ ধূ মাঠ। বীরভূমের উঁচু-নিচু জমির রাস্তা। গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ। সঙ্গে সাংস্কৃতিক কর্মী কুনাল দেব, অরুণ রায় এবং গীগ খাওয়াস। সুন্দরবনের মধু সংগ্রহকারীদের মাথার পিছনে মুখোসের কনসেপ্ট এর আবিষ্কর্তা এই অরুণ দা। ইদানিং বীরভূমে গড়িয়া গ্রামে বিকল্প কৃষি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। ওনাদের কথাতেই উঠে আসে — মহম্মদ বাজার, রামপুরহাট, নলহাটি, ময়ূরেশ্বরে এককালে ঘন জঙ্গল ছিল। আজ তা প্রায় নিঃশেষিত। বিগত বছরগুলো জুড়ে বনদপ্তর বনসৃজনের নামে প্রচুর প্রচুর শাল-মহুয়ার

জঙ্গল কেটে ফেলে জমি ও ভূমি জলের পক্ষে ক্ষতিকারক সোনাঝুরি, আকাশমণি, ইউক্যালিপটাস গাছ লাগিয়েছে। অর্জুন, কেঁদ, শাল, পিয়াস ইত্যাদি দেশজ উদ্ভিদ, প্রাকৃতিক নিয়মে বেড়ে ওঠা লতা, গুল্ম, ফুল, ঘাস ছত্রাক, পোকা-মাকড়, জীবজন্তুদের যে জীবনজাল তা ক্রমশ ধ্বংস হয়েছে। আস্তে আস্তে সাঁওতাল গ্রামের মানুষের নিত্য প্রয়োজন মেটানোর জন্যে যে জঙ্গল ফল-পাকুড় মধু-ওষুধ জ্বালানী সরবরাহ করত, যেখান থেকে পাওয়া যেত কুটীর শিল্পের উপাদান তা বনদপ্তর অপ্রয়োজনীয় মনে করে। বনদপ্তর ও কাঠের ব্যবসায়ীরা সাঁওতালদের গাছকে কেবল বিক্রয়যোগ্য কাঠের দাম হিসাবেই মূল্যায়ন করতে শিখিয়েছে। বৃক্ষরোপন করতে চাইলে বনদপ্তর প্রতি ১৫ টা চারা গাছের ১৩ টাই দেয় ইউক্যালিপটাস, সোনাঝুরি, আকাশমণি।

কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, বাংলার দুর্ভিক্ষের ইতিহাসে গত আড়াইশ বছরের তথ্যে কোথাও জঙ্গলচারী আদিবাসীদের অনাহারে শহরে পালিয়ে আসতে দেখা যায়নি অথচ আজ জঙ্গল বিলুপ্ত হওয়ার ফলে অপুষ্টি, অনাহার, রোগ ব্যাধিতে তারাই বেশী বেশী করে আক্রান্ত।

অন্যমনস্ক হয়ে জানলার বাইরে তাকিয়েছিলাম। গাড়ীটা এসে থামলো একটা দোতলা মাটির বাড়ীর সামনে। নিঃস্তব্দতায় সারা গ্রাম ভাসছে। দেখা হলো 'বাংলার মুখ' এর জয় মিত্র এবং 'কালধ্বনীর' প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এনারা সবাই মিলেই গড়িয়া গ্রামে একটি NGO চালান। তবে এ NGO কালো মানুষ দেখিয়ে সাদা মানুষদের থেকে টাকা তোলা নয়। সাঁওতাল মায়েরা যখন খাদান-ক্যাশারে কাজ করতে যান তখন তাদের ছেলেপুলেরা থাকে, পড়াশুনা করে, ছবি আঁকে। বিচিত্র যে সব ছবি। বাচ্চারা কেউ ঝামেলা কোরো না উল্টো পাল্টা প্রশ্ন কোরো না। খেলা ছুটোছুটি, বেয়াদপি সব, চুপচাপ বসে থাকো, বসে আঁকো। আঁকো ফুল, নদী, আর প্রজাপতি, আঁকো মিকি মাউস অগতির গতি। দেখলাম তিন-চার বছরের একটি সাঁওতাল মেয়ে আকাশ জুড়ে কেবল সূর্য এঁকেছে। তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিয়েছে শীতকলে তাদের শীতবস্ত্র নেই। তাই আকালে অনেকগুলো সূর্য থাকলে ঠাণ্ডায় তাদের কষ্ট পেতে হতো না। সমাজের কাছে, এ পূর্ণেন্দু পত্রীর জবাব কি? জবাব চাই জবাব দাও।

পরিচয় হলো 'গো গো গাঁওতা' অথাৎ মায়েদের সমিতির একজন কর্মীর সঙ্গে। সাঁওতাল গ্রাম গুলিতে নাকি বহুবিবাহের প্রচলন বাড়ছে। গো গো গাঁওতা মহিলাদের অধিকার রক্ষার বিষয়ে কাজ করে।

পরিচয় হলো এক ডাক্তার দম্পতির সঙ্গে। তারা হেলথ্ ক্যাম্প করতে এসেছেন কলকাতা থেকে। গল্প হয় সাঁওতালদের শারীরিক অবস্থা নিয়ে। সাঁওতাল বললেই চোখের সামনে যে বলিষ্ঠ পাথরে খোদাই কালো চকচকে দেহ, ঝাঁকড়া চুল ভেসে আসে তা আজ অতীত। অনাহার, অর্ধাহার, অপুষ্টি, অত্যাধিক পরিশ্রমে শরীর হয়েছে শীর্ণ, দূষণের ফলে জন্ম নিয়েছে চর্মরোগ।

রাত গভীর হলে জয়াদি বসেন তাঁর লেখাপত্র নিয়ে হারকিন জ্বেলে। সাঙ্গে গ্লাস ভর্তি লাল চা। আর আমরা ঘুমোই নিথর।

'সকালবেলার রোদ্দুর যেই মাটিতে পা ফেলছে। একটা চড়াই ওমনি দেখি একা দোক্কা খেলছে।' লাল টুকটুকে ভোর না হলেও বড় সুন্দর ছিল সকালটা। তার মধ্যেই শুনি, দূর থেকে ভেসে আসা ঘড় ঘড় শব্দ। জানতে পারি, ক্যাশার চলছে। কাল যে রামপুরহাট এক নং ব্লকের মাসড়া গ্রাম পঞ্চায়েত-গড়িয়া গ্রাম দেখেছিলাম আজ সে ভোল পাল্টেছে। কুনাল দা, জয়াদিদের উথনৌ নিয়ে বড় মিটিং ছিল সেদিন। m-8T টাকে একপেট তেল খাইয়ে দিস হদিস এর রবিন দা আর আমি বেরিয়ে পড়ি খাদান-ক্যাশারে। হু হু করে কুঁড়েঘরগুলো পিছন দিকে ছুটছে। সকালের স্নিগ্ধ হাওয়ায় ধান ক্ষেত দোলে। কাস্তে হাতের সাঁওতাল চাষী, আর্কাইদি গাইদারদের ইউনিফর্ম পরে 'ইশকুল' যাওয়া দেখতে দেখতে বীরভূম সীমান্ত পেরিয়ে ঝাড়খণ্ড। এখানে জমি আর একটু উঁচু নিচু। রাস্তা আরও খারাপ। জঙ্গল একটু ঘন। বনদপ্তর বা চোরাকারবারীরা এখনো এখানে বুঝিয়ে উঠতে পারেনি ইউক্যালিপটাস এর মাহাত্ম্য। তিরতির করে বইছে সুলুঙ্গা কান্দর।

প্রথমে আমরা যাই বেনেগুড়িয়া প্রেসে। স্থাপিত ১৮৬১। অতি প্রাচীন এই ছাপাখানা তৈরী করেছিলেন ইংরেজরা। এখন তার জরাজীর্ণ অবস্থা। প্রেস বন্ধ হয়ে গেছে।

এরপর খাদান বন্দেলাল।

খাদানে সাধারণত মালিক এবং ম্যানেজাররা ঢুকতে দেন না। কিন্তু সৌভাগ্যবশত তখন মালিক বা ম্যানেজার কেউই ছিলেন না আর রবিনদার পরিচিত একজন খাদান-শ্রমিক থাকায় অনায়াসেই আমরা ঢুকে পড়ি খাদান জীবনে। চারদিকে খাদান থেকে তোলা মাটির ছোট ছোট টিলা, তারই মাঝে খাদানের হাঁ মুখ। পাথর বোঝাই ট্রাক আসছে যাচ্ছে। উপর থেকে ৭০-৮০ ফুট নিচের ট্রাক গুলোকে খেলনা লাগছে। কথা বলতে বলতে জানতে পারি, পূর্বাঞ্চলবিখ্যাত এই পাথর শিল্পে কাজ হয় দুভাগে। একটি হলো খাদান, একটি ক্যাশার। খাদানে ডিনামাইট ফাটিয়ে পাথর খসানো হয় এবং ট্রাক বোঝাই করে সেগুলো চলে যায় ক্যাশারে। সেখানে এই পাথরগুলো বিভিন্ন সাইজে ভেঙে গিয়ে জায়গা করে নেয় আমাদের

ঘরবাড়ীর ছাদ ঢালাইয়ে বালি সিমেন্টের বন্ধু হিসেবে। সোনালি চতুর্ভুজ যোজনার হাইরোডে পিচের শয্যাসঙ্গিনী হিসাবে আবার রেললাইন শ্যামার শিব স্টোনচিপ হয়ে জিভ বের করে। খাদানে তিন রকমের শ্রমিক হয়। ডিনামাইট ফাটানোর জন্যে যে ড্রিল করতে হয় তাতে একফুট ড্রিল করলে মেশিন সমেত দুজন শ্রমিকের মজুরি ১২ টাকা। তার মধ্যে ড্রিল মেশিনের মালিক নেন ১০ টাকা আর দু-জন শ্রমিক নেন ২ টাকা। ১৪ থেকে ১৬ ফুট ড্রিল করার পর সেই গর্তে স্থানীয় ভাষায় জরা (অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট) ঢালা হয় এবং তারপর তার মধ্যে ডিনামাইট সেট করে শ্রমিকেরা লাল ঝাণ্ডা নিয়ে বেড়িয়ে পড়েন মানুষ ও গরু-ছাগল একসঙ্গে খেদতে। যাতে কেউ না খাদানের আশেপাশে থাকে। কারণ ডিনামাইট বিস্ফোরনের ফলে মাঝে মধ্যেই পাশের চাষ জমিতে কর্মরত চাষী ও গবাদি পশুর মৃত্যু হয়েছে। লাল ঝাণ্ডা মানে শহরে নিস্তব্ধতা, আতঙ্ক, বন্ধ। এরপর অনেক দূর থেকে ব্যাটারীর সাহায্যে ঘটানো হয় বিস্ফোরণ। বিস্ফোরনের পর চূর্ণ-বিচূর্ণ পাথরখণ্ডকে পাহাড়ের খাঁজ থেকে গহ্বরে ফেলতে সাত-আট জনের একটা গ্রুপ কোমরে দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়ে খাদান গর্তে। সব পাথর এককাট্টা করে নিচে ফেললে মেলে সকলের জন্যে ৬৩ টাকা। ঝুলে ঝুলে কাজ করতে গিয়ে পাথরের চাঁই খসে মাথায় পড়ে প্রায়শই মৃত্যু ঘটেছে এই খাদান শ্রমিকদের। এরপর আর এক ধরনের শ্রমিক ট্রাক শ্রমিক নামে পরিচিত। তারা পাথরগুলিকে ট্রাকে বোঝাই করে এবং তাদের গ্রুপ পায় ১৫৮ টাকা। এই অসুরক্ষিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য ব্যবস্থা আছে LIC র। কিন্তু দেখা যায়, মৃত্যুর পরও জীবন বীমার কোন সাহায্যই মেলে না। একজন খাদান শ্রমিকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। সারাটাক্ষন চোখ লাল। হাঁড়িয়া চুল্লুতে সে আচ্ছন্ন। সে বলছিল, মরা গেলেই ভাল বরং, বৌ-বাচ্চা ৫০০০০ টাকা তো পেত। এই মানুষগুলোর গড় আয়ু ৩৭ থেকে ৪০ বছর। তার বেশী কেউই এরা বাঁচেন না। কর্মক্ষমতা থাকে ৩০-৩২ বছর অবধি। কর্মক্ষমতা না থাকলে টাকাও জোটে না। গ্রাম, নদী, জঙ্গল জুড়ে খাদানের হাঁ মুখ যত বড় হতে থাকে ততই এইসব শ্রমিকদের অবস্থা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। এই মানুষগুলোর কারু অঙ্গহানি হয়েছে। কারু বা শরীর অসম্ভব ভঙ্গুর আর বেশীর ভাগ লোকেরই চোখের সমস্যা। প্রচুর প্রচুর বোল্ডার ম্যানের চোখ কেড়ে নিয়েছে চকিতে ছুটে আসা পাথরের টুকরো। রামায়নের আকালবোধন পর্বে, দুর্গাপূজার পদ্ম ফুলে কমতি থাকায় রামচন্দ্র চক্ষুদানে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু এদের কেন এই চক্ষুদান। ইষ্ট জোনের এর Stone Industry!!! বড় বড় পাথরগুলো খসিয়ে চলে যায় ক্যাশারে। যেখানে পাথর কুঁচি করা হয়ে থাকে। দূষণে সেখানে সাধারণ মানুষের টিকতে পারার কথা নয়। তিনটি ক্যাশার চলে এমন এক অঞ্চলের রাস্তায় m-8T যেতে যেতে চোখে মুখে ধূলো লেগে রাস্তা অন্ধকার। দেখি চোখে-বালি। তাকানো যায় না এক অজানা ভয়ে। এমনই বিভিন্ন অঞ্চলের কোথাও চলে ১০০-১৫০ আবার কোথাও চলে ৩০০টা ক্যাশার। সহজেই অনুমেয় সেসব অঞ্চলের শ্রমিকদের অবস্থা। আমরা ভর দুপুরে কালচে সবুজ নারকেল পাতা দেখে যখন বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে কবিতা করি, আঁকিবুঁকি করি তখন এই শ্রমিকেরা মাথার ওপর দেখেন কালবোশেখি মেঘ। দিগন্ত বাতাস বোধহয় কতদিন দেখেননি এঁরা। মাথায় করে ২০ কিলো পাথর ক্যাশারে ঢাললে কেউ পান ২০ কেউ পান ২৫ পয়সা। ধূলোর এফেক্ট কমাতে ডাক্তারবাবু এদের পরামর্শ দেয় গুড়, কলা, দুধ খাওয়ার কিন্তু তাদের সাধ্যের মধ্যে পড়ে হাড়িয়া বা চুল্লু। ওরা অসময়ে ফুরিয়ে গেলে, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বিধান দেন — পেটের রোগে মৃত্যু হয়েছে, বেশি মদ খেয়ে লিভার গেছে। আসলে ধূলো দূষণের ফলে মানুষের যে নিউমোকোনিওসিস রোগ হয় সরকার ও খাদান মালিকের ভয়ে ডাক্তাররা তা বলতে পারেন না। তাঁরা টি.বি. বলেই চালিয়ে যান।

শহর কলকাতার বুকে চারদিকে 'মাও' রব উঠেছে। তারা নাকি প্রচুর প্রচুর বিকল্প উন্নয়ন। ব্যাপক মানুষের স্বার্থে উন্নয়নের মডেল দেখাচ্ছেন। কান পেতে শুনতে পেলাম অন্য কথা। মাওবাদীরা মাঝে মধ্যে খাদান-ক্যাশারে আসেন মূলত তোলা তুলতে এবং ফেরবার পথে নিচু তলার পুলিশকর্মীদের খুন করে দিয়ে আবারও গা ঢাকা দেন জঙ্গলে। এতদিনে কোন খাদান মালিকদের গায়ে এক ফোঁটা আঁচড় কেউ কাটতে পারেনি। শুনলাম খাদান-ক্যাশার ও কেঁদু পাতার মালিকদের সঙ্গে নাকি মাওবাদীদের এক অদৃশ্য সম্পর্ক আছে। তাদের টাকাতেই পুষ্ট এসব মাওবাদী। কবিগুরু বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই এদের জন্য দুটি লাইন উৎসর্গ করতেন। কেবল 'সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে। পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা। আর দুরন্ত, আয়রে আমার কাঁচা।

আর দেখলাম 'ডিনামাইট' নয়নজুলি। এমনই প্রচুর। মূলত ডিনামাইট ডিলারদের লাইসেন্স থাকার কথা কিন্তু খাদান শ্রমিকদের মুখেই শুনলাম লাইসেন্সের এখানে কোন গল্প নেই।

খাদান-ক্যাশার থেকে ফিরলাম আমরা ধূলো-উড়িয়ে 'মজড়ায়'। মজড়া মানে মজার বাড়ী। সেখানে প্রায় ৫০ জন বাচ্চা থাকে। তখন চলছে তাদের 'ভূরি-ভোজ'। মোটা চালের ভাত আর তার সঙ্গে পুঁইশাক-আলুর ঝোল। বাচ্চারা এখানে স্কুল ভর্তি করে লেখে অ-আ, AB-CD, ছবি আঁকে। খেলে বাংলার ট্রাডিশনাল গেম 'বাবরদী'। সেদিন 'উথনৌ' এর মিটিং থাকায় বাচ্চাগুলো ছোটে বো-কাট্টা। উথনৌ কেন, এই নিয়ে কুনাল দেবের নাতি দীর্ঘ ভূমিকার পর জয়াদি ধরতে থাকেন কীভাবে অরণ্যবাসীকে আমরা শহুরে চোখে প্রান্তিক করেছি। কিভাবে তাদের শিকড় থেকে চিরে চিরে উৎখাত করা হয়েছে। সংস্কৃতিকে একটু একটু করে বানপ্রস্থে পাঠানোর পরিকল্পনা। প্রতিটি জায়গার জমির আলাদা চরিত্র অনুযায়ী সেখানে বিভিন্ন রকমের ফলন দেখা যেত। প্রথমত প্যাটেলনগর, নলহাটি, মুররাই, রামপুরহাট এবং সংলগ্ন অঞ্চল আজ থেকে চল্লিশ বছর আগেও জমি দখলের লড়াইয়ে সাঁওতাল

কৃষকদের আত্মবলিদান ও ঘাম রক্ত ঝরানোর সাক্ষী। বামপন্থী আন্দোলনেও এদের বড় ভূমিকা ছিল। তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ একসময়ের জমিহারা কৃষকরা জমি ফেরত পেয়েছিলেন। কিন্তু 'পাথর শিল্প' এর দাপটে সেইসব জমি বেনাম ও মিথ্যা নামে সাঁওতাল কৃষকদের হাত থেকে দিকু-ব্যবসায়ীরা কেড়ে নিয়েছে। আধুনিক কৃষির নাম করে বেশী ফলনের লোভ দেখিয়ে চাষীদের বীজ রাসায়নিক সার, কীটনাশক, সেচ ব্যবস্থাকে কিনতে শিখিয়েছে। অল্প জল ব্যবহার করে অধিক-ফলনশীল নানা রকমের দেশী শস্য চাষ করার জন্য কোনো বীজ কিনতে হতো না। কিন্তু পুঁজি নির্ভর কৃষি চালু করার জন্য প্রথম দিকে ব্লক কৃষি দপ্তর থেকে বিনা পয়সায় উচ্চ ফলনশীল বীজ দেওয়া হত। ভর্তুকি দেওয়া দামে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক বিক্রি হত। অধিক জল সেচে ব্যবহারের জন্য ভর্তুকি দামে শ্যালো পাম্প বিলি করা হল। নদীতে ব্যারেজ ও নদী বাঁধ দিয়ে ক্যানেল তৈরি হলো। রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে জমির ফলনশীলতা কমলো। মাটির জল ক্রমাগত নামতে শুরু করলো এবং বাঁধ দেওয়া নদীর ক্যানেল পলি পড়ে শুকোলো। বীজ সার কীটনাশকের দাম বাড়ার সাথে সাথে ফসলের দাম না বাড়ায় কৃষককে ঋণ নিতে হলো এবং ঋণ শোধ করতে জমি বিক্রি করতে হলো এবং সেখানে গড়ে উঠলো খাদান-ক্যাশার।

আলোচনা চলতেই থাকে। আমি আবারও বেরিয়ে পড়ি স্থানীয় হাটে-বাজারে। মূলত হাড়িয়ার গন্ধে গন্ধে। ৮ থেকে ১০ টা বাঁশের কাঠামোর উপর ট্রিপল খাটানো। চলছে বিকি-কিনি। মূলত বিক্রি হচ্ছে হাঁড়িয়া চুল্লু। আনুষঙ্গিক হিসাবে সব্জি, মাছ, জামাকাপড়। অন্ধকার ঘন হয়ে আসে, ট্রাক এর পর ট্রাক এসে লাইন লাগাচ্ছে মাঠে ময়দানে। বিক্রি হচ্ছে মেয়ে মানুষ। দেখছি সাঁওতাল মহিলাদের হাত ধরে টানাটানি করছে মদ্যপ পুরুষেরা এবং বিনা বাধায় তারা চলেও যাচ্ছে তাদের সঙ্গে। কোথাও এক কিলো মিষ্টি, কোথাও একটা ব্লাউজ। গন্ধ তেল বা কোন কিছুর বিনিময় ছাড়াই। মূলত ট্রাক-ড্রাইভার, খাদান-ক্যাশার মালিক ও ম্যানেজারের সঙ্গে। একদিন বাইকে চড়তে পাওয়া, একদিন কলকাতা সফর কিংবা ঠাণ্ডা পানীয়ের উল্লাসে।

ফিরে আসি উথলৌ এর অফিসে। মনটা খুব খারাপ। রাত্রিবেলা সার সার আমি, সুশান্ত দা, মিহির দা আর সুব্রত দা। সুব্রত দা প্রফেশনাল প্রুফ রিডার। খুব রসিক। সকালবেলা মাঠে ভেড়া চরতে দেখে তিনি নাকি কোন সাঁওতাল মহিলাকে জিজ্ঞাসা করেছেন এখানে ভেড়া কেন? এই অঞ্চলে তো ছাগল থাকার কথা, তো সেই মহিলা নাকি উত্তর দিয়েছেন শীতকালে তারা গরমের জন্য সেইসব ভেড়াকে জড়িয়ে ধরে রাত্রিবাস করেন। আহঃ যদি শেক্সপীয়র, যদি বোদলেয়ার, ভেড়া হতে পারতেন!!

সকাল হলে মিহিরদার সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে কথা হয়। সাঁওতাল সমাজ সংস্কৃতি নিয়ে। খাদান-ক্যাশার গড়ে ওঠায় কাঁচা টাকার চাহিদা মিটেছে। সুগন্ধী তেল, মোটর বাইক, ঠাণ্ডা পানীয়, স্ন্যাকস বাজারে ঢোকায় কেউ এখন আর কৃষিকাজ করতে চায় না। কারণ টাকা হাতে পেতে পেতে প্রায় একবছর। হাঁড়িয়ার বদলে ঢুকলো চুল্লু এবং ভিডিও পার্লার। জমি বিক্রি করে মোটর বাইক কিনতে গিয়ে সবুজ মাঠ, গাছের ছায়ার শান্তি নিশ্চিহ্ন করে বিকট শব্দ ও ধুলোয় গড়ে উঠলো পাথর শিল্প। পাথর শিল্পও শেষের পথে, এবার তার জায়গায় আসছে কয়লাখনি প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলক কোম্পানিরা।

খাদান বেড়েই চলেছে কৃষি জমিতেও। কৃষিজমিতে রাতের অন্ধকারে ক্যাশারের ধুলো ফেলে তার ফলনক্ষমতা নষ্ট করে দিচ্ছে দিকু-ব্যবসায়ীরা। তারপর ঐ সব বন্ধ্যা জমি বলে লিখিয়ে নিচ্ছে কমদামে। চলছে খাদানশিল্প। ধামসা-মাদলের সাঁওতাল সংস্কৃতি। সুরের গুরু বাজার হেমব্রমকে আমরা খুন করেছি। সাঁওতাল সমাজের বাহা (গাছকে বন্দনার) উৎসব আজ মলিন।

'অরণ্যের দিনরাত্রি' কাটিয়ে বাড়ি ফেরবার পালা এবার। শহীদ এক্সপ্রেসে আমি সওয়ার।

ওঁরা ছিলেন। ওঁরা আছেনও। আমাদের থেকে বহু দূরে প্রান্তবাসী হয়ে। জঙ্গল, রুখুশুখু পাথুরে জমিতে সামান্য চাষের ভরসাতেই ওদের বেঁচে বর্তে থাকা। মাঝে মধ্যে এদের চোখে পড়ে শহরের মিছিলে মিছিলে হাতে তীর ধনুক টাঙ্গি। ওঁরা আসেন-যান ধামসা-মাদল হাতে। কেউ বা ছৌ এর মুখোশ পরে। আমাদের হাতে তালি। পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন সাতকাহনে ধরা পড়ে ওদের অলচিকি। আর ওরা খবরের শিরোনামে আসেন একটা বিদর্ভ হলে। ওরা যে শিকড়-বাকড়, কন্দ, ইঁদুর পুড়িয়ে খান। অসুখে ওঝা-মাঝিন। অনাহারে শুকিয়ে শুকিয়ে সরকার তথ্যের পরিসংখ্যানে মুখ লুকোই আমরা। কিন্তু জঙ্গলমহলের পথে, পাহাড়ের গা ঘেঁষে উন্নয়ন স্বপ্ন বুনতে বুনতে ওঁরা সত্যিই কেমন থাকেন?

"পা থেকে মাথা টলমল করে, দেয়ালে দেয়াল, কার্নিশে কার্নিশ
ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাতে।
বাড়ি ফেরার সময়, বাড়ির ভিতর বাড়ি, পায়ের ভিতর পা
বুকের ভিতর বুক।"

''বালুটিলটিল পঙ্খী কান্দে বালুতে পড়িয়া ....''

শ্রুতি গোস্বামী
স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

এই লেখা এক বিশেষ অঞ্চলের বিশিষ্ট সংস্কৃতির ধরন নিয়ে। লোকসংস্কৃতি বিষয়ক লেখার শুরুতেই যে 'প্রান্তিকতা', 'আঞ্চলিকতা', 'লোক' ইত্যাদি শব্দ নিয়ে কিছু ঘোলাটে প্রশ্ন আর তার ততোধিক ঘোলাটে উত্তর আবশ্যিকভাবে দেওয়া হয়, আমি তার ছায়াও মাড়াব না। কারণ, গবেষণা-কারখানার গম্ভীর কলগুলোর আশপাশ দিয়েও যায়নি এই লেখা। কোনো ক্ষেত্রসমীক্ষা নেই, নেই আঞ্চলিক ভূগোল-ইতিহাস সম্পর্কে ভালোমতো জ্ঞান; তাও এত মারাত্মক দুঃসাহস! আসলে, কলমের পিছনে রয়েছে অসীম অপূর্ব আনন্দবোধ, সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়বার যার প্রবল আশা।

স্কুলে দেখা ভারতের মানচিত্রটুকু সম্বল করে বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশের পূর্বদিক অর্থাৎ জলপাইগুড়ি-কোচবিহার সংলগ্ন ছোট্ট রাজ্য আসাম। আর তার একদম পশ্চিমদিকে এক আশ্চর্য দেশ-গোয়ালপাড়া। অবিভক্ত বাংলায় রংপুরের অন্তর্ভুক্ত হলেও ১৮৭৪-এ একে আসামের অন্তর্গত করা হয়। ভূগোল ম্যাপ-এর কাটাছেঁড়াতে অবশ্য কিছু যায় আসেনি গোয়ালপাড়ার। এখনো তার মুখ ফেরানো পশ্চিমবঙ্গের দিকে; এক হাত কোচবিহার, আর বাংলাদেশের রংপুরের সঙ্গে, আর এক উত্তরে ভুটানের সঙ্গে। মাথার ঠিক ওপরে ব্রহ্মপুত্র, পায়ের তলায় গারো পাহাড়। দিনের পর দিন ধরে গোয়ালপাড়া লালন করে গেছে তার প্রাণের সংস্কৃতিকে এই পরিবেশেই, যেখানে উত্তর থেকে নেমে আসে হাতির দল, ব্রহ্মপুত্র-পাড়ের পাহাড়ি জঙ্গল থেকে বাঘ-মহিষ-ভালুক, বৈশাখে হয় অনাবৃষ্টি, অঘ্রাণে হয় ফসল, — আর এইসব কিছুকে জড়িয়ে রেখে তৈরি হতে থাকে হাজারো গান, লাখো উৎসব, কোটি আনন্দ।

অনুভবের উৎসার ভাষায়। গোয়ালপাড়ার ভাষা রাজবংশী। অসম বা কামরূপ থেকে যার অন্য নাম কামরূপী। ভাষাতাত্ত্বিকরা বাংলার এই উপভাষাটিকে বাংলা ও অসমিয়া — দুইয়েরই প্রাচীন উৎস বলে মনে করেছেন। তাই এই ভাষাই যেন প্রমাণ করে দেয় যে মানচিত্রের বিচ্ছেদ সত্ত্বেও এ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বলয় বাংলাকেই পরিধিভুক্ত করে।

প্রাচীনতার সমস্ত চিহ্ন গোয়ালপাড়ার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে। প্রাগৈতিহাসিক মানব মানুষ ছাড়া সমস্ত অচেনাকেই যে ভীতিপূর্ণ শ্রদ্ধায় দেবাসন দিত, তার পরিচয় শহরের বাইরের বৃহত্তর অংশে বহাল তবিয়তে বর্তমান। মনসা আর দক্ষিণরায় তো বাংলার খুবই চেনা উদাহরণ। ঠিক দক্ষিণরায়েরই গোয়ালপাড়ার রূপ সোনারায় — বাঘ-ভালুকের দেবতা। অরণ্য-বনভূমি অধ্যুষিত অঞ্চলে ইনি গোপালক রাখালদের উপাস্য। একই পূজা উত্তরবঙ্গ আর বাংলাদেশের ঢাকা-ময়মনসিংহ-পাবনা অঞ্চলেও প্রচলিত। পৌষ সংক্রান্তিতে মূর্তি-ঘট-উপাচারহীনভাবে শুধু এক ঝুড়ি ফুল-দক্ষিণা-ছড়া-গান এই দেবতার নৈবেদ্য। আভরণ উপকরণের সমস্ত বাহুল্য ফেলে অকাতরে এই প্রার্থনা—

"সত্যঠাকুর সোনারায় গাইরস্তক দে তুই বর।
ধনে বংশে বারুক গিরি চন্দ্র দিবাংকর।"

সাদার মধ্যে লুকিয়ে থাকা সাতরং যদি হঠাৎ ঝলমলিয়ে ওঠে, তবে তার তুলনা হতে পারে ছোট্ট এই প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রান্তে-প্রান্তরে কথায়-গানে লুকনো অপার ঐশ্বর্যের সঙ্গে। তাদের প্রেম-কামনা-অদম্য অসহায় দ্বন্দ্ব, সবই বড় স্পষ্ট; বড় বাঁধভাঙা সহজতায় তাদের ভাবপ্রকাশ। নারীর ক্রম-বিকশিত যৌবনের উপমা খুঁজতে তাই আকাশের দিকে তাকাতে হয় না—

"তোলা মাটির কলা য্যামোন হল্‌ফল্ হল্‌ফল্ করে—
ঐ মতো নারীর যৈবন দিনে দিনে বাড়ে।।"
বা, "শাক তোলং মুঞি মুটি মুটি — কোচর করোং ভারী

ঐ মতোই দারুণ যেবন বাহর হয় কাপর ফারি।।"

দেহে মনে যোবন পার্পাড় মেলছে। এমন দিনে ঘর-সমাজের বাধন দুঃসহ। নীতিবিধানের বন্ধ দরজার সামনে মনের জমাট বাধা অনুভব প্রকাশের পথ পায় না, সমাজের নিষ্ঠুরতা থেকে সরে এসে সে তাই হাত বাড়ায় গাছের কাছে—

"ও বিরিক্ষো শিমিলা রে — গগনে ম্যালে ঠাল্।
নারী হয়্যা রসের যৈবন রাইখ্বো কতকাল—
বিরিক্ষো শিমিলারে।।
পাহাড়ে কান্দে মালঘুগরা রে-বিরিক্ষো মন যাওং যাওং করে
পরার পুরুষ পদ্দের ফুল-সদায় মনে পড়ে, শিমিলা রে।।"

'বরমপুত্তোর' (ব্রহ্মপুত্র) বা 'বাইরগাঙ'-এর বর্ষার দু'কূল ছাপানো শরীর যখন আস্তে আস্তে ছোট হয়, তখন নদীতীরের বনভূমি থেকে আসে বিশাল বিশাল মোষ। তাদের মস্ত মস্ত পরিবার নিয়ে। জঙ্গল থেকে বেরনো হলেও নিতান্ত বুনো নয় এরা, কারণ সঙ্গে থাকে এদের মানুষ আধনায়কবর্গ, যারা বালুচরে বানায় বাথান। ভয়ঙ্করদেহী মহিষদের পালক এইসব আশ্চর্য মানুষগুলোকে নিয়ে আবার গড়ে উঠেছে আরেক শ্রোণর গান। এহ দামাল দুরন্ত রোম্যান্টিক মানুষগুলো কখনো হয়েছে বাঁধনছাড়া গৃহী, কখনো আবার কুলবধূর পরনায়ক—

"তোমরা যাইবেন মইষ বাতানে রে, মৈষাল আমার পোড়ে হিয়া
এই সোনার যৈবন কি রাখিম কাপড়ে বান্দিয়া,
মইষাল ও।"

বা, "মইষ ধরিয়া যান্ রে মৈষাল, উরায় রে বাবরী চুল,
তোর পীরিতে পরিয়া মৈষাল ভাঙ্গল রে জাতি কুল।"

ভুটানের পাদদেশের ever-green area থেকে ছড়িয়ে পড়ল আরো এক গান, যার প্রতি চরণ ফিরে বেড়ায় মাহুতবন্ধুর কথা নিয়ে।

"ও মোর সারিন হাতীর মাহুত রে
সে দিন মাহুত আসাম যায় নারীর মন মোর জ্বালিয়া রয় রে।
আকাশেতে নাইরে চন্দ্র, কি করে তোর তারা,
যেবা নারীর সোয়ামী নাই রে — ও তার দিনে অন্ধিহারা।।"

ওদিকে মাহুত শুনতে পায় না কোনো কান্নাই। বর্ষাশেষে শরতের মেঘ-রোদে তার প্রাণ ছুটে চলে মৃত্যুময় জীবনের দিকে। ফাঁস দিয়ে পোষা হাতি ধরা, তাড়া করে 'গড়ে' হাতি ফেলার উত্তেজনা ঘরে কোথায়? ঘরের কোণ থেকে মাহুত, 'ফান্দি'রা তাই ছিটকে বেরিয়ে আসে বিপুলতার টানে, যেখানে জীবন-মৃত্যু পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, যেখানে হিন্দু-মুসলমান বা বডো-গারো-রাঙা এক পথে চলে, হাতির সামনে দাঁড়িয়ে "আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলরে ভাই হায় আল্লাহ্ রসুল" বলতে কারো জাত যায় না।

অবশ্য মাহুতের মনও তো পাথর নয়। হস্তীকন্যার দয়া পাবার আশায় সে-ও ঘরের কথা বলে দুঃখ করে—

"বালুটিল্টিল্ পঙ্খী কান্দে বালুতে পড়িয়া,
গৌরীপুরিয়া মাহুত কান্দে ও সখি বাড়ী ছাড়িয়া।
আই ছাড়িলং, তাই ছাড়িলং, ছাড়িলং সোনার পুরী
বিয়াও করিয়া ছাড়িয়া আসিলং ও সখি অল্প বয়সের নারী।।"

অনিতেশ চক্রবর্তী
তৃতীয় বর্ষ, বংলা বিভাগ

বিবাহকালীন উৎসবের মূল রূপটা যে কোনো সংস্কৃতির মধ্যেই প্রায় একই। বিবাহের পূর্ব আয়োজন, স্ত্রী-আচার, রঙ্গরস, কন্যাবিরহ, কন্যাপক্ষের ক্রন্দন, কন্যাবিদায় ইত্যাদি তার অবশ্যম্ভাবী Common facts। এই অঞ্চলের গানও এমন কথা বলে। এতেও আসে হরগৌরী প্রসঙ্গ, রাম-সীতা প্রসঙ্গ, মেনকা-উমা প্রসঙ্গ, নানা আচারে আয়োজন থেকে ফুটে ওঠে আঞ্চলিক সংস্কৃতির একেবারে গোড়ার রূপ।

অনুষ্ঠানের সর্বত্র মেয়েদেরই একচ্ছত্র আধিপত্য। আর এই সূত্রেই উঠে এসেছে মেয়েদের এতদিনের না-বলা নিতান্ত সহজ কথাগুলো। বিয়ের ভয়ে কাতর বালিকা তাই এত সহজে বলে—

"আরার বাশ কাটিয়া রে ও দয়ার কাকা রে
ও কি হায় গড়ান কাকা ও নাল পিঞ্জরী রে,
ও কি হায় তারে খোপে ময়নাক রাখো লুকি রে।
তোমার পড়ন-তোতা রে পরে লইয়া যাইবে রে
ও কি মাও আঞ্চলে ঢাকিয়া রাখো রূপ রে।"

মায়ের মনও ব্যথাতুর, এতদিন ধরে বড় করে তোলা আদরের কন্যাকে সম্প্রদান করতে তাঁর বুক ফেটে যায়—

"ময়না রে মোর দুধেরে বালা রে—
হোট হাতে পুষিনু ময়না দুধ ভাত দিয়া
যাবার কালে যায় রে ময়না বুকে শ্যাল দিয়া।
পালিয়া পাড়েয়া ময়না করে পঞ্চ রাও
এ রাতি পোয়াইলে ময়না কায় বুলিবে মাও।"

শহুরে সংস্কৃতির আগ্রাসন আঞ্চলিকতার শিকড়কে উপরে ফেলতে পারে না। সমস্ত আদিমতাই তার শক্তি; তার নগ্নতাও অসুখকর নয়।

গ্রীষ্মের খরতাপে মাঠের পর মাঠ বিবর্ণ। বৃষ্টি চাই। কিন্তু ধরিত্রী রমণীর প্রতি বিমুখ মেঘ। সেই মেঘকে ধরে আনার কৌশল নিতে হয় গ্রামের মেয়েদেরই। নানা তুকতাক, আচার-বিচার, উপকরণ সংগ্রহের শেষে গভীর রাতে লোকালয় থেকে বহুদূরবর্তী মাঠ বা নদীতীরে জড়ো হয় সধবা-বিধবা মেয়েরা। পূজাস্থানে খোঁড়ে গর্ত, তাতে পুঁতে দেওয়া হয় কলাগাছটিকে, প্রধানা পূজারিনীর গা-ধোয়া জল, গুয়াপান, ফিঙের বাসা ইত্যাদি দিয়ে পূজা শেষ হয়। শুরু হয় আমন্ত্রণজ্ঞাপন। এই মেঘদেবতার নাম 'হুদমদ্যাও' [সম্ভবত হুতুম পেঁচার ডাকের সঙ্গে মেঘগর্জনের মিলে 'হুদুম' আর অপদেবতা বা 'দ্যাও'-এর মিশ্রণ]। তিনি প্রিয়া বসুন্ধরাকে দেখা দিচ্ছেন না। তাই সেই বিরহিনীর অশ্রু ঝরে পড়ে—

"আরে ওরে নিদয়া ম্যাঘ দ্যাখ নজর ঘুরিয়া,
ওরে তুই আবানে নারীর বুক বিরল ফাটিয়া,
আরে ওরে নিঠুর ম্যাঘ রে
আরে ওরে কটুর ম্যাঘ রে।"

কৃপাভিক্ষা, গঞ্জনা, ধিক্কার — কিছুই মেঘদেবতাকে দিতে বাদ থাকে না। বারবারই বলা হয়—

"হুদুমদ্যাও হুদুমদ্যাও, এক ছল্কা পানি দ্যাও
ছুয়ায় আছি নাই পানি ছুয়ায়ছুতী বারাবানি
কালা ম্যাঘ ধওলা ম্যাঘ সোদর ভাই

এক ঝাক পানি দ্যাও গাও ধুবার চাই।"—

অমার্জিত আদিরসাত্মক গানের সঙ্গে মেঘদেবতার প্রতীক কলাগাছকে আলিঙ্গন করে চলে সম্পূর্ণ নগ্ন নৃত্য।

অশালীন মনে হয়? তবে হোক!

এই অশালীনতা অশালীন বলেই সুন্দর। এই নগ্নতার মুখোশ নেই। আমাদের ঝাঁ-চক্‌চকে শপিং-মল-ফ্লাইওভার কাফে বা খাদির পাঞ্জাবি-আধুনিক কবিতা-শৌখিন বিপ্লবকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে বেঁচে থাকুক ওরা!

আগেই বলেছি, এই লেখাকে ক্ষুদ্র গবেষণার ফসল ভাবলেও ভুল হবে। শ্রীমতী নীহার বড়ুয়ার একটি প্রবন্ধ সংকলন-গ্রন্থ পড়ে বড় ভালো লেগেছিল। তাঁর চোখে দেখা কাছের জগৎকে দূর থেকে একটু কল্পনার চেষ্টা করেছি, আর চেষ্টা করেছি তার ভাগ দেবার।

শেষ পাতে বলি, অনেক গবেষণা হলো, আলমারিতে অনেক জায়গা নেওয়া বই লেখা হলো, অনেক স্বাচ্ছন্দ্যও হলো। এবার একটু মাঠে নামা যাক্।

শিশিরবিন্দুগুলো ঝরে যাচ্ছে যে!

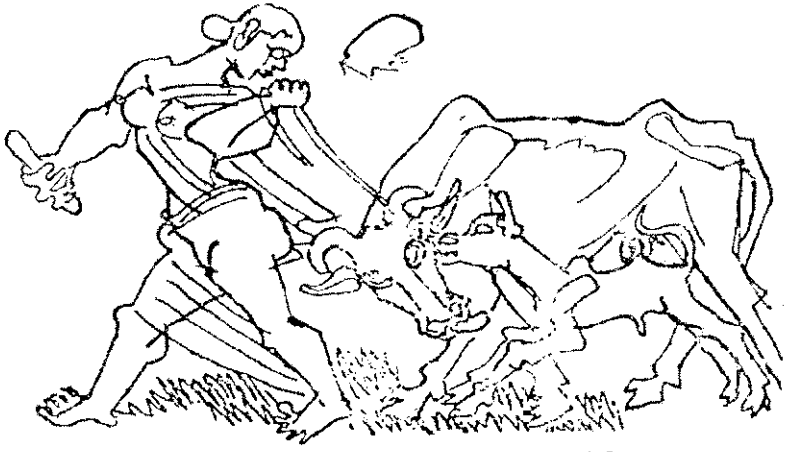

শিল্পী : রামকিঙ্কর বেইজ

প্রসঙ্গ : প্রসঙ্গান্তর

শুচিস্মিতা ঘোষ

স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

"সত্যি বলতে, মাইকেলের মহিমা বাংলা সাহিত্যের প্রসিদ্ধতম কিংবদন্তী, দুর্মরতম কুসংস্কার। কর্মফল তাঁকে পৌঁছিয়ে দিয়েছে সেই ভুল স্বর্গে, যেখানে মহত্ত্ব নিতান্তই ধরে নেওয়া হয়, পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না। এ অবস্থা কবির পক্ষে সুখকর নয়, পাঠকের পক্ষে মারাত্মক।" — বুদ্ধদেব বসু।

লেখার শুরুতেই কেন এই উদ্ধৃতি, তার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন। সমালোচক হওয়ার পর্বতপ্রমাণ স্বপ্ন নিয়ে মাইকেলের ইংরেজি লেখার দিকে যাওয়া এবং সেই কারণেই বুঝতে পারছি 'পাঠকের পক্ষে মারাত্মক' বিষয়টা কত গভীর!

এমনিতেই বাঙালি পাঠক মাইকেলের ইংরেজি সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে এমন কিছু মোহগ্রস্ত নন; আর আমার মতে না হওয়াটাই স্বাভাবিক। মাইকেলের চিঠিপত্র বা সাময়িকপত্রে লেখা প্রবন্ধের ইংরেজি উচ্ছ্বাসময়, আবেগপ্রবণ হলেও যতটা সাবলীল, ইংরেজি নাটকগুলোতে ততটাই স্তব্ধ, বদ্ধ। খুব জোরের সঙ্গে বলতে পারি, আধুনিক পাঠক দুরন্ত উৎসাহের সঙ্গে পড়তে বসলেও Ratnavali, Sermistha, Rizia : The Empress of Inde-এর শেষ অবধি সেই উৎসাহ বজায় রাখতে পারবেন না।

মাইকেল যখন হিন্দু কলেজে ভর্তি হন, তখন সেখানে প্রায় নক্ষত্র-সমাবেশ রয়েছে বলা যায়। দিক্‌পাল সমস্ত অধ্যাপক, Scholarদের সঙ্গে মধুসূদনের ওঠাবসা এবং তিনি নিজেও যে সমান প্রতিভাবান ছিলেন তা তাঁর বন্ধুদের চিঠি থেকেই জানা যায়—

"Modhu was a genius. Even his foibles and eccentricities had a touch of romance, and a taste of 'the attic salt' that made them savoury and sweet."

ছাত্রাবস্থায় কবিতা লিখছেন, প্রবন্ধ লিখছেন, আর তাঁর romantic eccentricities-এর দ্বারা প্রমাণ করে দিচ্ছেন যে "..... nevertheless he was undeniably the gupiter among the bright stars of college." তাঁর সহপাঠীরা প্রত্যেকেই পরবর্তীকালে কম-বেশি নামকরা ব্যক্তিত্ব হয়েছিলেন আর তাই অনুমান করা ভুল হবে না যে মাইকেল সম্পর্কে তাদের মূল্যায়ন ঠিক ছিল। এই নক্ষত্র সমাবেশে তিনি জুপিটারের মতো ছিলেন ঠিকই, কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে এর কোন সাহিত্যিক উত্তরাধিকার তাঁর জীবনের প্রাথমিক ইংরেজি সাহিত্যকর্মগুলিতে নেই। অবশ্য এমনও হতে পারে, মাদ্রাজে লেখালিখি শুরু করার আগে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে যে টালমাটাল ঘটেছিলো, তারই প্রভাব পড়েছিল এই পর্বের লেখাগুলোতে।

সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বদের জীবনের যদি কোন graph আঁকা হয়, তা হলে মাইকেল নিঃসন্দেহে আলাদাভাবে চিহ্নিত হবেন। ১৮৪৩ সালে খ্রিস্টান হওয়া, বাবার সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতি, পড়ার খরচ না পাওয়ায় বিশপস্ কলেজ ছেড়ে দেওয়া — মাদ্রাজে যাওয়ার আগেই এত কিছু ঘটে গেছে। ১৮৪৮ এ যখন তিনি কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন তখন তাঁর বয়স মাত্র চব্বিশ বছর। কলকাতায় থাকাটা তার পক্ষে এতটাই অসহ্য হয়ে উঠেছিল যে তিনি বন্ধুকে লিখছেন— "..... when I left calcutta, I was half mad with vexotion and anxiety." বিদেশি ভাষায় সাহিত্যচর্চা করার স্বপ্ন এতগুলো বাধার সামনে পড়বে মাইকেল নিশ্চয়ই তা বুঝতে পারেননি; পারলে বোধহয় নিজের স্থিতাবস্থাকে অস্তিত্ব সংকটে ফেলতেন না। অবশ্য এসবই অনুমান নির্ভর বক্তব্য। Eccentric, romantic মাইকেল নিজে থেকেই হয়তো এ ধরণের স্থিতাবস্থা চাইছেলেন না। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে তিনি বুঝতে পারেননি ইংরেজি ভাষা তার সাহিত্যের উপযুক্ত মাধ্যম নয় — অন্তত তখনো পর্যন্ত তো বটেই।

মাদ্রাজে গিয়েই সেই অর্থে কবি, সাংবাদিক হিসেবে মাইকেলের প্রতিষ্ঠা পাওয়া। Visions of the past ও The captive Ladie (১৮৪৯) – পুস্তকাকারে কবির লেখার প্রথম প্রকাশ। মোটামুটি ১৮৫৪-এর মধ্যেই ইউরেশিয়ান পত্রিকায় 'Rizia : The Empress of Inde'-এর প্রকাশ। ইতিমধ্যে প্রকাশিত 'The Captive Ladie' কলকাতায় প্রশংসা পায় নি এবং Rizia-ও সেই ধারাবাহিকতা বহন করেছে। জীবনের যে বয়সে চিন্তাভাবনার পরিধি ও প্রতিভার পালিশ চরম পর্যায়ে যেতে পারে সেই সময়ে মাইকেল ইংরেজিতে 'Rizia'-র মতো অপরিণত কব্যনাট্য লিখছেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, Rizia : The Empress of Inde-এর সাহিত্যমূল্য বিচার করার জায়গা নেই, কারণ নাটক হিসেবে তা

নিতান্তই historical fiction-এর অসার্থক নকলনবিশি। মাইকেলের মহাকাব্যগুলোও এই ত্রুটিতে আক্রান্ত আর Rizia-ও তার ব্যতিক্রম নয়। নাটকের বীররসে আমরা কোনভাবেই উৎসাহিত হই না, করুণরস আমাদের উপলব্ধিকে স্পর্শ করতে পারে না। আর নটি সিনের দীর্ঘ অমিত্রাক্ষর ছন্দ ইংরেজি ভাষার অভ্যস্ত পাঠককেও ক্লান্ত করে তোলে।

ইতিমধ্যে ধৈর্যহারা পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, তা হলে বক্তব্য বিষয়টা কি?

বক্তব্য নাটকটির সাহিত্যমূল্য নিয়ে নয়, নাটকটির সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে, বিষয়-নির্বাচন নিয়ে। মাইকেল নিজে বলেছেন—

"We ought to take up Indo-Mussalman subjects. The Mahomedans are a fiercer race than ourselves, and would afford splendid oppurtunity for the display of passion. Their women are more cut out for intrigue than ours."

বিষয়টি লক্ষণীয়। নাটকের সময়কাল লক্ষণীয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৫৩-৫৪ সালে সুলতানি যুগের এবং ভারতের আধুনিক-পূর্ব যুগের একমাত্র মহিলা শাসককে নিয়ে একটি নাটক লিখলেন। যদিও নাটকে এত সম্ভাবনাময় চরিত্রের সঙ্গে মাইকেল সুবিচার করতে পারেন নি, তা সত্ত্বেও বিষয়-নির্বাচনের জন্য আমরা তাঁর প্রশংসা করতে পারি।

মাইকেলের সাহিত্যজীবনে 'Rizia : The Empress of Inde' একেবারেই অনালোচিত একটি অধ্যায়। কিন্তু ভেবে দেখুন সমাপতন কত গভীর হতে পারে! ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে সুলতানা রাজিয়ার উপস্থিতি মাত্র কয়েক বছর। কিন্তু তার প্রতিভা, নিঃসঙ্গতা, দুর্ভাগ্য, পরাজয় ঐতিহাসিকদেরও যেমন ভাবায়, সাধারণ পাঠককেও তেমন ভাবায়। মাইকেল কোথাও নিশ্চয় এর সঙ্গে একাত্মবোধ করেছিলেন; আর সেটাই হয়তো স্বাভাবিক। দুটো আলাদা যুগের প্রতিনিধিত্ব করলেও জীবনধর্মিতায় দুজনের মধ্যে মিল খুঁজতে অসুবিধা হবে না। কিন্তু আরো সূক্ষ্মতার খোঁজে গেলে দেখতে পাব ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহে আরেকজন নারীচরিত্রের কথা যিনি এককভাবে আরেকটি যুগ পরিবর্তনের সাক্ষী হয়ে রয়েছেন। লেখকের ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হওয়ার ক্ষমতা থাকে — এটা যদি মেনে নি, তাহলে এরকম একটা literary coincidence ঘটতে পারে। যদি পাঠক এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হন তাহলে বলা যায় এটা নিজের সময়ের থেকে এগিয়ে থাকার ফল। অবচেতনে হোক বা সযত্ন প্রয়াসেই হোক মাইকেল সমাজের অন্তর্লীন বিদ্রোহী মনোভাবটি ধরতে চেয়েছিলেন। হতে পারে সমাপতন, কিন্তু ভেবে দেখলে আশ্চর্যজনকভাবে যুগ-সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক। মাদ্রাজ রেসিডেন্সির ইংরেজমহলে নিজের প্রতিষ্ঠার বাইরে গিয়ে মধুসূদন লিখতে পেরেছেন এইরকম একটা বিষয়ের উপর নাটক এবং যদি নাটকটি সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ হতো, তা হলে জাতীয়তাবাদী সাহিত্যের প্রথম যুগের সূচনা করতে পারতো। '৫৭-এর মহাবিদ্রোহের আগেই কলকাতায় ফিরছেন মাইকেল, প্রত্যক্ষ করছেন সামাজিক-রাজনৈতিক পালাবদল। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার এটাই যে, একসময়ে নারীশিক্ষার মতো সমসাময়িক বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ লিখে পুরস্কৃত হওয়া মাইকেল এত বড় দোলাচলে কলম ধরলেন না। সেটা কি সেই সময়ের প্রচলিত সাহিত্যভাবনার ধারা থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার ভয়ে? তবে, খুব সরবভাবে না হোক, এই নাটকটাই কি মধুসূদনকে ভাবাচ্ছে মাতৃভাষায় ফেরার কথা? মাইকেলের ইংরেজি ভাষার প্রতি টান যতই গভীর হোক, বা তাতে সাহিত্যচর্চার ব্যর্থতা যতই আঘাত করুক, অজান্তে হলেও জাতীয়তাবোধ তার gut feeling-কে নাড়া দিয়েছিলো। না হলে তিনি ফিরতে পারতেন না। রাজনৈতিক ব্যাপারে মাইকেল একেবারে অসচেতন থাকতে পারেন না, নিজের ইয়ং-বেঙ্গলীয় অনুবর্তন, শিক্ষা, সমসময়ের দাবিই তার বিরোধিতা করবে। এরই দুর্বল বহিঃপ্রকাশ 'Rijia : The Empress of Inde'। বিষয়টি সম্পর্কে দূরদর্শিতা আর রচনার বলিষ্ঠতা থাকলে অবচেতন মনের উপলব্ধি সচেতন, সযত্ন রূপ পেতে পারতো। মাইকেলের সীমাবদ্ধতা এখানেই সবথেকে বেশি যে তিনি চাইলে সময়ের আগে যেতে পারতেন, কিন্তু পারেননি। সেটার কারণ ভাষামাধ্যম হোক বা নাট্যপ্রতিভা, আক্ষেপের বিষয় এটাই যে বিশেষ একটি সাহিত্যিক সন্ধিক্ষণ সূচিত হওয়ার আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল— 'বাংলা কাব্যের মুক্তিদাতা' না হয়ে মাইকেল বাংলার প্রথম জাতীয়তাবাদী সাহিত্যিক হতে পারতেন। Rizia : The Empress of Inde ইতিহাস সৃষ্টির কারণ হয়েও হতে পারলো না কারণ একবিংশ শতাব্দীতে এই অর্বাচীন সমালোচককে তৎকালীন প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে বের করতে দেওয়া ছাড়া নাটকটি সমসময়কে কিছু দিতে পারে নি। মাইকেলও একেবারেই পারেননি বললে তাঁর উপর অবিচার করা হয় কারণ, এর ৬ বছরের মধ্যেই 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'-এর মতো সার্থক প্রহসন লিখলেন। প্রতীকী চরিত্র সৃষ্টির ব্যাপারে মাইকেলের স্বাভাবিক হাতযশ ছিল কিন্তু Rizia সেই প্রতিভার অংশ পায় নি। এক্ষেত্রে সমস্ত দায় আবেগপ্রবণ হৃদয়বৃত্ত আর বয়সের ঘাড়ে ঠেলে দেওয়া যায় কারণ যুবক অবস্থায় তিনি এই নাটক লিখেছেন ..... যদিও কেউ কেউ এই ধারণার বিরোধিতা করবেন। যে সাহিত্যিক পরিণতি পরবর্তী লেখাগুলোর কিছুটা খুঁজে পাওয়া যায়, সেই পর্যায়ের পরিণতি এই লেখায় খুঁজতে যাওয়া ঠিক না। তবে, চরিত্র সৃষ্টির বা নির্বাচনের ক্ষেত্রে রিজিয়ার প্রতিবিম্ব কিছুটা পাওয়া যায় বীরাঙ্গনা কাব্যের তারার চরিত্রে আর মেঘনাদবধকাব্যের মেঘনাদের চরিত্রে। যে passion, fierceness, intrigue বৈশিষ্ট্য Rizia-র আনতে চেয়েছিলেন সেই আকাঙ্ক্ষা মেঘনাদ ও তারা কিছুটা পূরণ করেছে। Rizia : The Empress of Inde বাংলায় লেখা হলে সার্থক ও ভাবগম্ভীর হতো কিনা বলতে পারি না। কিন্তু ইংরেজি নাটকে মাইকেলের ব্যর্থতা বাংলা কাব্য ও প্রহসনকে রূপদান করতে সাহায্য করেছে। পাঠকের প্রাপ্তি এটাই।

লেখার প্রথমে বুদ্ধদেব বসুর লেখাটিতে কবি, পাঠকের কথা পাই। একটু আগে লেখক আর পাঠকের প্রাপ্তির বিষয়েও কম-বেশি আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু সমালোচকের

ব্যাপারটা ততটা পরিষ্কার করে দেখাননি -- প্রাসঙ্গিকতা বিচার করেই হয়তো। মাইকেলের সমালোচনা প্রসঙ্গে কিছু কথা এসে গেছে ঠিকই কিন্তু তার থেকে কোন সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। মাইকেল বা যে কোন সাহিত্যিক পাঠককে কি দিতে পেরেছেন, কি দিতে পারেননি, তা এত সহজেই স্থির করে ফেলতে পারি — এই ছাড়পত্র পেলাম কি করে? .... কেউ যদি এই প্রশ্ন করেন তা হলে উত্তর দেওয়া মুশকিল।

সমালোচনার অধিকারক্ষেত্র কতদূর প্রসারিত হতে পারে তার কোনো নিয়ম আছে কি? নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু কাদের বলব সমালোচক?

সমালোচনা যদি "the interpretation, analysis, classification and ultimate judgement of works of literature, which has become a kind of literary genre itself" হয়, তবে সমালোচক এই 'judgement' এর দায়িত্বটা নেন। আবার যদি সমালোচনাকে শুধুই "the understanding and appreciation of literary texts" হয় তবে সেক্ষেত্রে সমালোচকের ভূমিকাটা পাল্টে যায়। যেমন Martin Grey বা Richard Dutton-এর সংজ্ঞায়নে আপত্তির কারণটা বলা দরকার। সমালোচনা, সাহিত্যেরই অনেকগুলো extensive form-এর মধ্যে অন্যতম, তাই নানারকম সংজ্ঞা পাওয়া স্বাভাবিক। কোন কোন বিষয়ে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ সংজ্ঞায়ন কঠিনও বটে, অসম্ভবও বটে; বিশেষত যদি তা সাহিত্যিক পরিসীমার অন্তর্গত হয়।

যারা ভাবছেন সব বিষয়ে যখন এত আপত্তি, তখন নিজে একটা সংজ্ঞা দিলেই তো হয় .... খুবই লোভনীয় প্রস্তাব হলেও সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করব। সাহিত্যিক হওয়া পৃথিবীর কঠিনতম কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম; চেষ্টা করলেই সবার দ্বারা হয় না। আবার কেউ কেউ অনায়াস দক্ষতায় পাতা আর কালি কোম্পানীর ব্যবসা বাড়িয়ে দিতে পারেন। সাহিত্যিক ও সমালোচকদের দপ্তরে কদাচিৎ vacancy থাকে, আর দরখাস্ত দিলেই মঞ্জুর হবে এমন কোন নিশ্চয়তাও নেই। সবথেকে মুশকিলের কথা বল সমালোচকরাও আর আজকাল supreme court নন। তাদের সমালোচনার জন্যও লোক মজুত থাকে এবং তারা যেহেতু কোনো বিশেষিত গোষ্ঠী নামে পরিচিত নন, তাদের বক্তব্য ঠেলা ভারি কঠিন।

Literary Reference Frame বা সাহিত্যিক নির্দেশতন্ত্র বলতে যা বোঝায় তাতে এটুকু বোঝা যায় যে, সাহিত্য সমালোচনা যে চূড়ান্ত অপক্ষপাতিত্ব আর নিঃশর্ত বিশ্লেষণ দাবি করে তা অনেকটাই খাতা-কলমে সীমাবদ্ধ। খুব পরিষ্কার করে বললে, এক অর্থে এটা অসম্ভব কারণ যে ব্যক্তিই তার মেধা, মনন, গ্রহণক্ষমতা ও রুচি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত — কাজেই তার ছাপ তার মন্তব্য ও বিচার-ক্ষমতায় পড়তেও বাধ্য। সুতরাং যিনি সমালোচক তিনি যুক্তিগ্রাহ্য, আত্মসচেতন, সতর্ক হবেন অবশ্যই, কিন্তু আদ্যোপান্তভাবে নিরপেক্ষ হতে পারবেন না। সচেতনভাবেও নিজের অবচেতনে গেঁথে থাকা পছন্দ-অপছন্দ, মননকে অস্বীকার করা শক্ত। সাহিত্য সমালোচনা বিরুদ্ধতা বা বিরূপতা প্রকাশের মঞ্চ অবশ্যই নয়, কিন্তু পারিভাষিক অর্থে সমালোচনার দায়িত্ব পালন করতে চাইলে তার ফল লেখক এবং পাঠক — দুজনের ক্ষেত্রেই সাংঘাতিক!

আলোচনা আরো একটু তথ্যনিষ্ঠ করতে হলে তিনটি উদ্ধৃতি এক্ষেত্রে উল্লেখ্য; যেগুলি তিনটি ভিন্ন সময়ের সাহিত্যিক মতামতের প্রতিনিধিত্ব করছে:

১। "গুণ-দোষানশাস্ত্রজ্ঞঃ কথং বিভজতে জনঃ।
কিমন্ধস্যাধিকারোহস্তি রূপভেদোপলব্ধিষু।।"

— আচার্য দণ্ডী, 'কাব্যাদর্শ'

২। "যেমন সাহিত্যের স্বাধীন রচনায় এক-একজনের প্রতিভা সর্বকালের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করে, সর্বকালের আসন অধিকার করে, তেমনি বিচারের প্রতিভাও আছে, এক-একজনের পরখ করিবার শক্তি ও অসামান্য হইয়া থাকে। যাহা ক্ষণিক, যাহা সংকীর্ণ, তাহা তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিতে পারে না; যাহা ধ্রুব, যাহা চিরন্তন, এক মুহূর্তেই তাহা তাঁহারা চিনিতে পারেন। সাহিত্যের নিত্যবস্তুর সহিত পরিচয় লাভ করিয়া নিত্যত্বের লক্ষণগুলি তাঁহারা জ্ঞাতসারে এবং অলক্ষ্যে অন্তঃকরণের সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন, স্বভাবে এবং শিক্ষায় তাঁহারা সর্বকালীন বিচারকের পদ গ্রহণ করিবার যোগ্য।

আবার ব্যবসাদার বিচারকও আছে। তাহাদের পুঁথিগত বিদ্যা। তাহারা সারস্বত প্রসাদের দেউড়িতে বসিয়া হাঁকডাক, তর্জন গর্জন, ঘুষ ও ঘুষির কারবার করিয়া থাকে; অন্তঃপুরের সহিত তাহাদের পরিচয় নাই।"

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যের বিচারক', সাহিত্য।

৩। "The new breed of academic critics tend to think of themselves as a new avant-garde which has supplanted the old breed of 'creative' or 'imaginative' writers. As a result they take themselves very seriously indeed, they write almost exclusively about each other, and they have created a criticism that is self-referential, self perpetuating and self-everything else. But esstntially they are simply a

new breed of university careerists, establishing and prepetuating their position with their own linguistic version of bureaucratic red-tape." — বিংশ শতাব্দীর অতি আধুনিক ব্রিটিশ সমালোচকের মন্তব্যের সঙ্গে আচার্য দণ্ডী বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মিল যে থাকবে না সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু, তিনটি মতামতের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও সমানধর্মিতাও রয়েছে। আচার্য দণ্ডী বলছেন :

"যিনি সাহিত্যবিদ্যা বা অলঙ্কারশাস্ত্রে পারদর্শী নন, তিনি কিভাবে কবিকর্মের গুণ, দোষ বা উৎকর্ষ ও উপকর্ষের পার্থক্য উপলব্ধি করবেন? অন্ধের কি রূপভেদ করবার শক্তি থাকে?" রবীন্দ্রনাথ প্রায় এই একই কথা বলছেন তবে আধুনিক ভাষ্যে : পাশ্চাত্যের সমালোচনারীতি বহুমাত্রিকতার কথা বললেও প্রত্যেকে একটি বিষয়ে একমত যে, যিনি বা যারা সাহিত্যিকদের গ্রন্থবদ্ধ উপলব্ধি ও মননের বিচার করবেন তাদের ক্ষেত্রে cultural, educational and emotional enrichment' মুখ্য চাহিদা হবে।

কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায় যে কোথাও কেন এমন কোন ধারণা দেওয়া হল না যাতে লেখকের নিজস্ব সমালোচনা গুরুত্ব পেতে পারে বা পাঠক-সমালোচক এই গোষ্ঠীর বাইরেও কেউ সমালোচক হতে পারেন। অথচ, একটি সাহিত্যসৃষ্টির জন্য যার cultural, educational আর emotional enrichment সবথেকে বেশি কাজ করে, তিনি হলেন লেখক সাহিত্যিক নিজের রচনার প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট হবেন — এই জায়গা থেকে হয়তো তার সমালোচনা 'আত্মতুষ্টি' বা 'কৈফিয়ৎ'-এর নাম পায়। কিন্তু, এর আগেই আমরা আলোচনা করেছি, সমালোচকরাও কিরকম নিরুপায়ভাবেই পক্ষপাতিত্ব করে ফেলেন। সেটা লেখকের প্রতি বা কোন নির্দিষ্ট বিষয়-পছন্দ-অপছন্দের ওপর নয় — এই পক্ষপাতিত্ব নিজের মেধা ও মননের প্রতি। আমার মতে লেখকই তার নিজের সবথেকে বড় সমালোচক হতে পারেন। যে উপলব্ধি থেকে সাহিত্যরচনা সম্ভব, নিজে না লিখলে তা বুঝতে পারা যায় না। তাই যদি প্রকৃত অর্থে 'নিঃশর্ত বিশ্লেষণ' দরকার হয়, তবে একমাত্র লেখকের সমালোচনাই সেই দাবি পূরণ করতে পারে। এই মন্তব্যের সপক্ষে প্রমাণ খুঁজতে চাইলে ফিরে যেতে হবে আচার্য মহিমভট্টের 'ব্যক্তিবিবেক'-এর একটি কারিকায় —

"রসানুগুণ শব্দার্থ চিন্তাস্তিমিতচেতসঃ।
ক্ষণং স্বরূপস্পর্শোত্থা প্রজ্ঞেব প্রতিভা কবেঃ।।"

অর্থাৎ, সাহিত্যবিচারের কেন্দ্রবিন্দু হলো কবিপ্রতিভা, যার সঙ্গে রসানুভূতি, নব নব অর্থের উন্মেষ এবং তা প্রকাশ করার বাহনরূপ শব্দ ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত।

সাহিত্য বা তার সমালোচনা কোন বিচ্ছিন্ন idea বা concept নয়। সমাজ ও মানুষের সঙ্গে এর সম্পৃক্ততা যে কত গভীর তা সব প্রশ্নের ঊর্ধ্বে — এক অর্থে দুটি বিষয় পরস্পরের পরিপূরক। কোনটা ভালো সাহিত্য, কোনটা মন্দ সাহিত্য শেষ অবধি এটা বিচার করে যুগ ও সেই সময়ের চাহিদা। সাহিত্য এমন একটা মাধ্যম যার থেকে পাঠক উপলব্ধি ও চেতনাসমৃদ্ধতা আশা করেন আর সমালোচনার ক্ষেত্রেও একথা সত্যি। তা না হলে 'সমালোচনা-সাহিত্য' পরিভাষাটি তৈরী হতো না। পরিপ্রেক্ষিতে নির্ভর এই বিষয়টি শুধুমাত্র কিছু 'value' আর 'meaning' খোঁজার মাধ্যম নয়। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই সাহিত্য সমালোচনা কোন spiritual improvement-এর দায়ভার বয়ে নিয়ে বেড়ায় না। কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য কোনো দেশের সাহিত্যই আর Puritanical classification অনুসরণ করে না। এটি এখন বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গি দ্বারা বিবেচিত এবং সেই কারণেই এই বিষয়টির সংজ্ঞায়িত হওয়ার দাবি এত প্রবল — যা লেখক, পাঠক, সমালোচক, না-সমালোচক এবং নির্বিবাদী আলোচক সবার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।।

সিনেমা : একটি সমীক্ষা

সংহিতা সান্যাল

স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' দেখে এসে দিদি আর বোনের মধ্যে মারাত্মক ঝগড়া। দিদির বক্তব্য— ওটা কীরকম সিনেমা হলো? কে অপরাধী আগে থেকেই বোঝা গেল — খালি মারপিট আর ভাঁড়ামির রিলিফ? ওদিকে বোন আবার পরমব্রতর টি-শার্ট, সব্যসাচীর পিস্তল আর বিভুর 'আরিব্বাস'-এই কুপোকাত! তার তো 'হেব্বি' লেগেছে! প্রবল ঝামেলার পর মূল সমস্যাটা বোঝা গেল — দিদি মূল উপন্যাসটা আগেই পড়েছে। আর অত্যাধুনিকা, Computer-tution – JEE নিয়ে ব্যস্ত বোনের বইয়ের র‍্যাকে গল্পের বই ঠাঁই পায়নি – এই তার প্রথম ফেলুদা পরিচয়।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই পড়া বনাম অভিনয় দেখা দ্বন্দ্বটা বেশ পুরনো। পাঠক যা পড়ছে আর দর্শক যা দেখছে, দুয়ের মধ্যে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মিল খুব কম থাকে। আর গরমিল মানেই অবশ্যম্ভাবী প্রশ্ন -- কোনটা শ্রেষ্ঠ? কারোরই যুক্তির ভাঁড়ার খালি নয়। গোড়ার গল্পটায় ফিরে যাই। দিদিটি কি সিনেমা বিমুখ? মোটেই না! সেদিনও তো হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল সোফায় — 'সোনার কেল্লা' শুরু হতেই! তুমি যুক্তি দেবে — ঐ সিনেমার পরিচালক আর উপন্যাসের লেখক তো একই ব্যক্তি। তাই হয়তো তাঁর গল্প আর রূপোলী পর্দার আড়াই ঘন্টা মিলেমিশে যায়। একদম হক্ কথা। বরং তাঁর মতো করে দুটো মেলাতে পারেননি বলেই বিধুবিনোদ চোপড়ার 'Parineeta' মেলোড্রামাটিক লাগে, সুব্রত সেনের 'বিবর'-এ মন ভরে না, অর্জুন চক্রবর্তীর 'টলিলাইট্স্'-র নাচগান 'রঙীন পৃথিবী'-র পাশে অহেতুক, অসহ্য ঠেকে। 'One night @ call centre' যারা পড়েছে, 'Hello' তাদের অত উপভোগ্য লাগে না। বোনটি সত্যিই সেই রোমাঞ্চ সিনেমায় পায়নি, যা থাকে গোয়েন্দা কাহিনীর *'Thrill'* হিসেবে অপরাধীর আত্মপরিচয় গোপন রাখার প্রয়াসে। কিন্তু তা বলে বোনেরাও মোটেই ভ্রান্ত নয়। তাদেরও যুক্তি আছে — হ্যারি পটারের প্রথম সিনেমাটা মূল বইটার চেয়েও ভালো ছিল। 'কিন্নর দল' ছোট গল্প, কিন্তু 'আলো' অনেক বেশি মন ভরায়। 'দাদার কীর্তি' উপন্যাস যতনা উপভোগ্য তার চেয়ে বেশী বিখ্যাত চলচ্চিত্রটি, তাপস-মহুয়ার যৌথ অভিনয় আজও অনেকে ভোলেননি। 'ঝিন্দের বন্দী' অত্যন্ত সুখপাঠ্য উপন্যাস। কিন্তু ভিন্নতর উপসংহার ও অভিনয়গুণে চলচ্চিত্রটিও কিছু কম সমাদৃত নয়। এগুলি সার্থক চলচ্চিত্রায়নের উদাহরণ।

আসলে সমস্যাটা তৈরি হয়, কারণ বই পড়তে গেলে একেকজন পাঠক একেকভাবে চরিত্র, পরিবেশ, ঘটনাগুলিকে কল্পনা করে নেন। রবীন্দ্রনাথ 'শেষের কবিতা'-য় অমিত ও লাবণ্যর বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। তবু আমার চোখে তাদের চেহারা একরকম, তোমার চোখে অন্যরকম হতে বাধ্য (শুনেছি কে যেন ওই উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়নে অভিষেক বচ্চন-রানি মুখার্জিকে ভেবেছিলেন!) যখনই বই পড়ছি, তখনই অবিকল একটি সিনেমা আমাদের মনোজগতে ঘটতে থাকে, যার পরিচালক, আলোকচিত্রী, পোশাক-পরিকল্পনাকারী — এমন কি অভিনেতাও এবং দর্শক ওই পাঠক। লেখক আড়ালে দৈববাণী করে চলেন— পাঠক দেখে চলে ঘটনাপ্রবাহ। অন্যদিকে সত্যি সিনেমাজগতে কী ঘটে? ভেবে দেখা উচিত, যে কোনো সিনেমাই কিন্তু আসলে একটা গল্প। এখানে গল্পটাকে কল্পনা করেন পরিচালক নিজে, তারপর যেমন দেখলেন সেভাবে সাজিয়ে তুলে ধরেন ক্যামেরায়। বড়জোর সেটে উপস্থিত কয়েকজনের মত যুক্ত হয় তাতে, এইমাত্র। বই থেকে গল্প নিয়ে সিনেমা হলে লক্ষ লক্ষ দর্শক যায় তাদের বিচিত্র সব কল্পনা নিয়ে আর প্রেক্ষাগৃহে দেখে একজনের— ওই পরিচালকের মনের প্রতিফলন। সম্মুখ সমরটা ঘটে দর্শক বনাম পরিচালকের Vs. বই সিনেমার নয়।

দর্শক দেখে বটে, দ্বন্দ্বও হয়। যদি পরিচালক দর্শকের কল্পনাতীত ভালো কিছু তৈরি করেন — তখন সাহিত্য মাথা নত করে। দর্শক উপলব্ধি করে, তার কল্পনার চারুলতা চলচ্চিত্রের নায়িকার উচ্চতায় যেতে পারেনি — কিংবা অমুক পরিচালকের মতো করে কোনো ঘটনাকে দেখানো তার চিন্তার বাইরে ছিল। আর যদি চলচ্চিত্রের মান নীচু হয়? দর্শক হতাশ — উদ্ভাসিত পাঠক। দুর্ভাগ্য, এমন ঘটনাই বেশি ঘটে। মূল উপন্যাসকে শস্তা জনপ্রিয়তা কুড়োবার উদ্দেশ্যে যখন আইটেম সং, মেলোড্রামায় মুড়ে দেয়া হয় -- আর সঙ্গে যুক্ত হয় দর্শকের স্তম্ভিত হয়ে যাবার মতো -- বলা ভাল 'Shocking' তারকাসম্ভার — তখন লজ্জায় মাথা নীচু করে মুভি ক্যামেরাও। বাস্তবিকই, কজন পরিচালক মূল গল্প আর চলচ্চিত্র – উভয়কে সমমানের স্তরে গড়তে পারেন? কতজনের ড্রয়ারে দেখা যায় একই গল্পের বই ও DVD পাশাপাশি রাখা? এযুগে মানুষের মনের গভীরতা বড্ড কমে গেছে। মনোগ্রাহী গল্প ও চলচ্চিত্রের

প্লট — দুয়েরই সমান আকাল। এই প্রবন্ধ লিখতে গিয়েও সর্বজনগ্রাহ্য 'ভালো' বিশেষণ লাগাবার জন্যে অতি সাম্প্রতিক কোনো চলচ্চিত্র বা বইয়ের নাম সাহস করে মুখে আনা যাচ্ছে না। কাউকে তোষামোদ করে লাভ কি? মাঝখান থেকে আমার রুচিবোধ নিয়ে টানাটানি!

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শ্রেষ্ঠত্ব কাউকে দেয়াটা বেশ কঠিন কাজ! হুঁ হুঁ বাবা, এর নাম পশ্চিমবঙ্গ! এখানে 'পারমিতার একদিন' আর 'M.L.A. ফাটাকেষ্ট' দুই-ই 'সুপারহিট'! এখানে লোকাল ট্রেনে 'রবীন্দ্রনাথের ভূতের গল্প' আর কলেজ স্ট্রীটে শক্তির কবিতা পড়তে না পড়তেই বিক্রী হয়ে যায়! আরে দেখো না, বাঙালির কতজন সুপার হিরো— উত্তম কুমার, দেব আনন্দ, রবি কিষেণ, শাহরুখ এমনকি সানি দেওল বা 'চিরদিনই ....'-র নতুন ছেলেটাও একই সারিতে গুঁতোগুঁতি করে বসে! এ দেশে কাকে জয়ী বলব? তবে প্রবন্ধটা লেখার জন্যে কাগজ যখন মিলেছে তখন একটু আঁতেল-আঁতেল ভান দেখিয়ে ব্যক্তিগত মতামত দেয়াই যায়। এ অধমের অভিমত, Readymade জিনিসের চেয়ে কাঁচামালের প্রয়োজনটা বেশি। তাই চলচ্চিত্রের মতো প্যাকেজ, যা কোনো একজনের কল্পনার একটা 'Finished Good', তার চেয়ে বই একধাপ এগিয়ে। বইয়ের হরফগুলো তো সেই কল্পনার আঁতুড়ঘর এবং পাঠকভেদে ভিন্নতর কল্পনার উৎস। হয়তো 'বই উইয়ে কাটে, চলচ্চিত্র সংরক্ষণযোগ্য' যুক্তি দেখানো যায়। কিন্তু বল, একটা বই থেকে একাধিক চলচ্চিত্র বানানো গেলেও — কোন চলচ্চিত্র থেকে কি মূল উপন্যাসকে পাওয়া যাবে? ক্যামেরার অ্যাঙ্গেল, শটের মাপ এগুলো তো ধ্রুবক — বাঁধাধরা গত। কিন্তু যে ভাষার মোচড়, যে গূঢ় মনোসমীক্ষা, যে হৃদয়গ্রাহী বিবরণ লেখক রেখে যান বইয়ের পাতায়, তা কি একটা শটের চেয়ে বেশি দুর্লভ নয়? খুব কম পরিচালক মনে রাখার মতো একেকটা মুহূর্ত তৈরি করেন, তাঁরা হয়তো শতকে একজন হিসাবে জন্ম নেন! আর সত্যি বলতে কি, নিজেদের কল্পনাটাকেই আমরা বেশি পছন্দ করি — সিনেমার ভালোমন্দ তুলনাও করি তার মাপকাঠিতেই। দূরদর্শনে 'শাহরুখওয়ালা' দেবদাস দেখতে ঝাঁপিয়ে পড়ি (শাহরুখকেই দেখতে, সিনেমাটা নয় কিন্তু!) কিন্তু নিজেরা যখন বই পড়ি? তোমরা কি জানো, ওসব ঋতুপর্ণা-টর্না দূর অস্ত, আমি নিজেই তখন দামিনী? গৌতম ঘোষ জানেন কি, আমার সামনের জানালার ছেলেটা কখনো অনিমেষ হয়ে যায়? আমার দাদা কখন নীললোহিত, কখনই বা সে ফেলুদা — অঙ্কস্যাররূপী মগনলালকে দমন করে বুঝতে পারি না। শুধু বুঝি, দুর্লভ অনুভূতিগুলোকেই সংরক্ষণ করতে হয়। তাই আমি চললাম আমার বইয়ের তাকে ন্যাপথলিন রাখতে। তুমি আইনক্স যাবে না পাতিরামে, ভাবতে থাকো .....।

মুখে খড়কুটো নিয়ে যে পাখি এসেছে, তার কাছে,
সাইকেল নামিয়ে রেখে যে ছেলে আসছে, তার কাছে,
যে ডাঙা-ঝিনুনি নিয়ে দৌড়ে গেল, আজ তারো গাছে
আমি করজোড়ে বলি : এসো, কাছে এসো,

অন্ধকারে আমরা কেন এখনো একাকী?

—প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

Leaves of Grass – A Journey

Pritha Kundu
Department of English, U.G. Second Year

It is a story of growth- from the tiny leaves of grass to a vast stretch of green - God's handkerchief. It is the story behind the making of a book reappearing in many versions, expanded and transformed as the author's experiences and the nation's history modified itself and grew.

"Here I sit gossiping in the early candle-light of old age", Walt Whitman wrote in a prose epilogue to his Leaves of Grass,

"I and my book -casting backward glances over our travel'd road. My book and I ... what a period we have presumed to span."

The book, for him, was more than a book- it was his another self. Together, Whitman and his book saw a young nation approaching and then, surviving the terrible bloodshed of the Civil War. The United States, in the late nineteenth century, was gradually overflowing its continental limits, becoming an industrialized world power. Whitman glowing with his spirit of nationalism, set out to write the poetry of this New America, in the 'American language'.

When Leaves of Grass first came out in 1855 it was peculiar in both makeup and content. Inside the cloth cover, the reader's eye was to draw to an engraved portrait of a bearded man, as 'one of the roughs'. It was hardly received as a 'promising' book in his own nation during his life time. Nor did the democratic leaven the American workingmen, farmers and artisans- to whom Leaves of Grass had been addressed embrace it warmly. The only significant appreciation, as it seems, came from Ralph Waldo Emerson, who wrote to Whitman–

"I greet you at the beginning of a great career... I rubbed my eyes a little, to see,
if this sunbeam were no illusion, but the solid sense of the book is a sobre certainty."

In 1856 Whitman released a second edition with a total of 39 poems. Over the course of his life, he continued to rework and enlarge the volume, publishing several more editions of the book. The 'death bed edition' left in 1892 contained 383 poems in 14 sprawling sections : *Inscriptions, Children of Adam, Calamus, Birds of Passage, Sea drift, By the road side, Drum Taps, Memories of President Lincoln. Autumn Rivulets, Whispers of Heavenly Death, From Noon to Starry Night, Songs of Parting, First Annex, Songs of Seventy and Second Annex: Good Bye, my Fancy.* Each edition is self-sufficient. Famous poems from *the Deathbed Edition include 'When Lilacs Last in the Dooryard Bloom'd'*, and *'O Captain, my Captain'*, both written on the memory of President Lincoln, along with *Out of the Cradle Endlessly Rocking'* and *'America'*- the poem he chose to record lines from his own voice.

Whitman's subject has been made up of America, with an expansive variety of smaller subjects, capturing essence of his nation including slavery, democracy, education, occupation, landscape, war, aging, death as well as immortality, romance and spirituality- everything in his poems essentially American. *"I Hear America Singing"* is an excellent example of how he uses these disperate subjects to create an impulsive portrait of America. He hears 'varied carols': the machines, the carpenter, the mason, the boatman, the woodcutter, the mother, the young wife — all.

"Singing with open mouths their strong melodious song."

Whitman's greatest legacy is his invention of a truly 'American free-verse'. His groundbreakimg, open, inclusive poems are written

in long sprawling lines embodying the democratic spirit of his 'New America'. The critical and popular response to his style was mixed and bewildered. *Leaves of Grass* was most harshly criticized, for his free-verse did not fit into the dominating British model of poetry. Mathew Arnold wrote,

"... while you think it is his highest merit that he is so unlike everyone else, to me, this seems to be his demerit."

Ezra Pound expressed an ambivalent admiration:

" His crudity is an exceedingly great stench, but it is America. He is the hollow place in the rock that echoes with the time."

Since then, reactions to Whitman have been at both extremes : His book has been banned for 'sensuality' one decade, and then praised as the cornerstone of American politics. the next. And recently, with the 150th anniversary of Leaves of Grass, the American poets and critics have regarded Whitman as the man "who came to shape our readers of nationhood, democracy and freedom." (poets.org from The Academy of American Poets)

From the very beginning Whitman foresaw a grand scale—almost epical, for the book. He accommodates the history, politics and culture of the nation–state in verse:

"The greatest poet forms the consistence of what is to be from what has been and is ... he says to the past,'Rise and walk before me that I may realize you' ... he places himself where the future becomes present".

Now one may realise that the main genesis-motive of the *Leaves of Grass* was the poet's conviction, as he himself said,*"the crowning growth of America is to be spiritual and heroic".*

And the leaves of grass , for him, emerged." ed as a motif of this growth – spiritual, because an expanded bed of grass is

"the handkerchief of the Lord.
A scented gift and remembrance designedly drapt...",

and heroic, because *"... a leave of grass is no less than journey work of the stars."*

Life, vitality, vigour and growth – the qualities of the green grass are the qualities of the zeitgeist, as the poet believes.

Whitman sought out to seek a collective identity of the countrymen, he insisted on being indivisible from the people about he wrote,

"The proof of the poet is that his country absorbs him as affectionately as he absorbed it", The metaphoric amalgamation of the poet and his countrymen finds an eloquent expression in *'Songs of myself'*–

"I celebrate myself
And what I assume you shall assume
For every atom belonging to me as good belongs to you."

Another way in which he wanted to unite the individual selves of the Americans in the 1855 edition, created a controversy that haunted him throughout his life. Drawing upon the then legitimate science of phrenology, he called for a re-evaluation of sensual and sexual desire in all forms celebrating those as God given, and, therefore, 'one' and unified. Both the human body and soul bear the inimitable impress of the Almighty.

"Leaves are not shed from the trees or trees from the earth than they are shed out of you."

While reviewers such as Emerson welcomed Whitman's iconoclasm, others regarded it as 'vile'. Rufus Griswold, a famous Baptist minister turned journalist screamed abuses against the poet. Nevertheless, abuses were something that Whitman was to get accustomed to. It is an irony that he had seen his book take its place in world literature. British intellectuals like Oscar Wilde, Swinburne, Hopkins,

Tennyson, were his fervent readers; but in his own dear land, it remained to a certain extent, an 'out law book'. One early reviewer called it

'a mass of filthy stupid'. Another asked-

"Who is this arrogant young man who proclaims himself the poet of the time, and who roots like a pig . among a rotten garbage of licentious thoughts?"

In 1865,he was fired from his clerkship in the Interior Department, because the secretary found the leaves to be in violation of "the rules of decorum and propriety prescribed by a Christian civilization. " In 1881, the district attorney of Boston , ordered Whitman's publisher to exclude the poems like *'A woman waits for me'*, *'The Dalliance of the Eagle'* and *'To a common prostitute'*, regarding them as 'obscure'. Whitman made no compromise, and managed to find a home for his edition in Philadelphia. He reflected at that time:

"I tickle myself with the thought how it may be said years hence that at any rate no book on earth ever had such a history."

The poet, despite all these blows, never gave up: Can the growth of grass ever be checked? Whitman's work lives on, an inspiration to the poets of later generations. He hoped that the readers in future would find the creator alive among the 'leaves', and they would also find themselves in his embrace.The dream, the appeal has really come true –

"Camerado, this is no book,
Who touches this touches a man,
Is it night ? are we here together alone ?
It is I you hold and who holds you ,
I spring from the pages into your arms."

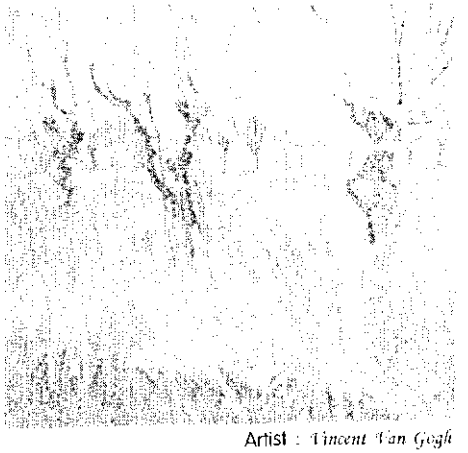

Artist : Vincent Van Gogh

On Satan, Satanists & Satanism

Ujaan Ghosh
Department of History, First Year

To God? He loves thee not;
The God thou serv'st is thine own appetite,
Wherein is fix'd the love of Beelzebub;
To him I'll build an altar and a church,
And offer lukewarm blood of new born.
[Doctor Faustus, Christopher Marlowe, Act 2-Scene 1]

Faust or Faustus (Latin for "auspicious" or "lucky") is the protagonist of a classic German legend, who makes a pact with the Devil in exchange for knowledge. Faust's story is the basis for many literary, artistic, cinematic, and musical works such as those by Christopher Marlowe, Goethe, Thomas Mann, Washington Irving, Mikhail Bulgakov, Gustov Mahler, Franz Liszt and Oscar Wilde. Faustus signs over his soul to Lucifer (Satan), in return of keeping Mephistophilis, Satan's agent, for twenty four years whom he summoned by the power of magic. Mephistophilis agrees to fulfill all earthly desires of Faustus including love, knowledge and power in exchange for his soul. Free and effortless access to everything that men may die for, makes Faustus choose self-damnation, though he seems to take a chance to repent from time to time. However, each time the devil appears and warns him not to by means of temptation for more power, more knowledge and more magic. In the end Faustus is strongly urged by an old man (representing the spirit of angel) to make repentance but it is too late. The devil carries him off to hell.

Though Satanism as an organized activity did not exist much before the 17th century, the devil worshipping was found everywhere during the Renaissance as an act of defiance among those who opposed the authority of the Christian Church. *The Grimoire of Honorious*, a magical text book first printed in the 17th century (but perhaps older), gave instructions for saying masses to conjure demons. In the 17th century, satanic activities were conducted by Christians who indulged in the magical rites of the Black Mass presided over by the priests mostly defrocked by the Catholic Church. In England the 'Hellfire' club was founded by Sir Francis Dashhood in the eighteenth century which has often been described as satanic. However, in activity it was little more than a club for adolescent-like men to indulge in drinking, sexual-play with women called 'nuns' and such outrageous behaviour. The members were said to conduct Black Masses but it is doubtful that these were serious satanic activities.

In the 19th century the Church of Carmel was formed by Eugene Vintras who claimed that he was the reinacarnated prophet Elijah and had received visions of the archangel, the Holy Ghost St. Joseph and the Virgin Mary for establishing a new religious order. Vintras went about the countryside preaching this news and acquiring followers including priests. By 1848 The Church of Carmel was condemned by the Pope. Later in 1851 Vintras was accused of conducting Black Masses which mostly encouraged sexual obsecenities during prayers at the altar. Perhaps the most famous Satanist in the 19th century France was Abbé Boullan who formed a splinter group of the Church of Carmel upon Vintras' death. He ran the group for eighteen years and allegedly practised black magic and infant sacrifice ritual of satanic worship referred to in the opening quote of this article.

Aleister Crowley known as the Black Pope never considered himself as a Satanist; but his writings *The Book of Law* and *The Equinox* become the basis for modern Satanism. He is reported to have crucified a toad as Jesus. He was a drug addict whose son mysteriously died during a private ritual, which only two had attended. Crowley had to end up as a babbling incoherent idiot. A Black Mass was performed at his funeral.

It is time to say a few words on The Black Mass, a popular ritual observed by most of the occultists including the worshippers of Satan. In an article named *The Black Mass* Diane Vera writes that the Black Mass is not just one single ritual, it is a category of rituals which used the format of Catholic Mass but involved prayers to Satan and/or blasphemies against the Christian God. The Black Mass has influenced the occult scene in general and not just Satanism. For example, Crowely's Gnostic Mass or the kind of the Mass practiced by the members of the Priory of Sion in Dan Brown's Da *Vinci Code* does not involve prayers to Satan or any of the cruder anti-Christian blasphemies usually associated with the Black Mass. It is only another creative variation on the Catholic Mass and does borrow key elements of streotypical Black Mass such as the women on the altar.

It is important to note in this connection the ritual of the left-hand Tantrists consisted of a kind of black mass in which all of the taboos of conventional Hinduism were conscientiously violated. Thus, in place of the traditional five elements (*tattvas*) of the Hindu cosmos, these Tantrists used the five *m's* : *mamsa* (flesh, meat), *matsya* (fish), *madya* (fermented grapes, wine), *mudra* (frumentum, cereal, parched grain, or gestures), and *maithuna* (fornication). This latter element was made particularly antinomian through the involvement of forbidden women—who was identified with the Goddess. [Encyclopedia Britannica]

Black Mass is conducted with the view to obtaining magical powers, and this is the ultimate rite for a real Satanist to obtain magic powers. There is a group of secretive Satanists who believe in the traditional "hate Christianity" ideals, what is good in the Bible turns bad to them. They believe in burning crosses, sacrificing children on the altar, spitting over the crosses when the ceremony is over and last but not the least crosses being tattooed on the soles of the feet so that the symbol of Christ is continually trodden underfoot. Not only the fictitious Faustus but also the real life rock idol Kurt Cobain, the lead singer, guitarist, and songwriter for the ***Nirvana*** was a staunch worshipper of Satan who proclaimed "get stoned and worship Satan". He is said to have decorated his apartment as he explained, with baby dolls hanging by their necks with blood all over them (Rolling Stone, Inside the Heart & Mind of Nirvana, by Michael Azerrad, April 16, 1992).

However, Satanists are divided in a number of categories and they differ in the way they perceive the idea of Satan and perform his worship. The most popular and well known category of Satanists are the one who follow the Satanic Bible and are members of the Satanic church at San Francisco. Anton Szandor La Vey shaved his head and created the Church Of Satan [COS] on April 30, 1966 and he is considered as the father of the modern Satanic Movement. The only available scripture is the *Satanic Bible* which was written by Lavey himself. Other works of Lavey include *The Satanic Rituals, The Satanic Witch,* The *Devil's Notebook* and *Satan Speaks*— all these renders a great overview about the history and contemporary practices of the COS.

The Satanists follow Nine Satanic statements and Eleven Satanic rules on Earth as found in the satanic bible-they are as follows :

The Nine Satanic Statements :

1. Satan represents indulgence instead of abstinence!
2. Satan represents vital existence instead of spiritual pipe dreams!
3. Satan represents undefiled wisdom instead of hypocritical self-deceit!
4. Satan represents kindness to those who deserve it instead of love wasted on ingrates!
5. Satan represents vengeance instead of turning the other cheek!

6. Satan represents responsibility to the responsible instead of concern for psychic vampires!
7. Satan represents man as just another animal, sometimes better, more often worse than those that walk on all-fours, who, because of his "divine spiritual and intellectual development," has become the most vicious animal of all!
8. Satan represents all of the so-called sins, as they all lead to physical, mental, or emotional gratification!
9. Satan has been the best friend the Church has ever had, as He has kept it in business all these years!

The Eleven Satanic Rules of the Earth :

1. Do not give opinions or advice unless you are asked.
2. Do not tell your troubles to others unless you are sure they want to hear them.
3. When in another's lair, show him respect or else do not go there.
4. If a guest in your lair annoys you, treat him cruelly and without mercy.
5. Do not make sexual advances unless you are given the mating signal.
6. Do not take that which does not belong to you unless it is a burden to the other person and he cries out to be relieved.
7. Acknowledge the power of magic if you have employed it successfully to obtain your desires. If you deny the power of magic after having called upon it with success, you will lose all you have obtained.
8. Do not complain about anything to which you need not subject yourself.
9. Do not harm little children.
10. Do not kill non-human animals unless you are attacked or for your food.
11. When walking in open territory, bother no one. If someone bothers you, ask him to stop. If he does not stop, destroy him.

There are also **nine Satanic sins they are :** Stupidity, pretentiousness, solipsism, self-deceit, herd conformity, lack of perspective, forgetfulness of past orthodoxies, counterproductive pride, and lack of aesthetics.

The Church of Satan derives its concept from Pagan image of power, virility, sexuality and sensuality. Satan is viewed here as a symbolic force rather than a living deity, It has nothing to do with darkness, torture, hell and profound evil. The major emphasis in satanic religion is given to the individual rather than on a God or Goddess.

There are no elements of Devil worship in the Church of Satan. To the Satanist, he is his own God. Satan is not a conscious entity to be worshipped, rather a reservior of power inside each human to be tapped at will. Thus any concept of sacrifice is rejected as a Christian aberration — in Satanism there's no deity to which one can sacrifice.

Satan (Standard Hebrew **Satan'el**, English *accuser*) is a term that orginates from the Abrahamic faiths, being traditionally applied to an angel in Judeo-Christian belief, and to a jinn in Islamic belief. While Hebrew ha-Satan is "the accuser" and Satan itself means "to overcome" — the one who challenged the religious faith of humans in the books of Job and Zechariah. Satanism, thus, is the worship of the biblical Satan. The first blow that Satan hurls in God's domain is the event surrounding the *Fall of Man*. In *Book Four of Paradise Lost* Milton calls Satan "an infernal serpent" for his seduction of the Mother of Mankind. However, in Gnostic faith he is represented as one showing the ignorant the actual path of knowledge.

"The Christian creation account was not simply a candid tale for children nor was it of merely theoretical interest", says Paul A. Cantor in *Creature and Created; Myth making and English Romanticism*. He draws support from Harold Bloom's *Agon : Toward a theory of revisionism* to show that the biblical acount of creation or the garden of Eden story embodies a conservative moral which is intimately bound up with the efforts of the old regime to maintain the status quo in Europe. Man's arrogance in breaking God's commandment, i.e. eating the Forbidden Fruit from the Knowledge Tree ruined his Paradise where God gave him the opportunity to be completely happy.

The lessons to be learnt, therefore, is that man should never again try to improve upon God's handiwork, but instead obey him without question, which in practice means to obey his constituted authorities in Church and state on earth. One must learn to accept human condition as one finds it, and endure its pains with patience and humiiity. The peculiarly gnostic form of creation myth provides the revolutionary reply to this religious conservation man need no longer be in awe of his creator; he need no longer even be grateful for being created : one is reminded of Tagore's famous song, *"amaye noile tribhubaneshwar tomar prem hoto je michhe"*. It is in this connection perhaps that Satan or Lucifer appears to be the unsung hero of the Bible—one who courageously stood up against God's tyranny and injustice. And to curb the spirit of rebellion God put Satan in a bowl of fire.

However, Satan's image as the champion of anti-establishment fails to earn him any great respect in the minds of people over the ages. He is no Prometheus suffering eternal torment for championing the cause of liberty by giving mankind fire or ability of science. With all his beauty, boldness, and quality of leadership Satan remains no more than an evil shrouded in darkness for his vile intention and wrong means to the end. In his introduction to *Prometheus Unbound* Shelly argues that in spite of many similarities in character and spirit the feature that strongly alienates Satan form Prometheus is act of Selfishness and obession for power. Behind all his effort to challenge a great authority was solely the intention to fulfill his own interest.

Moreover, Satan wanted to create a world parallel to God's which was otherwise dissociated from mainstream life. Even Milton's powerful and sympathetic characterization of Satan in BK. 1 of *Paradise Lost* cannot hide the fact that isolation from nature seems to be the permanent price one has to pay for his over-reaching ambition. Hence "A Dungeon horrible, on all sides round ....". Standing up against the conventional social political and economic principles of a society may be appreciated as the spirit of anti-establishment but an act of "tearing down the Establishment" alone without any proper agenda of human welfare does not help in bringing about real change necessary for setting up a new order or building up a better world. To be the sole creator of one's world seems like a glorious prospect until one realizes the hideous consequences of seeing one's self mirrored everywhere one turns.

Nationalism Revisited

Somak Biswas
Department of History, U.G. First Year

Wishing away history is a notoriously difficult task. It has the irritating habit of resurfacing now and then, often at inappropriate times. Far easier, however, would be to put on a myopic lens to have a selective view of it. History is more often shaped by such selective perceptions rather than holistic and unbiased facts. There is a certain attraction inherent in perceptual history as well as imaginative geography that often lead to a severe dereliction of its material dimensions. For a theme as complex as nationalism, the dilemma is dual — perceptual, as well as material.

Defining Nation

The idea of nation has been a remarkably ingenious invention. It has the persuasive power to engage the lay and learned alike; without being bothered about the necessity of its being. The idea of nation is an abstract one. Quite characteristically then, the ideology of nationalism has to be necessarily an abstract set of ideals. For a nation to be shaped, it is necessary to fill the political, social, and cultural space with real or imagined constructs, often culled from a selective appropriation of history. To sustain the idea of a nation, these constructs are crystallized to invent the powerful ideology of nationalism.

Tagore defines 'a nation, in the sens of the political and the economic union of a people, is that aspect which a whole population assumes when organized for a mechanical purpose.' Society, as Tagore emphatically observes, has no ulterior purpose. It is an end in itself. Nation is a mechanical machinery that welds colossal power and authority for the governance of a definite territory. For a country to become a nation, it must fulfill the criteria of having a definite territory a uniform culture, and a distinct degree of homogeneity. These are particularly the classical European parameters of nationhood. The composition of a western nation has generally been homogenous in cultural and religious terms, and the functions largely determined by the long history of state-church conflicts. A nation is primarily a political civilization and, as Tagore says, based upon exclusiveness. For a nation to consolidate itself in the minds of its people, it has to create durable imageries of its enemies. Nationalist mythmaking has often been assigned the task of manufacturing a national consensus based on erasing unnecessarily complex and conflicting diversities in favour of a monolithic and simulated unity. Nationalism is a powerful unifier in the sense that it helps to create a plethora of viable symbolisms to give credibility to the ambitious project of nation-making.

A nation implies the idea of an imagined community. It is necessary to bequeath it with an imagined history, whereby the tale churns out some fable of a glorious past, followed by a decadent present, and a resurgent manifestation of the past into a glorious future. An imagined history is critical for constructing an imagined identity. Nationalism is a useful tool to manufacture this imagined 'national' identity. The supposed solidarity thus achieved is a thin covering over various conflicting diversities. In a pluralist society, manifesting the idea of a singular nation is difficult to sustain because of the multiplicity inherent in its very nature. The existence of parallel nations tied solely to religious roots is neither exclusive nor rare. Indeed, such a phenomenon has been observed to occur globally. Identities, more specifically communal identities tend to knit themselves closely around religious divides. Intra-religious identities are also not atypical. The existence of multiple identities within a religion can be underscored by a simple example : within the Hindu religion, a Dalit may think of him/herself a separate entity, having a distinct socio-political identity. This tendency to equate whole communitarian identities in socio-plitical terms may further the urge for establishing parallel societies. The existence of parallel societies also give continuous

fillip to the idea of a parallel nation. Hence, when we speak of Indian nationalism, it would be intelligent to note that it does not refer to any singular force of nationalism operating throughout India. Instead, it is an aggregate of multiple sub-nationalisms (ethnic, religious, cultural and the like), existing simulataneously with a pan-Indian one.

Thus, within a multicultural and substantially diverse country as India, people may end up identifying themselves with their respective communal identities and sympathizing with their respective loyalties. That there could exist multiple nations coterminous with a nation is often missed by us. Admittedly, the co-existence of such notions bears the direct harbingers of separatist tendencies in the divisive manifestations of communalism and terrorism.

The Case of India

Perceptually speaking, India may be easy to identify as a nation. Materially, however, it is not. Tagore was perhaps correct when he commented that the word nation is literally non-translatable in Indian languages, however much we bequeath it with novel connotations. The duplicities inherent in the term may seem non-palatable, but that is more due to its obvious characteristics than its non-translatability.

In may ways, we imagine India. When we imagine India at a 'national' level, she appears to us as a nation. Nevertheless, perceptions, though deceptive, cannot be wished away. However, the solidarities necessary for the construction of the Indian nation are more superficial than real. For all its greatnesses combined, India is yet to become a nation. It hardly wants to notice the fact that India barely fulfills any of the requisite criteria that are necessary for the making of the national fabric. Part of the paradox may be answered by stating that India is a nation in its own right. However, it scarcely solves the much broader issue at large. For, in accepting this, India's capacious past will suffer substantial falsification, if not whole.

India's nationhood has been a matter of national debate since the early nineteenth century itself. As Sunil Khilnani remarks, it were the ideas of India that shaped the future India. The factuality of India as a nation was actively debated and discussed and this marked the definitive journey of India as a well-defined political entity. Be that as it may, India has been one of the classic examples of a multicultural civilization that fits better within the broader term country. A country is more of a geographical idea than a definitive political state. India as an idea is much more inclusive and broader than any narrow attempt to fit it in the hermetic confines of a Nation. India has been a cradle of diverse cultures existing under a common umbrella. The vast degrees of heterogeneity make any attempt to categorize it as a singular nation virtually self-defeating. However, the tradition of tolerance enabled a great magnitude of accommodation that helped in the peaceful co-existence of diverse social groups. To be sure, accommodation was not an exclusive phenomenon. But the fabled assimilative powers of India were more mythical than real. If there was accommodation, there has to be assimilation. But to push the case for assimilation too far is not always a wise idea. Accommodation occurred in the form of parallel accretion of cultural traits, which meant that subtle and gross distinctions did not disappear altogether. Had it indeed been a case of pure assimilation, we would not have found our legendary 'unity in diversity' stumbling now and then on real and imagined ruptures.

India has been a composite civilization. At the same time, India was not Greece, a one-time great civilization. A glance at the number of foreign invasions would have suggested that India, being highly vulnerable to assault should have dwindled to dust while the ancient and militarily powerful Greek civilization should have existed with full vigour. Contrarily, the Roman civilization had faded to oblivion while the Indian civilization still lives on, a billion strong. This inherent tenacity to absorb new elements in its cultural fabric has lent it a plasticity to its advantage. Again, society evolved in India in its own distinct way. The tremendous ability of India to accommodate differences has led to a profuse cultural exchange within the subcontinent, leaving us a rich legacy of cultural flowering. In contrast, the history of a nation (Britain and France are fine examples) is replete with alienation, and hence can hardly claim to be multicultural.

To evoke an ancient ideal as that of India's cynosure may seem simplistic; but *maitree* seems to be India's innate social affinity.

How the idea of India got a political expression in the world map as a nation has a long and vivid history, but that need not undermine India's greatness as a multicultural country.

The 19th century saw India wake up to the fierce clarion calls of nationalism. But the nationalist opinion it generated was fractured. There emerged a penchant to return to a pristine 'Hindu' past, adulterated by a decadent Muslim rule and further degraded by a tyrannous British presence. Such one-dimensional readings of history were no doubt perverted, but the fact that it gained wide coinage shows the pervading power of such perceptual histories. The real contestations of defining India's future, however, came to the fore at the time of independence. Nehru ultimately emerged victorious in this war of ideas and his implicit faith in modernity meant that India was to function within the framework of a nation-state imbibed with his innovative improvisations. Unlike Gandhi and Tagore, Nehru differed from his political and intellectual mentors in this regard, since both didn't look upon the state as a benign protector, rather they saw it as an unnecessary persecutor. But the real problem lay elsewhere. The passing of legislations didn't automatically weld India into a nation. The transition of India from a non-nation into a nation was not painless and serious incompatibilities kept cropping up. Sometimes, the costs seemed to outweigh the benefits secured, which then made it an entirely unviable process.

Nationalism vs. Patriotism

Ramachandra Guha, noted social scientist and academic, once observed that to consider a noble ideal vilified just because some narrow-minded fanatics have used it to serve their own selfish purpose is not only presumptuous, but also falsifying the truth. He was referring to the use of saffron colour — the colour of renunciation according to Indian monastic traditions — that had been put to serve some narrow end by the Hindutva outfits. Nothing better can serve the parallel drawn between the nationalism — patriotism paradox, a much discussed but often misunderstood concept.

The boons associated with nationalism may be obvious and undoubtedly, varied. Nevertheless, that need not turn into an excuse for wishing away its banes. With nationalism, comes the abstract idea of legitimate force. For its sustenance, huge military expenses are incurred at the cost of humanitarian needs. Poor countries like India and Pakistan spend about one-fourth and one-half of their revenues for the purpose of defense, all for the sake of nationalism. Why, if U.S. spends even one-thirteenth of their 500$ billion defense budget on poverty alleviation, it can be mitigated on a global scale. Being ignorant to the immediate needs of the society is not only irresponsible, but to advance the military machinery to encroach upon humane needs is simply outrageous. The materialist dimensions propagated by the capitalist nation are a result of the law of demand and supply, which has an insatiable appetite for more than is required. Competitiveness is good, but to allow it to exceed beyond its healthy limits leads to 'a large waste of labour and crippling of social consciousness'. Nationalism has the bad habit of imposing an orthodox ideology of blind and unquestioning allegiance to one's nation. In doing so, we often forget that no nation can exist in isolation; they thrive because others do. The predatory nature of nationalism is often missed deliberately, but the action it perpetrates under the self-justifying title of nationalism generally remains a violent one.

Patriotism is frequently thought to be synonymous with nationalism. However, that is a habitul misnomer. Nationalism is roughly similar to *rashtravad* while that of patriotism — *rashtrabhav* or *jatiyabhav*. *Rashtravad* is more of a political ideology, while *jatiyabhav* — that of a consciousness. The fundamental difference lie in the optimism that patriotism exhibits. True that both refer to the same fable of loving one's homeland, but the idea of country occupies a much broader expression in the case of patriotism. It is not built upon the selfish premise of 'ours and theirs' assumption. Love for one's own homeland is quite justified but a necessary hatred for certain others isn't. A patriot need not antagonize other countries for the sake of loving one's own. Seen in this light, Tagore or Vivekananda is no less a patriot than Gandhi or Nehru. Indeed, their love for their country could be observed at a much broader perspective. They observed their country as a manifestation of the same thread of humanity that runs through all beings, irrespective of national or religious barriers. The danger imminent in fragmenting humanity to suit one's platter could not have missed their musings, leading them to observe the utter futility of

such distinctions. They were patriots without being nationalist. Their *watan* was not confined by any specific territory, but its idea extended far and wide. Unlike in nation, an ascribed national identity need not come before reason. In fact, reason rationalised it.

A Synthetic Approach

The mechanism of defense is necessary to sustain the idea of Nation. Confrontation between two nations may be [illegible] an act of nationalism or demonized as a terrorist act by each other. To wit the truth, however, they represent the opposite sides of the same coin. Nevertheless, divorcing it from the idea of nationalism will prove helpful in having a fresh look at the problem since seeing such acts through the spectacles of nation runs the imminent danger of clouding out its other aspects, particularly the human concerns involved. The idea of nationalism may be abstract. The untold suffering caused due to it is, however, not. The affliction reflects the reality, while nationalism, the illusion. That an act of violence is primarily an act of violence in any setting should be recognized first, rather than relishing the victory or suffering the defeat. Acts of profuse violence show, often ironically, that the blood of the martyr is deemed more sacred than the ink of the scholar. War memorials bear fine testimony to this gruesome fact.

Whatever our approach is, a violent act remains thus, whether it is termed nationalism or terrorism. This strange paradox arises out of a fundamental flaw in our approach of considering it. How we perceive a problem may yield altogether different results. A humanitarian approach may not be so novel, but it is neither outdated. Emphasis on a 'solitarist' interpretation of civilization can be harmful as it tends to break up mankind into discrete fragments rather than observing it as a conceived whole. Promotion of narrow-minded communal dividends in the name of nationalism has done incalculable harm to the society, eroding the very foundations of humanity. As such, three issues need to be addressed. Firstly, there has to be a common identity. Secondly, a common cause should be envisaged that should be well-defined in its characteristics. Thirdly, common ends to which this means should be directed in the long run.

Epilogue

The force of the nation lay in its successful and legitimate use of force, which has an objective to conquer. As Einstein reiterated, 'the arms industry was indeed one of the greatest dangers that beset mankind which with its evil power of nationalism was trying to plunge the whole world into a war'. Einstein was right. Seventy years hence, we can ask the same question to ourselves. And the answer is quite obvious. The threat hasn't receded; indeed, it has increased manifold. The ideology of nationalism is a parasitic concept that constantly feeds upon imagined constructs. The forging of an exclusivist national identity impedes the very possibility of creating a global consciousness based upon global identities. However, this is not a blind prescription for mindless internationalism, as that would replace a bad system with an equivalent one. A society can function within a broad framework of 'anarcho-communitarianism'. Our being a human must not be choked by our being an Indian, a Hindu, or a Muslim. If a religion fails to identify humans as humans first and foremost, it is hardly worth a penny. Humanity, as Tagore pointed out, is the last sacred shelter of mankind. In the poetic words of Tagore, 'when the morning comes for cleansing the blood-stained steps of the nation along the highroad of humanity, we shall be called upon to bring our own vessel of sacred water — the water of worship — to sweeten the history of man into purity, and with its sprinkling make the trampled dust of centuries blessed with fruitfulness.'

Nationalism will perhaps die a natural death after the gradual realization of its futility. However, the lesson learnt will not go in vain. Faith, faith and faith on humanity alone will determine the future course for mankind.

References.
1. Nationalism — Rabindranath Tagore
2. The idea of India — Sunil Khilnani
3. The discovery of India — Jawaharlal Nehru
4. Identity and violence — Amartya Sen.
5. Beyond nationalist frames — Sumit Sarkar

Raniganj Coal-fields — A Reality Check

Udita Mukherjee
Department of Geology, U.G. Final Year

In this era of jetsetting lifestyles and huge industries, India, with 2.7% of the world's coal reserves ranks sixth in the world when it comes to coal resources, which is one of the basic requirements of industrialization. Raniganj, one of the major coal-fields of India, is thus a place to reckon with in the world. Bearing a huge supply of lower gondwana coals inside its rocky cover, this coal-field extends over an area of at least 1500 sq.km.

Starting from the colonial times human endeavours have unearthed the black diamonds hidden inside the black earth of these regions for economic benefits, sometimes by private enterprises and at other times, by government initiatives.

But years of unplanned mining is now taking its toll on the region. Filling up of the vacant mines with sand after unearthing the coal is essential to resist the accompanying environmental and social hazards. However, surprisingly, year after year, the coal has been mined out of this region, but the craving for some excess profit had stopped the entrepreneurs from properly filling up the vacant space with sand. At places, they have built some pillars, but of course, these do not provide the sufficient amount of support required to overcome the superincumbent pressure acting on the void created, thus leaving ample chances of caving in of the upper layer of earth. In and around Raniganj, tremors are a reality that people often face. There are a number of folk-songs of this region that testify to this fact.

Of course, a tremor of sufficient intensity can lead to a disaster and if a landslide occurs, then, well, everyone can very well imagine the effects. The fractures that cut through the roads and settlements of this region are glaring testimonials of the facts. Even the esteemed G.T. Road bears the brunt of this problem and if the railways are affected, then almost a major part of the eastern India will be cut off from north India.

More importantly, a landslide not only dismantles the settlements but also the social and moral set-up of the individuals. Even if properly rehabilitated, the sense of rootlessness, accompanying such incidents, is enough to mar the mental strength of any normal human being. Moreover, the forefathers of the present miners, forming the bulk of the population, were transported from the Santhal Parganas to the coal fields and the sense of rootlessness and the pain of losing home are their heirloom, their 'inheritance of loss'. So we can only imagine but never feel the effect of this social catastrophe for them.

Due to the accumulation of methane gas in the vacancy, coal-fires are a day-to-day affair in this part of the world. The remnant coal gets combusted in this fire, thus leading to the collapsing of the upper strata. Moreover, carbon dioxide evolved due to combustion of coal and methane further adds to the environmental problem.

The minuscule coal particles also pose threats to the environment. Statistics show us that people of this region are more prone to tuberculosis which is due to the high level of air pollution.

Another major problem is due to the water-logging in the void present. The water, coming in contact with the toxicities present, becomes unfit for use. But still, due to lack of awareness and amenities, it is used leading to numerous health hazards and related complications.

The water stored may break the adjoining walls and can flood the entire mining region, thus repeating the horrible tragedy of chashnala. — "চাষনালার খনিতে মরদ আমার ডুইব্যা গেল রে"

But do we want that to happen?

It is high-time the concerned authorities take note of the situation and make the required amends so that the life and property of many innocent people are saved. Can't we expect even that from you, respected "to whom it may concern"?

সার্ধশতবর্ষের আলোকে 'অব্যক্তে'র লেখক

সৃজিতা ঘোষ
স্নাতক প্রথম বর্ষ, অর্থনীতি বিভাগ

বাঙালির জনমানসে সবচেয়ে জনপ্রিয় বিজ্ঞানী নিঃসন্দেহে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু। ছেলেবেলায় বিজ্ঞান শিক্ষা আরম্ভ করেই জগদীশ বসুর নামের সঙ্গে সকলে পরিচিত হন। ফলে তাঁর বিভিন্ন পর্বের বৈজ্ঞানিক কাজ-কর্মের সঙ্গে সম্যক্ ধারণা না থাকলেও শিশু হৃদয়ে প্রথম বাঙালি বিজ্ঞানী হিসেবে জগদীশচন্দ্র নিজের আসন করে নেন। তাই আজ মহান এই বিজ্ঞানীর জন্মের সাধশতবর্ষ উদ্‌যাপনের সময়ে তাঁর সম্বন্ধে নতুন করে ভূমিকা রচনা করার প্রয়োজন পড়ে না। বিদেশের মাটিতে ভারতীয় বিজ্ঞানী হিসেবে নিজের স্বীকৃতি করে নেওয়া এবং ১৮৯৫-এ কলকাতার টাউন হলে বেতার তরঙ্গ নিয়ে দুটি বিখ্যাত প্রদর্শনীর মাধ্যমে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র যেন "জাতীয়তাবাদী নায়ক" হিসেবে খ্যাত হন। তাঁকে যেন মনে করা হয় 'পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে প্রাচ্যের চ্যালেঞ্জ', পরবর্তীকালে গবেষণায় যেন তিনি ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের পুনর্জন্ম ঘটিয়েছিলেন পাশ্চাত্যের নাস্তিক বিজ্ঞানীমণ্ডলে — এমন নানা আলোচনা, সমালোচনা করা হয়েছে জগদীশচন্দ্রকে নিয়ে। এই নিয়ে যদিও বহু বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে জগদীশচন্দ্র নিঃসন্দেহে এমন এক বিজ্ঞানী, যিনি একাধারে ছিলেন অসামান্য প্রতিভাধর বিজ্ঞান সাধক, অন্যদিকে ভারতে আধুনিক বিজ্ঞানের মৌলিক চর্চার পথ প্রদর্শক।

কেমব্রিজ থেকে প্রাকৃত বিজ্ঞানে ট্রাইপস ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস. সি ডিগ্রি নিয়ে ১৮৮৪ সালে দেশে ফেরেন, জগদীশ। তারপর, ১৮৮৪-তে প্রেসিডেন্সি কলেজ-অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পরবর্তী বছরগুলিতে ঘটে যায় তার যুগান্তকারী আবিস্কারগুলি। তার কর্মজীবনকে প্রায় দুটি ভাগে বিভক্ত করা চলে। প্রথম পর্বে বিদ্যুৎচুম্বকীয় তরঙ্গ সম্পর্কে ও দ্বিতীয় ভাগে উদ্ভিদের উত্তেজনায় প্রতিক্রিয়া নিয়ে তিনি গবেষণা করেন। গণিতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য না থাকলেও এই অসামান্য পদার্থবিদের ছিল এক "Uncommon Common Sense", যার সাহায্যে বিবিধ যন্ত্রপাতি নির্মাণে তিনি অত্যন্ত কুশলী ছিলেন। সারা পৃথিবী জুড়ে যখন হার্ৎজ আবিষ্কৃত বিদ্যুৎ তরঙ্গ নিয়ে কাজ চলছে, জগদীশচন্দ্র তখন তার আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে তৎকালের হ্রস্বতম (2.5mm – 5mm) বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সৃষ্টি করেন। তরঙ্গ উৎপাদক, তরঙ্গ প্রেরক বা তরঙ্গ গ্রাহক যে যন্ত্রগুলি তিনি আবিষ্কার করেন তা তাঁর অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর। এই তরঙ্গগুলির সাহায্যে বিবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি দেখান আলো প্রকৃতপক্ষে একপ্রকার তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ, যা প্রতিফলন প্রতিসরণের মতো বিবিধ ধর্মগুলি পালন করে। ১৮৯৫ সালের মে মাস থেকে আরম্ভ করে ১৮৯৮ সালে পর্যন্ত মোট ১৩টি গবেষণা প্রবন্ধ তিনি এ বিষয়ে প্রকাশ করেন। পরবর্তী অধ্যায়ে ১৯০৬ সালের পরে উদ্ভিদ শারীরবিদ্যা (Plant Physiology) নিয়ে গবেষণাগুলির সময়ে পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে তার ধারণাগুলি কাজে লাগে। নিজ আবিষ্কৃত বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষায় তিনি দেখান যে প্রাণীর মতো উদ্ভিদও বাইরে উত্তেজনায় সাড়া দেয়, বাইরের উত্তেজনা অপসারিত হলে কিছু সময় পরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। মৃত্যুর পূর্বে এই প্রতিক্রিয়া অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। এই আবিষ্কার তার বিজ্ঞানী মনে প্রশ্ন তোলে যে "তবে কি জড়পদার্থও বিশেষ অবস্থায় বাইরের উত্তেজনায় সাড়া দেয়?" জড় ও জীবের সম্পর্কে তার এইসব প্রশ্নগুলি বর্তমানে পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের কাছেও বহু আলোচিত হয়েছে।

জগদীশচন্দ্র-জীবনের বিপুল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে প্রেসিডেন্সি কলেজ জড়িত। ১৮৮৪ তে লর্ড রিপনের চিঠি নিয়ে এসেও তাকে ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের পরিবর্তে প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসে যোগ দিতে হয়, যাতে ইউরোপীয়দের বেতনের দুই-তৃতীয়াংশ দেওয়া হয়। আবার অস্থায়ী পদে নিযুক্ত হওয়ায় জগদীশচন্দ্র তাঁর প্রাপ্যের অর্ধেক অর্থাৎ ইউরোপীয়দের এক-তৃতীয়াংশ বেতন পেতেন। তীব্র আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন জগদীশচন্দ্র তিন বছর বিনা মাইনেতে চাকরি করেন। পরে ইউরোপীয় কর্তৃপক্ষ তার চাকরি পাশ করে, তিন বছরের তাঁর প্রকৃত মাইনের সবটিই ফেরত দেন। এরপর সারা বিশ্ব জুড়ে তার কাজের স্বীকৃতি এলে 'দি ইলেক্ট্রিসিয়ানে' তার নিবন্ধ বেরলে, রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটিতে বা লণ্ডন রয়াল ইনস্টিটিউশনে তার বক্তৃতা সকলকে মুগ্ধ করলে, কলেজ কর্তৃপক্ষ তার কাজের স্বীকৃতি দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বৈদ্যুতিক তরঙ্গ নিয়ে বিবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় "প্রেসিডেন্সি কলেজের সম্মুখে যেতে ইষ্টক-নির্মিত গোল স্তম্ভ আছে তাহা দিয়া অদৃশ্য আলো দূরে প্রেরণ" করে প্রমাণ করেন এই বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ও আলো "একই নিয়মের অধীন"। পরবর্তীকালে তারই প্রচেষ্টায় ১৯১৩-এর ২০শে জানুয়ারি সরকারি অনুদানে এডোয়ার্ড নরমান বেকার-এর নামে প্রেসিডেন্সি কলেজ "বেকার ল্যাবরেটরিজ" প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান শিক্ষায় ব্যবহারিক পরীক্ষার গুরুত্ব জগদীশচন্দ্র

খুবই ভালোভাবে উপলব্ধি করেন। নিজের কর্মজীবনে এই সংক্রান্ত বহু বাধার সম্মুখীন হওয়ায় ১৯১৭ তে তাঁর জন্মদিন ৩০ শে নভেম্বর— তিনি 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। পরাধীন ভারতবর্ষে মৌলিক বিজ্ঞানচর্চার বিকাশে তার এই কীর্তি নিঃসন্দেহে এক বড় অবদান।

বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের মতোই সাহিত্যিক জগদীশচন্দ্রও এক বিরল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। সুহৃদ রবীন্দ্রনাথও তাঁর রচনাপ্রতিভার স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইংরাজি ভাষায় রচিত বৈজ্ঞানিক নিবন্ধগুলিতে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র জাতীয়তাবাদের নায়ক। এমনকী মার্কনি সাহেবের সঙ্গে বেতার তরঙ্গ সম্পর্কিত বিতর্কটি সৃষ্টিতেও এই চিন্তার প্রভাব পড়ে। জগদীশচন্দ্র নিজে মার্কনির কাজের স্বীকৃতি দিলেও ভারতবাসীর কাছে মার্কনি 'ভিলেন' রূপে পরিগণিত হন। যেখানে জগদীশ 'ট্রাজেডির নায়ক' হয়ে জনমানসে স্থান পান।

জগদীশচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনার পিছনে তাঁর রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ বা নিবেদিতার সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ছাত্রবস্থায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যে সখ্যতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা সারাজীবন তাঁকে প্রভাবিত করেছে। নিজস্ব আবিষ্কারের মধ্যে তাই উপনিষদের ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া, নিজেকে প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানীদের উত্তরসূরী হিসাবে গণ্য করার পশ্চাতে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার প্রভাব লক্ষণীয়, সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় উৎসাহ জগদীশকে প্রেরণা যোগায়। অপরদিকে ১৮৯৮ সালে নিবেদিতা ও ১৯০০ সালে বিবেকানন্দের সঙ্গে পরিচয় জগদীশচন্দ্রের জীবনে এক পরিবর্তনের সূচনা ঘটায়। কুসংস্কারমুক্ত 'ব্রাহ্ম' জগদীশচন্দ্রের আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনায় তার প্রভাব পড়ে। বিবেকানন্দ তাঁর মধ্যেকার অনন্য প্রতিভায় বিস্মিত হয়ে তাঁকে 'জাতীয়তাবাদের হাতিয়ার' হিসাবে ব্যবহারের প্রচেষ্টা করেন। নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর সখ্যস্থাপন, নিবেদিতা কর্তৃক তাঁর বৈজ্ঞানিক নিবন্ধের অনুবাদের মধ্যে দিয়ে বিবেকানন্দ-নিবেদিতার আধ্যাত্মিক ভাবনাচিন্তা বা অদ্বৈতবাদের ধারণা তাঁকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করে। এই প্রভাবের প্রকাশ দেখা যায় পদার্থবিদ্যার পীঠস্থান রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে দেওয়া বক্তৃতার শেষাংশে। যেখানে তিনি নিজেকে প্রাচীন ঋষিদের উত্তরসূরী হিসাবে বর্ণনা করেন, যারা জগতের চিরন্তন সত্য সেই 'একের' সাধনায় মগ্ন ছিলেন। যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র এখানে যেন বিজ্ঞান অপেক্ষাও দর্শনকে অধিক প্রাধান্য দেন। যে বিজ্ঞানী নিজেই পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ ছাড়া কোনো সিদ্ধান্তে আসার বিরুদ্ধে ছিলেন, যিনি মনে করতেন বৈজ্ঞনিককে সর্বদা কঠিন আত্মসম্বরণের পথে চলতে হয় অন্যথা গবেষণালব্ধ সত্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় সেই জগদীশচন্দ্র কোনো প্রমাণ ব্যতিরেকে এই দার্শনিক মন্তব্য করেন যা নিঃসন্দেহে সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়।

পরিশেষে একথা সত্য যে, জগদীশচন্দ্রের উপর তৎকালীন বিভিন্ন ঘটনাবলী বা ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। তাঁকে 'জাতীয়তাবাদের হাতিয়ার' হিসাবে প্রতিফলিত করার এক ঐকান্তিক প্রয়াস চলে। তার কর্মজীবন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিবিধ বিবরণ বা কাজকর্মের মূল্যায়ণ করে কোনো উল্লেখযোগ্য রচনা তাঁর সমসাময়িক লেখক বা জীবনীকার কেউই করেননি। বরং বিজ্ঞানীর পরিবর্তে 'আচার্য্য' এর স্থান দিয়ে, তার বিষয়ক সমস্ত রচনাগুলিতেই এই শ্রদ্ধার অর্ঘ্য প্রদানের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। ইংরেজি ভাষাতে তো বটেই, এমনকি বাংলাভাষাতেও জগদীশচন্দ্রের যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। বৈজ্ঞানিকেরও যে সাহিত্যের প্রয়োজন আছে তা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন তিনি। তিনি জানতেন প্রকৃতির রহস্য-নিকেতনের বিভিন্ন মহলের বিভিন্ন দ্বার দিয়ে প্রবেশ করলেও প্রকৃত বিজ্ঞানবিদ, রাসায়নিক বা জীবতত্ত্ববিদ সকলেই একই সত্যের আবিষ্কারের চেষ্টা করছে। জ্ঞানের বিবিধ শাখাতে চিরদিন বিভক্ত হয়ে ভিন্ন পথে গমন করলে সত্যের পূর্ণমূর্তি প্রত্যক্ষ করা যায় না, কেবল সাধনাই চলতে থাকে, সিদ্ধির দর্শন পাওয়া যায় না। কিন্তু কবি ও বিজ্ঞানবিৎ উভয়ের সাধনার পথ যে পৃথক বৈজ্ঞানিককে যে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের কঠোর বন্ধুর পথে সর্বদা আত্মসম্বরণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় এই অভিমতও ছিল তাঁর। জগদীশচন্দ্র সর্বপ্রথম বাংলায় 'পপুলার সায়েন্স' জাতীয় কিছু রচনা করেন যা তাঁর 'অব্যক্ত' গ্রন্থে সংকলিত রয়েছে। কুন্তলীন পুরস্কার প্রাপ্ত 'পলাতক তুফান' গল্পটিতে, যা সম্ভবতঃ বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম কল্পবিজ্ঞান বা রহস্যবিজ্ঞান, অপূর্ব 'ননসেন্স' ব্যবহার দেখা যায়। একজন বিজ্ঞানীর কলম থেকে এরকম রচনা প্রকৃতই অবাক করার মতো। তবে ইংরেজি রচনায় তার যে সুসংহত রচনাশৈলীর পরিচয় মেলে বাংলা রচনার ক্ষেত্রে তা অনেকাংশে দুর্বল এই নিয়ে বিবিধ সমালোচনা থাকলেও সাহিত্যক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্রের প্রতিভা অনস্বীকার্য।

জগদীশচন্দ্রের বিশাল কর্মযজ্ঞের অন্তরালে অবশ্যই ছিল তাঁর জাতীয়তাবাদী মনোভাব। তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা কেবলমাত্র ব্যবহৃত হত কিছু শিক্ষিত ভারতীয়-কেরাণী নির্মাণকার্যে। আধুনিক বিজ্ঞানের মননশীল চর্চার প্রচেষ্টা তাই সহজসাধ্য কাজ ছিল না। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করার সময়ে তিনি উপলব্ধি করেন কলেজ কর্তৃপক্ষ গবেষণার থেকেও অধ্যয়ন বা অধ্যাপনার কাজে অধিক আগ্রহী। এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে নিজের সীমিত ক্ষমতায় কাজ করার সময়ে জগদীশচন্দ্রের মনে জাতীয়তাবাদের এই ধারণা আরও প্রকট হয়। তবে একথা সত্য যে, তিনি নিজে ছাড়াও সে যুগের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁকে এক 'জাতীয়তাবাদী নায়ক' হিসাবে মানুষের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস করেন। জগদীশচন্দ্র যে তাঁদের এই প্রচেষ্টায় যথেষ্ট প্রভাবিত হন সেকথা বলাই বাহুল্য। ভারতীয়দের কাছে তিনি যেন এক 'পাশ্চাত্যের প্রতি প্রাচ্যের চ্যালেঞ্জ'। তিনি যেন এমন এক বিজ্ঞানী যিনি তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের সম আসন লাভ করেছেন। তাঁর কর্মজীবনের প্রেরণার পিছনে এই ধারণার অনেক প্রভাব আছে। এই জাতীয়তাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে তিনি আধুনিক ভারতের বিজ্ঞানচর্চার অন্যতম কেন্দ্র গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাই সাধারণ মানুষের চোখে তিনি বিজ্ঞানীর থেকেও

রেশি। চাউন হলে তাঁর দুটি বিখ্যাত প্রদর্শনীর বিবরণের ক্ষেত্রেও বস্তুনিষ্ঠার পরিবর্তে ভাবোচ্ছ্বাসের আধিক্য দেখা যায়। জগদীশচন্দ্র ধীরে ধীরে তাঁর প্রতি মানুষের এই ধারণায় প্রভাবিত হন; যার ফলে বৈজ্ঞানিকের থেকেও দার্শনিক চিন্তাভাবনায় বেশী মনোনিবেশ করেন এবং নিজ উল্লিখিত সেই আত্ম সম্বরণের পথ থেকেও কিছু অংশ বিচলিত হন।

তা সত্ত্বেও জগদীশচন্দ্র ভারতবর্ষের মহান বিজ্ঞান সাধকদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর সমগ্র কর্মজীবনের বিভিন্ন আবিষ্কার ও 'বসু বিজ্ঞান মন্দিরের' প্রতিষ্ঠা ভারতে আধুনিক বিজ্ঞানে এক অনস্বীকার্য দান। ভারতবর্ষকে বিদেশের মাটিতেও সম্মান জনক স্থান দিতে সক্ষম হয়েছিলেন এই মহান বিজ্ঞানী। কিন্তু সার্ধশতবর্ষের আলোকে এই মহান বিজ্ঞান সাধকের কর্মজীবন আলোচনার সময় একটা প্রশ্ন বারবার আঘাত করে চলে, তার যুগান্তকারী কাজকর্মের এতগুলো বছর পরে, যথেষ্ট অনুকূল পরিবেশেও বর্তমানে কেন ভারতে মৌলিক বিজ্ঞান গবেষণায় এত অভাব লক্ষণীয়। তাহলে কি একথাই সত্য যে বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিই এই মৌলিক বিজ্ঞানচর্চার প্রতি অনীহার কারণ, নাকি অভাব রয়েছে সেই বিশেষ 'driving force' এর -- জগদীশচন্দ্র বা তৎকালীন বিজ্ঞানসাধকের ক্ষেত্রে যে force-টি ছিল আসলে ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের সম্মুখে শ্রেষ্ঠতা প্রমাণের প্রয়াস।

তথ্যসূত্র ঃ

১. অব্যক্ত; জগদীশচন্দ্র বসু।

২. অনুষ্টুপ, জগদীশচন্দ্র বসু সংখ্যা।

৩০ নভেম্বর, ১৮৫৮ -- ২৩ নভেম্বর, ১৯৩৭

কবিতার গাছ

সৈকত মিস্ত্রী
স্নাতক, প্রথম বর্ষ, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

"বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর: অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে ব'সে আছে
ভোরের দয়েলপাখি—"

আচ্ছা বাংলার* মুখ বলতে আমরা কী বুঝি? এই প্রশ্নের সঠিক এবং একক উত্তর খুঁজে পাওয়া বা এ সম্পর্কে কোন প্রশ্নাতীত একক সংজ্ঞায় উপনীত হওয়া সত্যিই বেশ কঠিন। কারণ আমরা বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ সেই প্রান্তগুলির সৌন্দর্য দিয়েই মনে মনে একটা অবয়ব গড়ে তুলি, তাকেই আমরা বলি বাংলার মুখ। আর এই বাংলার মুখ অবশ্যই বাংলার গ্রামের মুখ, বাংলার কতিপয় শহরের মুখ নয়।

তবে বাংলার মুখ বলতে আমাদের সবার মনেই একটা নদীমাতৃক বাংলার ছবি ফুটে ওঠে যেখানে একটি আঁকাবাঁকা নদী থাকে, দুই তীরে গাছপালা থাকে, নদীতে পালতোলা নৌকা ভেসে যায়। কল্পনার পাল আরও একটু তুলে দিয়ে সেই ছবিতে আমরা নৌকায় বসে হালের মাঝিকে ভাটিয়ালি গানও গাইতে শুনি ও দেখি।

যে নদীর ছবি আমরা কল্পনা করি সেই নদীগুলি রাইন বা টেমসের মত হয়ত বহু কাব্য, নাটক বা গল্প-উপন্যাসের মধ্য দিয়ে খুব একটা বয়ে যায়নি, তবু আমরা তাদেরকে সযত্নে আগলে রাখি, ঘিরে রাখি আমাদের ছেলেবেলার, আমাদের শোনা পূর্ব প্রজন্মের ছোটবেলার সুখ দুঃখের স্মৃতি দিয়ে। সেই নদীগুলি ভূগোলের ম্যাপে খুব বেশি আঁচড় কাটতে পারে না, খুব ডিটেলস্ ম্যাপে হয়তো নীল রেখা হিসেবে থাকে, নাম হিসেবে জলঙ্গী, গাঙুড়, ইছামতী, চূর্ণী প্রভৃতিকে আমরা দেখতে পাই। এই নদীগুলির, বিশেষত মিষ্টি জলের নদীগুলির দুই পার প্রচুর গাছপালার জন্ম ও আশ্রয়স্থল। এই গাছ, আর নদী — এদের সম্পর্ক বড় নিবিড়।

নদীর পলিতে পুষ্ট গাছগুলির জন্যেই বৃষ্টি আসে, নদীর ধারা, নাব্যতা বজায় থাকে। তাই এই গাছগুলিকে বাদ দিয়ে নদীকে কল্পনা করা খুবই কষ্টসাধ্য। আর বাংলার মুখ বলতে প্রথমেই নদীমাতৃক বাংলার বিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তরের কথাই আমাদের মনে আসে।

সাহিত্যিকদের লেখার একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে এই গাছপালা, কখনো প্রধানচরিত্র, কখনো পার্শ্বচরিত্র হিসেবে। দন্ডকারণ্য-পঞ্চবটী বনের পথ বেয়ে কদম কানন — তারও বহুকাল পরে রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশ — আর কে নয়? সবার সৃষ্টিতেই উঠে এসেছে উদ্ভিদের অসংখ্য বর্ণনা। অ্যাকোয়া রিজিয়ার মতো কোনো তেজি রাসায়নিক ঢেলে যদি উদ্ভিদকে সাহিত্য থেকে গলিয়ে বার করে নেওয়া যেত, তবে দেখা যেত সাহিত্যে খুব কম উপাদানই পড়ে আছে। যা পড়ে থাকত, তা কল্পনা করে রূপ দেওয়া হলে নির্ঘাত দৃশ্যদূষণ ঘটাত।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে 'বাঁশি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন চাকরিসূত্রে শহরবাসী এক যুবকের কথা, শহরবাস যার মনের কাছে এক বদ্ধ জীবনযাপনের দুর্বিষহ অগ্রগতি। কবিতার শেষে দেখা যায় যুবকটি তার মনের আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে, যেখানে — "অনন্ত গোধূলিলগ্নে
সেইখানে
বহি চলে ধলেশ্বরী,
তীরে তমালের ঘন ছায়া —"

ডাউন মেমারী লেন বেয়ে চলে গেলে যাঁরা এখন মধ্যচল্লিশ বা পঞ্চাশের আশে পাশে, তাঁদের নিশ্চয়ই মনে পড়বে ক্লাস ফোরের কিশলয় বইয়ের কথা — সেখানে 'শকুন্তলা'

* বাংলা বলতে এখানে পূর্ব বাংলা, বর্তমান বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গকে বোঝানো হয়েছে।

নামের পঠ্যাংশে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন — "এক নিবিড় অরণ্য ছিল। তাতে ছিল বড়ো বট, সারি সারি তাল তমাল, পাহাড় পর্বত, আর ছিল ছোটো নদী মালিনী।" আর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় — উদ্ভিদ জগৎকে বাদ দিলে যাঁর সাহিত্য পাঠযোগ্য থাকবে না — তিনি তো এ বিষয়ে অগ্রস্মরণ্য একটি নাম। তাঁর 'পথের পাঁচালী', 'আরণ্যক', 'ইছামতী', প্রভৃতি উপন্যাসে গাছেদেরই রাজত্বে মানুষ বাস করে।

লক্ষ্য করলেই আমরা দেখতে পাবো এতক্ষণ যে সব সাহিত্য নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম, সেগুলি সহ রূপকথাগুলিতে এবং মহাকাব্যগুলিতেও কয়েকটি উদ্ভিদের নাম বারবার ঘুরে ফিরে আসে। পঞ্চবটী বনের নাম শুনলেই আমাদের মনে পড়ে রামায়ণের কথা, তেমনই শমী গাছের নাম শুনলেই মনে পড়ে মহাভারতের বিরাট পর্বের কাহিনি; আবার জলপাই গাছের নাম শুনলেই মনে পড়ে ইলিয়ড ওডিসির কাহিনি, আর কদম এবং তুলসী তো বৈষ্ণব সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

বাংলা সাহিত্যে যত সাহিত্যিক আছেন, জীবনানন্দ দাশ তাঁদের মধ্যে এক উজ্জ্বল নাম। তাঁর বিভিন্ন লেখাতে মুথাঘাস থেকে বৃহৎ বটগাছ পর্যন্ত উদ্ভিদ জগতের সুবিশাল বিস্তৃতি লক্ষ করা যায়। তাঁর রূপসী বাংলার অলঙ্কার হয়ে ওঠে গ্রাম বাংলার সাধারণ উদ্ভিদকুল। আর সেই উদ্ভিদকুলের প্রতিনিধিত্ব করেই থাকে ভাঁটফুল কিংবা শটিবন, কিংবা হিজল গাছ। এইসব ময়োভরা নামগুলি সিলেবাসের চাপে আমরা অনেকেই মুখস্থ করি বটে, কিন্তু পরবর্তী শ্রেণীর আরো বড় সিলেবাসের চাপে আমরা নামগুলো ভুলেও যাই, আর তাছাড়া নামগুলি মনে রাখারও তেমন প্রয়োজন পড়ে না। তবু পৃথিবীর পথে চলতে চলতে পথের পাশে কখনো কখনো এসে পড়ে সেইসব উদ্ভিদদের কেউ কেউ, তখন মনে হয়, এদের সম্বন্ধে একটু জানতে পারলে ভালোই হতো। কোথায় এদের আসল বাড়ি, কোন পরিবারের লোক, কিংবা কী কাজই বা করে? তাই চলুন না, নদীকে পাশে নিয়ে আজ ঢুকে পড়ি 'রূপসী বাংলা'র অন্দরমহলে, বেছে নিই একটি ঘর, যার নাম 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি', আর দেখি ওখানে উপস্থিত বারোটি উদ্ভিদের উদ্ভিদজাগতিক ঠিকানা আর বংশ পরিচয়।

ডুমুর : 'রূপসী বাংলার' যে ঘরে — অর্থাৎ কবিতাতে আমরা ঢুকেছি, সেখানে প্রথমেই আমাদের সঙ্গে আধো অন্ধকারে দেখা হয় এক দোয়েল পাখির, যে একটি ডুমুর গাছের ছাতার মতন বড় পাতাটির নীচে বসে আছে। এই ডুমুর গাছ হলো বট পরিবারের এক বিশিষ্ট সদস্য, যার বিজ্ঞানসম্মত নাম *Ficus hispida L.* গোত্র Moraceae.

প্রজাতিসূচক hispida শব্দটির অর্থ 'রোমযুক্ত'। গাছটি বাংলা, মধ্য মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, চীন ও অস্ট্রেলিয়ার আদি বাসিন্দা। আমাদের দেশে বিভিন্ন জঙ্গলে বা বাড়ির আনাচে কানাচে এই গাছ দেখা যায়। ছোট বৃক্ষ বা বড় গুল্ম জাতীয় গাছ। বাকল ধূসর। পাতা আকারে বড়, শক্ত রোমযুক্ত। সাধারণত অভিমুখ পত্রবিন্যাসে সাজানো। পাতার নিম্নপৃষ্ঠের শিরাগুলি বেশ স্পষ্ট এবং পত্রকিনারা খাঁজকাটা। জালিকাকার শিরাবিন্যাস প্রমাণ করে গাছটি দ্বিবীজপত্রী।

ফল Ficus গণভুক্ত অন্য প্রজাতির তুলনায় বড় এবং এরা গুচ্ছবদ্ধ অবস্থায় শাখায় ঝুলতে থাকে। মার্চ থেকে জুলাই পর্যন্ত গাছে প্রচুর ফল হয়। তবে ফল বলতে যেটিকে বোঝানো হয় তা প্রকৃতপক্ষে তিনটি পরস্পর সংলগ্ন সাইমোজ পুষ্পবিন্যাসের তিনটি পুষ্পদন্ড বা পেডাঙ্কল, যারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্ফীত, প্রসারিত এবং গোলাকার পুষ্পাধারের (Receptacle) সৃষ্টি করে। পুষ্পাধারটি ফাঁপা এবং এর শীর্ষে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে। বিশেষ এক ধরনের ক্ষুদ্র পতঙ্গ পুষ্পাধার শীর্ষের এই সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে ভিতরে ঢোকে এবং সেখানে অসংখ্য ফুলকে নিষিক্ত করে। ডুমুরের এই বিশেষ পুষ্পবিন্যাসকে বলা হয় উদুম্বর পুষ্পবিন্যাস বা hypanthodium.

কচি ডুমুর সব্জি হিসেবে খাওয়া হয়। এটি একটি লৌহসমৃদ্ধ খাদ্যোপাদান। গাছের বাকল থেকে মোটা তন্তু পাওয়া যায়। এর কাঠ হাল্কা, অর্থনৈতিক গুরুত্বহীন। ডুমুরের ভেষজগুণ বর্তমান। ফল-বীজ ও গাছের বাকল বমনকারক। ফল চূর্ণ জলের সঙ্গে সিদ্ধ করে পুলিশটি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

বাইবেলের জেনেসিস অধ্যায় (Genesis 3 : 7) জানা যায় আদম আর ঈভ জ্ঞান বৃক্ষের নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার পরে প্রথম যে পাতা দিয়ে নিজেদের আবৃত করে, সেগুলি ছিল ডুমুর পাতা। বহুদিন পর্যন্ত ন্যুড ছবি বা ভাস্কর্যগুলির জননাঙ্গের অংশটি আবৃত করার জন্যে ডুমুর পাতা বা ডুমুর পাতার ছবি ব্যবহৃত হয়েছে বিভিন্ন দেশে।

বাইবেলে কোটেশন আছে 'প্রত্যেক মানুষ তার নিজের ডুমুর গাছ ও আঙুর লতার নিচে থাকে।' — কোটেশনটি ব্যবহৃত হতো শান্তি ও সমৃদ্ধি বোঝাতে।

কোরাণে একটা অধ্যায়ই আছে যার নামকরণ ডুমুর (Fig) গাছের নামে। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ ডুমুর সম্পর্কে বলেছিলেন— "If I had to mention a fruit that descended from paradise I would say this is it because the paradisiacal fruits do not have pits ..... eat from these fruits for they prevent hemorrhoids, prevent piles and help gout." (Bukhari).

আর বাংলাতে তো তির্যক মন্তব্যই আছে, কাউকে বহুদিন পরে দেখতে পেলে — 'কী ব্যাপার, তুমি যে ডুমুরের ফুল হয়ে গেছ!' এছাড়াও গ্রিক পুরাণে দেবতা আপোলোর

কাকের গল্প তো অনেকেই জানেন। তাই বলা যায় এই গাছটি বহু দিন থেকে মানব অগ্রগতির পথে পরিচিত এক চরিত্র।

জাম : আমাদের আজকের আলোচনায় আরও একটু অগ্রসর হলে যে উদ্ভিদটির সঙ্গে দেখা হয় তার নাম জাম। এর বিজ্ঞানসম্মত নাম *Syzygium cumini* (L) Skeels. গোত্র Myrtaceae. বিজ্ঞানসম্মত অন্যান্য সমার্থক নামগুলি হলো *Syzygium jambolanum, Eugenia cumini, Eugenia jambolana.*

গণসূচক শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'Suzugos' থেকে, যার অর্থ যুগ্ম। এ দিয়ে জোড়ায় জোড়ায় থাকা পাতা বোঝায়। প্রজাতিসূচক শব্দটি এই গাছের পর্তুগীজ নামের ল্যাটিন রূপান্তর। ভারতীয় এই গাছটি আমাদের দেশের খুব শুষ্ক অঞ্চল ছাড়া প্রায় সর্বত্র জন্মায়। ভারতের বাইরে শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, মালয় ও বাংলাদেশে এই গাছ পাওয়া যায়। গাছটি 30 meter পর্যন্ত উচ্চতাবিশিষ্ট হতে পারে। পর্ণমোচী এই বৃক্ষটির ছড়িয়ে থাকা ডালপালা ও পাতা গাছটির উপরের অংশে বেশ বড় চন্দ্রাতপের সৃষ্টি করে। বাকল হাল্কা ধূসর রঙের এবং মসৃণ। পাতা প্রতিমুখ পত্রবিন্যাসে সাজানো। শিরা বিন্যাস উপপ্রান্তীয়, ঈষৎ স্বচ্ছ গ্রন্থিযুক্ত যা আলোর বিপরীত দিকে ধরলে পরিষ্কার দেখা যায়। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে গাছের পাতা ঝরে যায়। মার্চ থেকে মে মাসে গাছে ফুল আসে। সুগন্ধি, ছোট ছোট ফুলগুলি সাদা রঙের হয় এবং পাতার নীচে গুচ্ছাকারে সাজানো থাকে। জুন-জুলাই ফলের সময়। পাকা ফল প্রথমে গোলাপী, পরে কালো রঙের হয়। কাঁচা ফল সবুজ। প্রতি ফলে একটি বীজ রসালো শাঁসে ঢাকা থাকে। বিভিন্ন জাতের জামে পাতা ও ফলের আকারের বেশ পার্থক্য দেখা যায়। ভালো জাতের ফল বড় ও রসালো হয়। কোন কোন জাতের ফল আবার ছোট এবং বীজসর্বস্ব। কয়েকটি অঞ্চলে ফলের রস থেকে এক ধরণের পানীয় তৈরি করা হয়। জাম কাঠ বেশ শক্ত। বাকল গলক্ষত, ব্রঙ্কাইটিস, পেটের রোগ ও হাঁপানী নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। ফল টনিক গুণযুক্ত। দাঁত ও মাড়িকে শক্ত করে। বীজ ও ফল ডায়াবেটিস ইনসিপিডাসে উপশমকারক। বিভিন্ন বিকল্প নিরাময় পদ্ধতি যেমন আয়ুর্বেদ, ইউনানী ও চীনা চিকিৎসা পদ্ধতিতে জাম বীজের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। ফল ভিটামিন A ও C এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

ভারতের কোন কোন অঞ্চলে গণেশ বা বিনায়কের পূজায় এই গাছের পাতা ও ফল ব্যবহার করা হয়। গাছটি নাকি শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ প্রিয় ছিল। সম্ভবতঃ কালো ফলের জন্য এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। বৌদ্ধরা এই গাছকে খুব পবিত্র মনে করেন। হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী কথিত আছে রামচন্দ্র বনবাসে থাকাকালীন চোদ্দ বছর নাকি এই জাম খেয়েই কাটিয়েছিলেন। ভারতে ফলটি এতই পাওয়া যেত যে ভারতের প্রাচীন নামগুলির মধ্যে একটি ছিল জম্বুদ্বীপ (জামের দ্বীপ)।

কখনো কখনো জামকে ব্ল্যাকবেরী বলে ভুল করা হয়, যেটা একেবারেই ঠিক নয়। ব্ল্যাকবেরী সম্পূর্ণ আলাদা একটি ফল, যার বিজ্ঞানসম্মত নাম *Rubus fruticosus* বা *Rubus ursinus*।

বট : একটি ছোট বীজ যে কত বড় সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারে তা কোনও বটগাছকে না দেখলে বোঝা যায় না। বটগাছ দেখেনি এমন মানুষ এদেশে খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। উদ্ভিদজগতের সাম্রাজ্যবাদী এই বটগাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম *Ficus benghalensis L.*, গোত্র Moraceae। গণসূচক *Ficus* শব্দটি এসেছে ডুমুরের প্রাচীন ল্যাটিন নাম থেকে। প্রসঙ্গত ডুমুরও *Ficus* গণভুক্ত গাছ। এই গণের অন্তর্ভুক্ত প্রায় ৬০০ প্রজাতি এই পৃথিবীতে পাওয়া যায়। প্রজাতি সূচক *benghalensis* শব্দটি দ্বারা বঙ্গদেশে জাত বোঝায়।

গাছটির ইংরেজি নাম Banyan tree-র উৎপত্তি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। সম্ভবত, ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপীয় বণিকরা পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী কোন অঞ্চলে এই প্রজাতির কোন বৃক্ষের নীচে ভারতীয় হিন্দু বণিকদের সঙ্গে মিলিত হতো। ব্যবসায়িক কথাবার্তা ছাড়াও হিন্দু বণিকরা এই গাছের নীচে নিজেদের পুজো ইত্যাদির কাজও করত। হিন্দু বেনিয়াদের প্রিয় গাছ পরবর্তী সময়ে ব্যানিয়ান ট্রি (Banyan tree) নামে পরিচিতি লাভ করে। বটগাছের আদি জন্মভূমি সম্ভবত নিম্ন হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল বলে অনেকে মনে করেন। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার পাশে, ধর্মস্থান প্রাঙ্গণে বা গ্রামের নিকটস্থ খোলা মাঠে বটগাছ দেখতে পাওয়া যায়। বৃক্ষ জাতীয় এই গাছটির শাখা থেকে ঝুরি মাটিতে নেমে এসে স্তম্ভমূলে পরিণত হয় এবং তা মূল কান্ডের মত শাখা প্রশাখাকে ধরে রাখতে সাহায্য করে। পাতাগুলি বেশ বড় আকারের। ডিম্বাকৃতি, মসৃণ এবং তাদের উপরের দিক বেশ চকচকে। সাধারণ ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে গাছে নতুন পাতা গজায়। ফল খুবই ছোট, ডুমুরের মতো বটেও উদুম্বর বা hypanthodium পুষ্পবিন্যাস লক্ষ করা যায়। সম্পূর্ণ পুষ্পবিন্যাস একটি ফলে পরিণত হয়। এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত ফল পাকে। বিভিন্ন পাখি যেমন ইন্ডিয়ান ময়না এই ফল খেতে পছন্দ করে। গবেষণায় দেখা গেছে এই পাখি দ্বারা বটের বীজ বিস্তার লাভ করে বেং পাখির পৌষ্টিকতন্ত্র দিয়ে বীজগুলি নির্গত হওয়ার ফলে তাড়াতাড়ি অঙ্কুরোদগম হয়ে চারা বেরোয়। বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণী যেমন বানর, হনুমান প্রভৃতিও বটের ফল খেতে বেশ ভালোবাসে। বালাম কেঠোর পাখি দ্বারা বাহিত বীজ থেকে চারা জন্মিয়ে পরজীবী হিসেবে জীবন শুরু করে এই গাছ এবং পরে শীঘ্রই স্বাধীন বৃক্ষরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। হাওড়ার শিবপুরে ভারতীয় বোটানিক্যাল গার্ডেনের বিশাল বটগাছটি নাকি এভাবেই জন্মগ্রহণ করেছিল। ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে একটি খেজুর গাছে এর জীবন শুরু হয়। এর মূল কান্ডটি

অনেকদিন নষ্ট হয়ে গেছে। বর্তমানে এর ঝুরি হতে সৃষ্ট সরু মোটা প্রায় ২৮৮০-র বেশি স্তম্ভমূল রয়েছে। এর উচ্চতা ২৪·৫ মিটার এবং বৃক্ষটি অরণ্যটির ৩·৪ একর জমি জুড়ে অবস্থান করছে।

বটের আঠার নানা ভেষজগুণ রয়েছে। টনিক হিসেবে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। কচি পাতা কুষ্ঠরোগে উপশমকারী। পাতার পুলটিশ ফোঁড়া উপশম করে। বাকলের কাথ ডায়াবেটিস ইনসিপিডাসে উপকারী। বটের ফল দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

ভারতীয় সাহিত্যের ঊষালগ্ন থেকেই বটগাছ সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র জায়গা করে নিয়েছে। কখনও পার্শ্বচরিত্র, কখনো প্রধান চরিত্র হিসেবে। রামায়ণ, মহাভারত কিংবা শকুন্তলা নাটক — এসবই হলো সেইরকম কয়েকটি উদাহরণ। রামায়ণে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা পঞ্চবটী (পঞ্চ বটের সমাহার) বনে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মহাভারতে দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গের দিন রাত্রে দুর্যোধনের সঙ্গে দেখা করার পর কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মা একটি বটগাছের নীচে আশ্রয় নিয়েছিলেন ও পেঁচাকর্তৃক কাকদের নিহত হয়ে দেখেছিলেন। তার পরের ঘটনা তো সবারই জানা।

'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে কণ্বমুনির আশ্রম ছিল তিন হাজার বছরের পুরানো এক বটগাছের নীচে।

এদেশের মানুষের ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রেও বটগাছ প্রায়ই নানা দেবতার আশ্রয়স্থল। গ্রামাঞ্চলে বেশিরভাগ হিন্দু মন্দিরগুলি বটগাছের ছায়ায় গড়ে উঠেছে। অনেক জায়গাতেই বটগাছ ও অশ্বত্থগাছ পাশাপাশি থাকলে তাদের বিয়ে দেওয়ার প্রথা চালু আছে। কোনও কোনও গ্রামে সন্তানহীনা মহিলারা বটগাছের ডালে ঢিল বেঁধে মানত করেন সন্তানলাভের আশায়। কারণ হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী সন্তান সন্ততি প্রদানের দেবতা ষষ্ঠী ঠাকরুণের আবসস্থল বটতলা। বটগাছ মানুষের কত প্রিয় হতে পারে তা ঊনবিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত 'পুরানো বট' কবিতাটি পড়লে বোঝা যায়। তাই বলা যায় বটগাছ ভারতীয় মানবজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

কাঁঠাল : গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল — শুনলেই ব্যঙ্গের খোঁচায় মনটা কেমন ঝিমিয়ে পড়ে, তাই না? তবে আমাদের মন ঝিমিয়ে পড়লেও জীবনানন্দ দাশের মন কিন্তু কাঁঠাল সম্বন্ধে সেকথা বলে নি। তাই তো আমাদেরকে তাঁর কবিতার কাঁঠাল ছায়ায় দাঁড়িয়ে যেতে হয়। তবে আমরা গাছটিকে কাঁঠাল নামে চিনলেও সমগ্র পৃথিবী গাছটিকে যে নামে এক ডাকে চেনে সেটি হলো *Artocarpus heterophylla* Lamk., সমার্থক নাম : *Artocarpus integra, Artocarpus integrifolia*। গাছটির গোত্র Maraceae.

প্রজাতিসূচক *heterophylla* শব্দের অর্থ বিভিন্ন রকম পাতা। অনেকসময় কাঁঠাল চারার পাতার কিনারা পরিণত গাছের পাতার মতো অখন্ড না হয়ে খন্ডিত হতে দেখা যায়। গণসূচক শব্দে যদিও এ গাছকে রুটিফল গাছ বা bread fruit tree বোঝায়, তবুও প্রকৃত bread fruit tree-র বৈজ্ঞানিক নাম *Artocarpus incisus* বা *Artocarpus communis*, যার বাসস্থান নিউগিনি অঞ্চল।

কাঁঠাল পশ্চিমঘাট পর্বতমালার আদি বাসিন্দা। এসম্বন্ধে ধারণা মিলতে পারে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'সদাশিবের হৈ হৈ কাণ্ড' গল্পটি পড়লে। বর্তমানে ভারতের সর্বত্র এবং ভারতের বাইরে বাংলাদেশ ও মায়ানমারে এই গাছ প্রচুর পাওয়া যায়। আমাদের দেশে অনেক প্রাচীন যুগ থেকে আমরা কাঁঠালের উল্লেখ পাই। গ্রিক ঐতিহাসিক থিওফ্রেসটাসের খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দের লিখিত বিবরণে মিষ্টি ও বৃহৎ ফলযুক্ত এই বৃক্ষের কথা আমরা জানতে পারি, যার ফল ভারতীয় ঋষিরা খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতেন। অনেক সময় জঙ্গলেও বুনো অবস্থায় কাঁঠাল গাছ দেখা যায়।

মাঝারী আকারের এই বৃক্ষটির কান্ড বেশ মোটা, বাকল গাঢ় বাদামী বা লালচে রঙের। ডালপালা ছড়ানো গাছের উপরিভাগ প্রায় গম্বুজাকার। পাতা গাঢ় সবুজ। অনেকটা ডিম্বাকৃতি ও উপরের দিক চকচকে। নীচের পৃষ্ঠ একটু খসখসে। বোঁটা ছোট। মধ্যশিরা দৃঢ় এবং তা থেকে ৭-১০ জোড়া উপশিরা বের হয়।

ফুল আকারে ছোট। একলিঙ্গ। স্ত্রী ও পুংপুষ্প আলাদা পুষ্পবিন্যাসে থাকে। একই গাছে দুই প্রকারের ফুল হয়। পুষ্পবিন্যাস বেলনাকার, মুন্ডক জাতীয়। পুং পুষ্পবিন্যাস ২-১০ সেমি লম্বা, অনেকটা মানুষের হাতের বুড়ো আঙুলের মতো। ফুল খুব ঘন সন্নিবদ্ধ, পুষ্পবিন্যাস প্রথমে সবুজ পরে বাদামী রঙের হয়ে গাছ থেকে ঝরে যায়। ফল যৌগিক যা স্ত্রী পুষ্পবিন্যাস থেকে উৎপন্ন। ফুলের রসাল পুষ্পপুট খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বসন্তে গাছে ফুল আসে। কখনো কখনো গাছের গুঁড়ি ও মূল থেকে ফুল বের হয় ও ফল ধরে। পরিণত ফল ওজনে ৭০-৮০kg পর্যন্ত হতে পারে।

কাঁঠালের পাতা ভেষজ গুনযুক্ত। গ্রন্থি স্ফীতিতে পাতার রস উপকারী। অনেক সময় ক্ষত নিরাময়ে পাতার সেঁক দেওয় হয়। মায়ানমারের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সন্ন্যাসীরা কাঁঠাল

কাঠ থেকে পাওয়া রঙ কাপড় রাঙানোর কাজে ব্যবহার করেন। তরুক্ষীর থেকে পাখি ধরার আঠা পাওয়া যায়।

কাঁঠাল বাংলার বহু গল্পে-প্রবাদে গানে নানাভাবে উপস্থিত। কাঁঠাল পাকলে তা খাওয়ার জন্য শিয়ালের দলের যে একতা তা যেন আমাদের দেশের অনেক সুবিধাবাদী একতারই রূপক। আবার নানা সাবধান বাণীমূলক প্রবাদও আছে কাঁঠাল নিয়ে যেমন—

'আম খাইও জাম খাইও, কাঁঠাল খাইও না /
কাঁঠাল খাইলে পেট ফুলবো, বৈদ্য পাইবা না।'

আর পূর্ণচন্দ্র দাস বাউলের গলায় - "গোলেমালে গোলেমালে পিরীত কইরো না / পিরীতি কাঁঠালের আঠা, লাগলে পরে ছাড়বে না ..." গানটি তো অসম্ভব জনপ্রিয়।

হিজল : "হিজল কাঠের নাও গো আমার,
মন-পবনের দাঁড়!
যেথায় কেশবতী সিনান করে,
চল সেই ঘাটের পার।" —

হ্যাঁ, হিজল গাছ বাংলার রূপকথার সঙ্গে এমনভাবেই জড়িত। আর তাই সেই গাছ বাংলার অপরূপ কথা 'রূপসী বাংলা'র অন্দরে থাকবে এতে আর আশ্চর্য কী? 'খয়েরী ডানা শালিখকে ডাক দিয়ে হৃদয়ের পাশে' নিয়ে যাওয়া এই হিজল গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম— *Barriangtonia acutangula* L. Gaerton., গোত্র Lecythidaceae। গণসূচক '*Barringtonia*' শব্দটি এসেছে ইংরেজ প্রকৃতিবিদ ডি. ব্যারিংটনের নাম থেকে। প্রজাতিসূচক '*acutangula*' শব্দটি সূক্ষ্মকোণ সূচিত করে, ফলের আকার বোঝাতে এই নাম দেওয়া হয়েছে।

বৃক্ষটির আদি বাসস্থান ভারত, মালয় ও আস্ট্রেলিয়া। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে অনেক জায়গায় গাছটিকে পাওয়া যায়। এছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যেও গাছটিকে যথেষ্ট পাওয়া যায়। গাছটি সামগ্রিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার উপকূলবর্তী জলাভূমি অঞ্চলে পাওয়া যায়।

মাঝারী আকারের চিরসবুজ বৃক্ষ। ডালপালা ছড়ানো। বাকল খসখসে ও গাঢ় বাদামী রঙের। পাতা মসৃণ, আগার দিকে বেশ চওড়া, বোঁটার দিক ক্রমশ সরু। ডালের আগার দিকে পাতাগুলি গুচ্ছবদ্ধ অবস্থায় থাকে। পাতার কিনারা সূক্ষ্মভাবে দন্তুর।

ছোট ছোট লালচে বা গোলাপী রঙের ফুলগুলি স্পাইক পুষ্পবিন্যাসে সাজানো। পুষ্পগুচ্ছগুলি শাখার আগা থেকে ঝুলতে থাকে। প্রতি ফুলে অসংখ্য পুংকেশর দেখা যায়। ফলের মধ্যাংশ সবচেয়ে চওড়া, চতুষ্কোণ যুক্ত। কিনারা গোলাকার। প্রতি ফলে একটি বীজ থাকে। কাঠ সাদা, চকচকে, নরম, তবে দীর্ঘস্থায়ী, নৌকা তৈরিতে এর ব্যবহার রয়েছে। হিজল গাছ নিয়ে লেখার শুরুতেই বলেছি যে রূপকথার গল্পে ব্যবহৃত নৌকাটিও হিজল কাঠের তৈরি। নৌকো ছাড়াও গরুর গাড়ি, বিভিন্ন আসবাব ও রেলের কামরার ভিতরের অংশ তৈরিতে এই কাঠ ব্যবহৃত হয়। মাটির নীচে থাকলে এই কাঠের রঙ কালো হয়ে যায়।

হিজল গাছের ভেষজগুণ বর্তমান। ফল তিক্ত, কষায় — শূল বেদনা ও সর্দিতে উপকারী। মূল কুইনাইনের মত ভেষজগুণবিশিষ্ট বলে মনে করা হয়। পাতার রস পেটের পীড়ায় উপকারী। বাকল ট্যানিং-এ ব্যবহৃত হয়। এই গাছের থ্যাঁতলানো পাতা জলে ছড়িয়ে দিলে নাকি মাছ নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং সহজে ধরা পড়ে।

এপ্রিল-মে মাসে গাছে ফুল ফোটে। তখন গাছকে বেশ সুন্দর দেখায়। শোভাবর্ধক উদ্ভিদ হিসেবে গাছটিকে রাস্তার ধারে লাগানো যেতে পারে। বুনো অবস্থায় নদী নালার ধারে গাছটি জন্মায়।

অশ্বত্থ : আমাদের দেশের কোথাও কোথাও এই ধারণা প্রচলিত আছে যে অশ্বত্থ গাছের নীচে মিথ্যা কথা বললে বা কাউকে ঠকালে বিপদ ঘটে। সেইজন্য দোকানদারদের খোঁচা দেওয়ার জন্য কখনো কখনো লোকে তাদের বলে তারা যেন বাজারে অশ্বত্থগাছ না লাগায়। যদিও আমাদের দেশের বাজারগুলিতে অশ্বত্থ গাছ ও অসত্য দোকানদার দুই-ই প্রচুর পরিমাণেই আছে।

অশ্বত্থ গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম *Ficus religiosa* L. গোত্র Moraceae.

প্রজাতিসূচক *religiosa* শব্দে পবিত্র বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বোঝায়। গাছটির আদি বাসস্থান হিমালয়ের পাদদেশ সন্নিহিত বঙ্গদেশ এবং মায়ানমার অঞ্চল। বিভিন্ন

অঞ্চলে গ্রামে বা রাস্তার পাশে এই গাছ লাগানো হয়ে থাকে। পাখির মাধ্যমে এই গাছের বিস্তার ঘটে।

বেশ বড় আকারের বৃক্ষ জাতীয় গাছটির বাকল মসৃণ, ধূসর রঙের। কান্ড থেকে মাঝে মাঝে বাকলের টুকরো খসে পড়ে। পাতা বেশ চওড়া, চকচকে এবং পাতার অগ্রভাগ থেকে লম্বা লেজের মত উপবৃদ্ধি দেখা যায়। পাতার বোঁটাও বেশ লম্বা। পত্রফলকের উপরের দিক গাঢ় সবুজ, নীচের দিকের রঙ অনেকটা হালকা। মৃদু হাওয়ায় দুলতে থাকা পাতাগুলির আগা একে অপরের সঙ্গে লেগে বৃষ্টির শব্দের মত মৃদু শব্দ সৃষ্টি করে। পাতার আগায় এই লম্বা লেজের মতো উপবৃদ্ধি বৃষ্টিবহুল স্থানের অধিবাসী গাছের একটি অভিযোজন, যার দ্বারা বৃষ্টির জল পাতা বেয়ে সহজে ঝরে পড়ে। ফলে পাতা বেশিক্ষণ ভিজে না থেকে গ্যাসীয় বিনিময়ে অংশগ্রহণ করতে পারে।

প্রতি পাতার গোড়া থেকে ছোট ফলগুলি জোড়ায় জোড়ায় বের হয়। পাকা ফল কালচে গোলাপী রঙের। মে-জুনে ফল পাকে। তার আগে ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল পর্যন্ত গাছে নতুন পাতা গজায়। বট গাছের মতো অশ্বত্থের বীজও পাখির মাধ্যমে অন্য গাছে বা বাড়ির দেওয়ালে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখানে নতুন গাছ জন্মায়। কিছুদিন পর এইসব নতুন চারাগাছের শিকড় আশ্রয়দাতা গাছকে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে যে তাদের মৃত্যু হয়। অনেক সময় বড় বাড়ির কার্নিসে এই গাছ জন্মে দেওয়াল ফাটিয়ে দেয়।

গাছটিতে কিছু ভেষজ গুণ বর্তমান। বাকল কষায়। বিভিন্ন ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ফল ও কচি অবিকশিত পাতা দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পাতা হাতি ও গো-মহিষাদির প্রিয় খাদ্য।

হিন্দুদের কাছে এই গাছ খুব পবিত্র। তারা বিশ্বাস করে তার শিকড় ব্রহ্মার প্রতীক, বাকল বিষ্ণুর এবং শাখা-প্রশাখা শিবের। বিষ্ণু পুরাণে লেখা আছে ঃ "বিশাল অশ্বত্থ যেমন একটি ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে বিধৃত, তেমন সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মার মধ্যে বিধৃত।" কেউ কেউ আবার অশ্বত্থকে দুর্গার বাসস্থান বলে মনে করেন। বরাহমিহিরের মতে, সুখ ও উন্নতি কামনায় মানুষের বাসস্থানের সামনে বট ও অশ্বত্থ গাছ লাগানো উচিত। বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্কার অনুযায়ী এই গাছ কাটা পাপ বলে গণ্য করা হয়।

বাংলার কোথাও কোথাও পাশাপাশি বটগাছ ও অশ্বত্থগাছ থাকলে তাদের বিবাহ দানের রীতিও চালু আছে। সেক্ষেত্রে বটগাছটিকে পুরুষ হিসেবে বিবেচনা করে তাকে সাদা ধুতি এবং অশ্বত্থগাছটিকে মহিলা হিসাবে বিবেচনা করে তাকে লালপাড় সাদা শাড়ি পরানো হয়।

নানা সংস্কারের জন্য না কাটায় অন্য গাছের তুলনায় অশ্বত্থ গাছ দীর্ঘজীবী হয়। সব চেয়ে দীর্ঘজীবী অশ্বত্থের উদাহরণ বোধ হয় ভারত থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২৮৮ অব্দে নিয়ে সিংহলে লাগানো গাছটি, যা এখনো বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে।

ফণীমনসা : 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' কবিতাটিতে অশ্বত্থের পরেই যে উদ্ভিদটি আছে তার নাম ফণীমনসা। গাছটির বিজ্ঞানসম্মত নাম *Opuntia dilleniji* Haw. উদ্ভিদ Cactaceae গোত্রের অন্তর্গত। স্থানীয় অন্যান্য নামগুলি হল নাগফণা, ছাতুমনসা। নামগুলির মধ্যে কেমন একটা সাপ সাপ গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, তাই না? আসলে গাছটির কান্ড জলসংরক্ষণকারী বিশেষ অভিযোজনে চ্যাপ্টা হয়ে পাতার আকৃতি ধারণ করেছে, যা সাপের ফণার মতো দেখতে, আর সেজন্যই নাগফণা এবং আরও একধাপ এগিয়ে হিন্দু সর্পদেবী মনসার নাম জুড়ে ফণীমনসা বলে একে অভিহিত করা হয়েছে।

মরুভূমি অঞ্চল ছাড়াও লবণাক্ত মাটি — যেমন সুন্দরবন অঞ্চলেও গাছটিকে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

এটি একটি জল সংরক্ষী উদ্ভিদ, গোড়া থেকে শাখান্বিত। পাতা ছোট ছোট, কাঁটায় রূপান্তরিত। পাতার মতো দেখতে পরিবর্তিত কান্ডগুলি ফ্যাকাশে সবুজ, প্রশস্ত ভিত্তি থেকে উৎপন্ন এবং শাঙ্কব। সন্ধিগুলি প্রশস্ত এবং অভিমুখ ডিম্বাকার। তরঙ্গিত (undulate), খুব একটা পুরু নয়, হাল্কা নীলচে সবুজ। কন্টকগুলি শক্ত এবং তীক্ষ্ণ। ফুলগুলি হলুদ বা হলুদের উপর হাল্কা কমলা আভাযুক্ত। ফল ন্যাসপাতি আকৃতির, কর্তিতাগ্র, শীর্ষে একটু অবনত, গায়ে গুচ্ছাকারে কন্টকী রোম থাকে। পাকলে গাঢ় লালচে বেগুনী হয়। প্রধানত, মার্চ থেকে জুনের মধ্যে ফুল ফোটে ও ফল হয়। গাছগুলি বন্য প্রকৃতির।

গাছটির নানারকম ভেষজ গুণ আছে। সম্পূর্ণ উদ্ভিদটি গর্ভনিরোধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কাশির চিকিৎসা, গনোরিয়া, অপ্থ্যালমিয়া, লিউকোডার্মা, প্রস্রাবজনিত সমস্যা, ভেসিকিউলার কালিকুলি, অ্যানিমিয়া এবং প্লীহাবৃদ্ধি রোধে এটা ব্যবহৃত হয়।

গাছের ফল সিদ্ধ করে হুপিং কাশিতে ব্যবহার করা হয়। দুধের মতো নির্যাস কোষ্ঠকাঠিন্য নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। ফুল ব্রঙ্কাইটিস ও হাঁপানী নিরাময়ে উপযোগী।

অঙ্গজ জনন পদ্ধতিতে এই উদ্ভিদ বিস্তার লাভ করে।

শটি : "ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে" — কী এই শটি? এ প্রশ্ন আমাদের অনেকের মনেই অনেকবার উঁকি মেরেছে। এই শটি হলো হলুদ বা আদা গোত্রের একটি উদ্ভিদ যার বিজ্ঞানসম্মত নাম *Curcuma zedoaria* Rosc.

আগেই বলেছি গোত্র Zingiberaceae। স্থানীয় নাম শটি বা পালো। চাষের মাধ্যমে (গ্রন্থিকান্ড দ্বারা) উদ্ভিদটির বিস্তার ঘটে। এটি একটি কান্ডবিহীন বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ, যার মূল করতলাকার ভাবে শাখান্বিত স্ফীতকন্দ প্রকৃতির, ভেতরদিক ফ্যাকাশে হলুদ রঙের। পাতাগুলি দীর্ঘ পত্রবৃন্তযুক্ত, দীর্ঘায়ত ভল্লাকার (oblong-lanceolate), সূক্ষ্ম দীর্ঘাগ্রযুক্ত, পাতার দুই পৃষ্ঠই মসৃণ এবং রোমশূন্য। পুষ্পকান্ড আবরণযুক্ত। ফুলগুলি হলুদ মঞ্জরী (spike) সদৃশ। মঞ্জরীপত্র, সবুজ, লালচে আভাযুক্ত। ফল ডিম্বাকৃতি ক্যাপসুল, বীজ উপবৃত্তাকার।

মে মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ফুল ফোটে এবং ফল হয়। পতিত জমি ও খোলা বনভূমিতে গাছটিকে প্রচুর দেখা যায়।

হলুদ বা আদা গোত্রের যে কোনো গাছের মতো এই উদ্ভিদটিরও নানা ভেষজগুণ আছে। এর গ্রন্থিকান্ড হাঁপানীর চিকিৎসায়, ব্রঙ্কাইটিসে, অর্শে, লিউকোডার্মাতে, টিউমার নিরাময়ে, গলার টিউবারকিউলাস গ্ল্যান্ডে, বর্ধিত প্লীহায়, ব্যথায়, প্রদাহে, দাঁদের যন্ত্রণায়, বিবর্ণ ত্বকের রঙ ফেরাতে এবং লিগামেন্টের হঠাৎ লাগা ব্যথা নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। গ্রন্থিকান্ড থেকে শটি নামক শর্করা পাওয়া যায়, যা প্রসাধনী তৈরীতে কাজে লাগে। খাদ্য হিসেবে এবং গ্রামাঞ্চলে শিশুদের দুধের সঙ্গে শটির পালো খাওয়ানো হয়। পিঠে তৈরিতেও শটির ব্যবহার আছে। এছাড়াও প্রসবের পর দুর্বলতা নিরাময়ে, রক্ত পরিশোধনে ব্যবহৃত হয়। থেঁতো করা গ্রন্থিকান্ড গরম জলে ফেলে ছেঁকে নেওয়ার পর ঐ জল জ্বর নিরাময়ে ও মাথার যন্ত্রণা এবং তৃষ্ণা নিবারণে ব্যবহৃত হয়। শিশুদের অন্ত্রের কৃমিনাশক হিসেবেও শটি ব্যবহৃত হয়। মূল সিদ্ধ করে প্রাপ্ত নির্যাস অর্শ নিরাময়ে এবং ডায়রিয়াতে ব্যবহৃত হয়। পাতা উদরাময় নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়।

চাঁপা : সুন্দরী মেয়েদের সম্পর্কে বলতে গেলে অনেকেই চাঁপার কলির সঙ্গে তাদের হাতের আঙুলের তুলনা করে থাকেন। আমরাও অনেকে চুপচাপ সেই তুলনা শুনে বা পড়ে চলে যাই, কিন্তু আমাদের চাঁপার কলি বা চাঁপাগাছ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা না থাকার দরুণ তুলনাটা বেশিরভাগ সময়েই মাঠে মারা যায়। তাই আজ এই কবিতা পড়ার অবসরে দেখে নেব কী-ই বা চাঁপা গাছ? কী বা তার কলি?

চাঁপা বা চম্পা গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম *Michelia champaca* Linn. গাছটি Magnoliaceae গোত্রের অন্তর্গত। বৈজ্ঞানিক নামের গণবাচক *Michelia* শব্দটি এসেছে উদ্ভিদবিজ্ঞানী পিএ. মাইকেলের নাম থেকে এবং প্রজাতিবাচক *champaca* শব্দটি সংস্কৃত চম্পক শব্দ থেকে এসেছে। এটি একটি বৃক্ষজাতীয় গাছ। প্রশাখাগুলি নবীন অবস্থায় রেশমি। পাতাগুলি ডিম্ব-ভল্লাকার, নিচের দিক রোমশ, শীর্ষ দীর্ঘাগ্র, ভিত্তি সূক্ষ্মাগ্র। ফুল কাক্ষিক, পাপড়িগুলি সোনালি, কখনো সাদা, কখনো হাল্কা গেরুয়া বা হাল্কা হলুদ রঙের হয়, পাপড়িগুলি বি-বর্শাফলাকার (oblanceolate), রসাল, পুংকেশর অগণিত, কিছুটা মুখল আকৃতির। ফল-পুষ্পদন্ড দীর্ঘাকার, পাকা গর্ভপত্র শিথিলভাবে সজ্জিত, বহু বীজ, রসাল লাল এরিল দিয়ে আবৃত থাকে। সাধারণতঃ মার্চ মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ফুল ফোটা ও ফল হওয়ার মোটা সময়। চারা রোপণের মাধ্যমে গাছটির বিস্তার ঘটানো হয়।

ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে এই গাছটিরও ভেষজগুণ বর্তমান। এর পাতার রস পেটের ব্যথায় ও কৃমি নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। কান্ডের বাকল জ্বরনাশক, উদ্দীপক, পুরানো সর্দিকাশি নিরাময়ক। কোষ্ঠকাঠিন্য নিরাময়ে কাজে লাগে। ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিসে ব্যবহৃত হয়। মাথাব্যথা উপশমকারী, অনিয়মিত ঋতুস্রাবের চিকিৎসায় বাকলের ক্বাথ দিনে দুইবার করে খাওয়ানো হয়।

মূল ও মূলের ছাল কোষ্ঠকাঠিন্য নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও প্রদাহ ও ফোঁড়া নিরাময়ে প্রয়োগ করা হয়। ফুল ও ফল মূত্রবর্ধনকারক হিসাবে মূত্রজনিত রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহা উদ্দীপক, টনিক, পাকস্থলীর ব্যথা উপশমকারক, গনোরিয়া নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। ডিসপেপসিয়া ও বমিভাব নাশক, জ্বর, মাথা ঝিমঝিম করা, নাক থেকে গন্ধযুক্ত ক্ষরণ নিরাময়ে ফুল ও ফল ব্যবহৃত হয়। ফুলের তেল মাথার যন্ত্রণা, অপথ্যালমিয়া এবং গেঁটে বাত নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। ফুল ও ফল পাকস্থলী ও অন্ত্রের গ্যাস নাশক।

মূল ও মূলের ছাল পেলভিক অঞ্চল ও জরায়ুতে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি করে। গর্ভাবস্থা ছাড়া অন্য কারণে ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেলে তা স্বাভাবিক করতে মূল ও মূলের ছাল ব্যবহার করা হয়।

দানা ও ফল পা ফেটে যাওয়া সারাতে ব্যবহার করা হয়।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে চাঁপা বা চম্পা একটি প্রাচীন নাম। তারই প্রমাণ মেলে বাংলার রূপকথার সাত ভাই চম্পার গল্পে, কিংবা 'চম্পা চামেলি গোলাপের বাগে' গানটির কথায়

প্রথম আমাদের আলোচ্য জীবনানন্দ দাশের বর্তমান কবিতাটিতে। আর চাঁপার কলি অর্থাৎ চাঁপাফুল ফোটার আগের মুহূর্তের কুঁড়িটি তো বহু প্রাচীন সময় থেকে আজকের দিনেও সমাদৃত একটি উপমান।

তমাল : তমাল গাছ যে বাংলা সাহিত্যে বার বার জায়গা করে নিয়েছে সে কথা সর্বজন বিদিত। 'তমাল', এই নামটার সঙ্গেই অনেক মানুষের ছোটবেলার সুখস্মৃতি, রাজপুত্র রাজকন্যার কাহিনী শোনার নস্ট্যালজিয়া কিংবা 'অবন ঠাকুরের' 'তপোবন' — বারবার ফিরে আসে। আমাদের দুই মহাকাব্যেও বারে বারে তমালের বর্ণনা ফিরে ফিরে এসেছে। আর সেই পথ ধরেই এগিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ এবং আরো অনেকে। বর্তমান সময়ের কবি জয় গোস্বামীর লেখা 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়েও' তাই আমরা শহর থেকে বেড়াতে আসা 'বেণীমাধব'কে দেখতে পাই 'মোহনবাঁশি' বাজাচ্ছে, সেই 'তমাল তরুমূলে' বসেই। এভাবেই তমাল নামটা আমাদের এতই প্রিয় হয়ে উঠেছে যে প্রায়শই উদ্ভিদজগত ছাড়িয়ে প্রাণীজগতেও বহু মানুষের তমাল নাম খুঁজে পাওয়া যায়।

অনেকে তেজপাতা গাছের সঙ্গে তমাল গাছকে এক করে ফেলেন, এটা ঠিক নয়। দুটি গাছের গোত্রই আলাদা। তবে তেজপাতার সঙ্গে তমালকে গুলিয়ে ফেলার প্রধান কারণ সম্ভবত তেজপাতার বিজ্ঞানসম্মত নাম *Cinnamomum tamala*। এখানে প্রজাতিসূচক *tamala* শব্দটি বিভ্রান্তিকর।

তমালের বিজ্ঞানসম্মত নাম *Garcinia xanthochymus* Hook, সমার্থক বৈজ্ঞানিক নাম *Garcinia tinctoria* Dumm., গোত্র Guttiferae (Clusiaceae).

গাছটির আদি বাসস্থান পূর্ব হিমালয়, তবে বর্তমানে আন্দামান, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কেরালা এছাড়া ভারতের বাইরে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, মায়ানমার, চীন, থাইলান্ড ও মালয়ে এই গাছ জন্মায়।

মাঝারী আকারের বৃক্ষ, রুক্ষ বাকল কালচে ধূসর। পাতাগুলি চামড়ার মতো, রৈখিক দীর্ঘায়ত বা দীর্ঘায়ত ভল্লাকার, সূক্ষ্মাগ্র (acute) বা দীর্ঘাগ্র (acuminate), নগ্ন, চকচকে। পুষ্প ফুলগুলি গুচ্ছে থাকে, বৃত্যংশ পাঁচটি, রসাল অসম প্রকৃতির, দল পাঁচটি, মন্ডলাকার (Orbicular), বহির্মুখী। পুংকেশর ১৫-২০ টি, যা ৩-৫টি গুচ্ছে সজ্জিত থাকে। পরাগধানী দুই কক্ষ বিশিষ্ট। স্ত্রী ফুলের গর্ভাশয় ডিম্বাকৃতি, সূচ্যগ্র, সাধারণত পাঁচটি কক্ষবিশিষ্ট। গর্ভমুন্ড ৫টি খন্ডক বিশিষ্ট, দীর্ঘায়ত, ছড়ানো, অখন্ড। ফলগুলি বৃহৎ উপগোলকাকার, পাকলে গাঢ় হলুদ রঙের হয়। সাধারণত মার্চ থেকে জুলাই মাসের মধ্যে এর ফুল ফোটে। বেশিরভাগ সময়েই গাছটি আপনা আপনি বুনো গাছপালার মতোই জন্মায়। এছাড়া বীজ রোপণের মাধ্যমেও গাছটির বিস্তার ঘটানো হয়ে থাকে।

গাছটির নানা ভেষজ গুণ বর্তমান। এর ছাল মলম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। পাতা আন্ত্রিক ও ডায়েরিয়া নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। ফল পিত্ত বিরেচক হিসেবে, পাকস্থলীর ব্যথায়, জ্বরে, কাশিতে, ত্বকের রোগে, বিভিন্ন ব্যথায় এবং হৃদযন্ত্রের নানা সমস্যা নিরাময়ে বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহৃত হয়। বীজ বাটা কোষ্ঠকাঠিন্য নিরাময়ে, টনিক হিসাবে, পা ফাটায়, ফুসফুসের রোগে, গ্রন্থিজ বেদনায়, ডায়রিয়া ও আন্ত্রিক নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়।

ধান : প্রবাদে আছে 'চাষীর ধান, মানীর মান আর ওস্তাদের কান' --- এ তিন বড় স্পর্শকাতর জায়গা — সামলে চলতে না পারলে রাজার রাজ্যও রসাতলে যায়। প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। তবে জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় ধানের কথা লিখে আমাদেরকে বড়ই কাতর করে ফেলেছেন, কারণ তিনি ধানের আগে যে 'সোনালি' শব্দটি বসিয়েছেন সেটি বড়ই মারাত্মক। কারণ শব্দটি প্রশ্ন তুলে দেয় — তবে কী জীবনানন্দের সময়েও সোনালি ধান বা Golden Rice ছিল? প্রশ্নটির উত্তর — একেবারেই না। সোনালি ধান বা জেনেটিক্যালি মডিফায়েড গোল্ডেন রাইসের ধারণা এসেছে অনেক পরে — ১৯৯০ এর দশকের প্রথম দিকে আর এ সম্বন্ধে প্রথম বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক তথ্য বেরোয় Science পত্রিকায় ২০০০ সালে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সোনালি ধান বা গোল্ডেন রাইস হল জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে উৎপন্ন একরকমের ধান যাতে প্রচুর পরিমাণে বিটা ক্যারোটিন থাকে। আর এই বিটা ক্যারোটিন থেকে উৎপন্ন হয় ভিটামিন-A, তাই ভিটামিন-A-র অভাবজনিত রোগ নিরাময়ে সোনালি ধানের ভাত খাওয়া উপকারী।

তাই ধরে নেওয়া যায় জীবনানন্দ দাশ সোনালি ধান বলতে এখানে হেমন্তকালে পেকে যাওয়া সাধারণ ধানের রঙকেই বুঝিয়েছেন, কারণ এই কবিতাটি যে কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত, তার রচনাকাল মার্চ ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ।

এবার দেখে নেওয়া যা ধানের উদ্ভিদজাগতিক অবস্থিতি কী? ধানের বিজ্ঞানসম্মত নাম *Orzyza sativa*, গোত্র Poaceae বা Graminae.

ধানগাছ একটি বীরুৎ (Herb) জাতীয় উদ্ভিদ। পাতা একক, পত্রফলক চ্যাপ্টা, রেখাকার। পত্রমূল কান্ডবেষ্টক এবং লিগিউল বা অনুফলক যুক্ত। শিরাবিন্যাস সমান্তরাল ও পত্রবিন্যাস

একান্তর।

ধানের পুষ্পবিন্যাসকে স্পাইকলেট বলে। প্রত্যেক স্পাইকলেটে একটি করে উভলিঙ্গ ফুল থাকে। ধান ফলে বৃতি বা দলমন্ডল থাকে না। পুংকেশর 6টি। স্ত্রী স্তবকে গর্ভদন্ড দুটি, একপ্রকোষ্ঠ যুক্ত গর্ভাশয়ে একটি ডিম্বক থাকে। ফল ক্যারিয়পসিস — সরল, নীরস, অবিদারী।

পৃথিবীর সব জায়গায় ধান চাষ হয়। চীন, ভারত, জাপান, ময়ানমার, বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, কোরিয়া প্রভৃতি দেশ ধান চাষে বিখ্যাত।

ধানেরও ভেষজগুণ আছে। চরকসংহিতায় বলা হয়েছে "রক্তশালি, মহাশালি, কলম, শকুন, চূর্ণক, দীর্ঘশুক, গৌর, পান্ডু অঙ্গুল, সুগন্ধিক, লোহবালা, শালিক, প্রমোদক, পতঙ্গ ও তপনীয় ধান্য এবং অপরাপর যে সব হিতকর শালিধান্য আছে, তাহারা রসে ও বিপাকে শীতল, মধুর, স্বল্প বায়ুকারক, অল্প পুরীষজনক, অল্পমাত্রায় বিষ্ঠাবদ্ধতাকারক, স্নিগ্ধ, বৃংহণ এবং শুক্র ও মূত্রকারক।" আবার ওখানেই শালিধান সম্পর্কে বায়ু পিত্ত ও কফের শমতাকারক ও তৃষ্ণানাশক বলা হয়েছে। আর ঢেঁকি ছাঁটা চাল যে ভিটামিন বি-কমপ্লেক্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস তা এখন সর্বজনবিদিত।

ভাঁট : জীবনানন্দ দাশের ভাঁটফুল গাছকে আমরা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে পাই ঘেঁটুফুল গাছ হিসেবে। আসলে একই উদ্ভিদের দুটি আলাদা স্থানীয় নাম হল ভাঁট ও ঘেঁটু। আবার এই উদ্ভিদটিকেই সাঁওতালরা বলে— খড়বাড়ি। আমাদের আজকের আলোচ্য শেষতম উদ্ভিদ এই ভাঁটফুলের বিজ্ঞানসম্মত নাম *Clerodendrum viscosum* Vent. সমার্থক বৈজ্ঞানিক নাম *Clerodendrum infortunatum* auct. non Linn. গোত্র Verbenaceae.

সমগ্র দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে গাছটিকে দেখা যায়। ঘন ক্ষুদ্র কোমল রোমাবৃত গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, বিশেষ গন্ধবাহী। পাতাগুলি চওড়া এবং ডিম্বাকৃতি কিংবা প্রায় গোলাকার, 8–20 x 7–15 cm^2, দীর্ঘাগ্র, দাঁতের মতো খাঁজযুক্ত, পাতার ভিত্তিপ্রান্ত গোলাকার। ফুলগুলি প্রান্তীয় সাবকরিম্বোজ (অবসমভূম মঞ্জরী), যৌগিক মঞ্জরী, সহপত্রী, পএসদৃশ, শীঘ্রমোচী। দলমন্ডল সাদা, ভিতরের প্রান্তে লালচে বেগুনী। চারটি পুংকেশর, অত্যধিক বহির্মুখী। ফল ড্রুপ জাতীয় বর্ধনশীল বৃতি দিয়ে ঢাকা থাকে, পাকার সময় ইঁটের মতো লাল রঙ ধারণ করে।

ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত ফুল ফোটে ও ফল হয়। গাছটি বন্য প্রকৃতির এবং বীজের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে।

সম্পূর্ণ উদ্ভিদটির একাধিক ভেষজ গুণ আছে। এটা টনিক ও কামোদ্দীপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রক্তের রোগে, লিউকোডার্মা এবং জ্বালা অনুভূতিতে ব্যবহৃত হয়।

পাতা এবং মূল চিরেতার যোগ্য বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। টনিক হিসাবে, কৃমিরোগ নিরাময়ক হিসাবে, টিউমার চিকিৎসায়, চর্মরোগে, বাচ্চাদের ম্যালেরিয়া জ্বরে, বুকের বিভিন্ন সর্দিকাশির মতো রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়।

মূল পেঁয়াজের কান্ডের সঙ্গে পেস্ট করে গেঁটে বাতযুক্ত স্থানে ম্যাসাজ করা হয়। মূলের ছাল করঞ্জা তেলে রসুন দিয়ে সিদ্ধ করে কুষ্ঠ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়;

পাতার টাটকার রস সকালবেলা খালিপেটে কৃমিনাশক হিসেবে খাওয়া হয়।

প্রকৃতির বিবর্তনে সৃষ্ট উদ্ভিদজগৎ আর প্রাণীজগৎ — কেউ কাউকে ছাড়া বাঁচতে পারে না। তাই 'জীবন যখন শুকায়ে যায়', যখন আমাদের কর্মজগৎ প্রবল আকার ধারণ করে আমাদেরকে গ্রাস করে ফেলতে উদ্যত হয়, তখনই আমরা প্রকৃতি ও তার উদ্ভিদজগতের করুণাধারায় স্নাত হতে চলে যাই পাহাড়ে কিংবা সাগর সৈকতের ঝাউবনে। অনুভব করি বিশ্ব-প্রকৃতির উদার বিশালতা, আবার খুঁজে পাই জীবনের মানে। কখনো বা উদ্দেশ্যহীনভাবে বেরিয়ে পড়ি নদীকে পাশে রেখে, তারাভরা আকাশকে মাথার উপরে রেখে, আর তখনও বনলতা সেনের মতো আমাদেরকে সঙ্গ দেয় এই উদ্ভিদ জগৎ — পায়ের নীচ থেকে মাথার উপর পর্যন্ত, সর্বত্রই। আর আমাদের এই ভালো লাগাকে কেন্দ্র করেই একদিন হয়তো গড়ে উঠবে এক নতুন বিষয়, যার নাম হবে 'জীব ভাষা ও সাহিত্য বা Bio-language and Literature.' সেখানে সাহিত্যের পাশাপাশি সাহিত্য উপস্থিত উদ্ভিদ ও প্রাণীদের নিয়ে থাকবে বিস্তারিত আলোচনা। সময় হয়তো এগিয়ে চলেছে সেই নতুন সৃষ্টির দিকেই।

[অনিবার্য কারণবশত এই রচনাটির সঙ্গে যুক্ত দীর্ঘ তথ্যসূচী এবং ছবি ছাপা গেল না। এর দায় একান্ত ভাবেই সম্পাদকমণ্ডলীর। লেখক কোনভাবেই এর জন্য দায়ী নন।
তথ্যসূচী-এর জন্য প্রয়োজন থাকলে যোগাযোগ করুন— ৯৯০৩৮৩০৬৩৭ (সৈকত) এই নম্বরে।]

"চাই..."

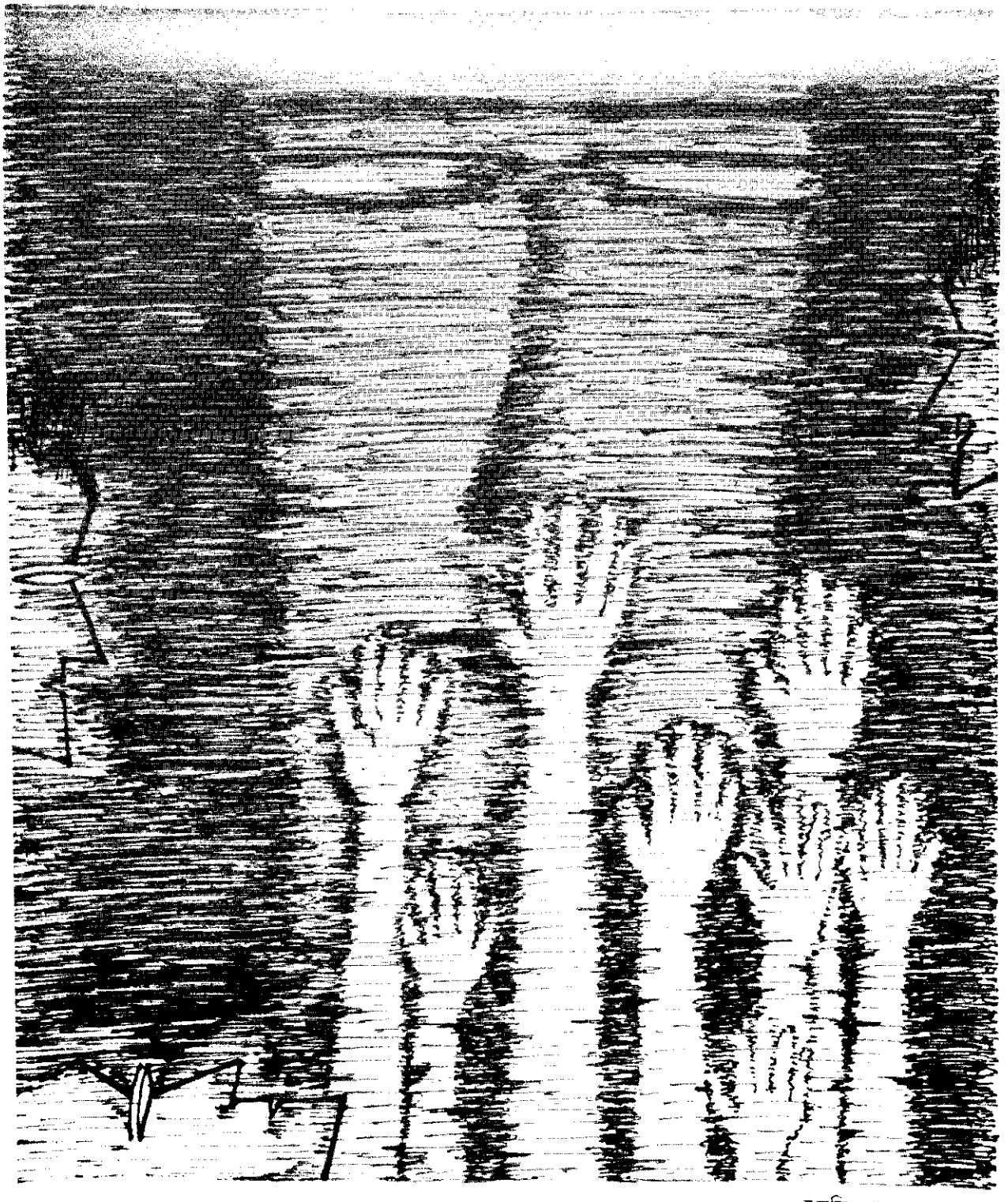

জয়তি পাল
প্রথম বর্ষ, বাংলা বিভাগ

পুনর্মুদ্রণ

বিজ্ঞাপনের অর্থনীতি

অর্মত্যকুমার সেন

বর্তমান যুগকে বিজ্ঞানের যুগ না বলে বিজ্ঞাপনের যুগ বলাই উচিত। পথে ঘাটে, ল্যাম্পপোস্টের গায়ে, ট্রামের চূড়ায়, দেয়ালের মাথায় বিজ্ঞাপনের আজ ছড়াছড়ি। এখানে লাল আলো জ্বলছে নিভছে, ওখানে রামধনু দিয়ে ছবি আঁকা হচ্ছে, আবার ওপাশে হকারেরা গলা ফুলিয়ে চ্যাঁচাচ্ছে। খবরের কাগজের আদ্ধেকই তো বিজ্ঞাপনে ভর্তি। কোলকাতায় রাস্তার পাশে এমন কোনো দেয়াল দেখেছেন কি, যার উপর বিজ্ঞাপনের ট্যাঁকশালের ছাপ এখনও পড়ে নি? চিৎকার করে জিনিসের গুণাবলী কীর্তন করা, অথবা ওটিকয় লোককে সঙ্ সাজিয়ে নিয়ে যাওয়া তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এ যুগে বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব যে অস্বীকার করে তার অন্তর্দৃষ্টির হয়তো প্রশংসা চলতে পারে, কিন্তু তার বহির্দৃষ্টির তারিফ করতে আমি নারাজ।

বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেক লোকেরই ভুল ধারণা আছে। তাঁরা মনে করেন বিজ্ঞাপনের খরচটা মূর্খতারই নামান্তর, কারণ সেই টাকায় বেশী জিনিস তৈরী করলে লাভ হবে বেশী। তাঁরা ভুলে যান যে জিনিস তৈরী করা আর তা বিক্রী করা এক কথা নয়। আপনি হয়তো তিন হাজার টাকা দিয়ে হাজার বোতল তেল বানালেন এই ভেবে যে পাঁচটাকা করে বিক্রী করে অনায়াসে পাঁচ হাজার টাকা তুলে ফেলবেন। বাজারে ছেড়ে দেখলেন পাঁচ টাকায় কুড়িটা খদ্দেরও জোটে না। বাধ্য হয়ে দাম কমাতে লাগলেন, শেষে হয়তো একটাকা সাড়ে তিন আনা করে সব বেচে দিতে হোল। আপনি লাল না হয়ে লালবাতি জ্বাললেন। এর জায়গায় যদি বিজ্ঞাপনের জন্য কিছু খরচ করতেন তবে হয়তো প্রচুর লাভ করতে পারতেন। চাহিদা বাড়ানো হচ্ছে বিজ্ঞাপনের কাজ আর এর জন্যেই বিজ্ঞাপনের চাহিদা। চাহিদা বাড়ে দুভাবে—অনেক লোকে নতুন করে জিনিসটা কেনা শুরু করে, আবার অনেকে রামের দোকান ছেড়ে দিয়ে শ্যামের কাছ থেকে জিনিসটা কেনা শুরু করে। প্রথমটাকে আমরা বলব "লোকজোটানো" বিজ্ঞাপন, আর দ্বিতীয়টাকে "লোকভাঙানো" বিজ্ঞাপন। লোকজোটানো বিজ্ঞাপনের ব্যবহার সব ধরণের বাজারেই (market) হয়ে থাকে। কিন্তু লোকভাঙানো বিজ্ঞাপনের ব্যবহার সবচেয়ে বেশী হয় এমন সব বাজারে যেখানে অনেক লোকে মিলে একই ধরণের জিনিস বিক্রী করছে (Monopolistic Competition)। সেখানে প্রত্যেকের জিনিসের সঙ্গে অন্যের জিনিসের তফাৎ সামান্যই,—তাই বিজ্ঞাপন দিয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারলে বিক্রী বাড়বে প্রচুর।

অর্থনীতির দিক দিয়ে বিজ্ঞাপনের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হোল, তার সঠিক পরিমাণ ঠিক করা। বিজ্ঞাপনে কতটা খরচ করা হোল, তার উপরে অনেকাংশেই ব্যবসার ওঠা পড়া নির্ভর করে। বিজ্ঞাপনের অভাবে বিক্রী কম হতে পারে,— আবার বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়িতে দেনার দায়ে "ইন্‌সল্‌ভেন্সী কোর্টে" যাতায়াত শুরু করতে হতে পারে। সেইজন্যই বিজ্ঞাপনের তাকমাফিক পরিমাপটা জানা নিতান্তই দরকার। অর্থনীতিবিদেরা যে সমস্ত "ফরমূলা" বানিয়েছেন, তার একটি নিয়ে আলোচনা করা যাক্:

মনে করুন আপনি মাথার তেলের ব্যবসা করবেন—শ'খানেক টাকা খরচ করার ইচ্ছা। এই ১০০৲ টাকা আপনি নানাভাবে খরচ করতে পারেন। ৮০৲ টাকা তেল তৈরী করতে ঢেলে হয়তো ৪০ বোতল তেল তৈরী হোল। ২০৲ টাকা খরচ করলেন বিজ্ঞাপনের পিছনে। ধরুন তার ফলে ৪০ বোতল বিক্রী হল ৪৲ টাকা দরে ১৬০৲ টাকায়। আপনার লাভ হোল নগদ ৬০টি টাকা। এর বদলে ৮৫৲ টাকা তেল তৈরীতে খরচ করলে হয়তো হোত ৪২ বোতল। বিজ্ঞাপনে বাকী ১৫৲ টাকা খরচ করে বিক্রী হোল প্রতি বোতল ৩।৹ টাকা দামে। সব মিলে উঠল ১৪৭৲ — আপনার লাভ হোল মোটে ৪৭টি টাকা। ঐরকম নানাভাবে ঐ ১০০৲ টাকা খরচ করা চলে। সুবিধার জন্য কয়েকটি সম্ভাবনাকে ছকে গেঁথে ফেলা যাক; ধরে নেওয়া গেল যে ৫৲ টাকার কম খরচ বাড়ানো কমানো সম্ভব নয়।

মোট খরচ	তেল তৈরীর খরচ	বিজ্ঞাপনের খরচ	জিনিসের পরিমাণ	দাম	মোট আয়	লাভ
১০০৲	৮৫৲	১৫৲	৪২	৩।৹	১৪৭৲	৪৭৲
১০০৲	৮০৲	২০৲	৪০	৪৲	১৬০৲	৬০৲
১০০৲	৭৫৲	২৫৲	৩৮	৪।৹	১৭১৲	৭১৲
১০০৲	৭০৲	৩০৲	৩৫	৫৲	১৭৫৲	৭৫৲
১০০৲	৬৫৲	৩৫৲	৩২	৫।৹	১৬৮৲	৬৮৲

এই হিসাব থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, জিনিস তৈরী করতে ৭০৲ টাকা আর বিজ্ঞাপনে ৩০৲ টাকা খরচ করে লাভ হচ্ছে সবচেয়ে বেশী—গোটা ৭৫টি টাকা।

মোট খরচের পরিমাণটা মনে করুন এবার কমানো হোল। আপনি ঠিক করলেন যে সব মিলে ৯০ টাকা খরচ করবেন—তেল তৈরী আর বিজ্ঞাপন দেওয়া ওরই অন্তর্ভুক্ত। ১০০ টাকা খরচের যেমন একটা ছক উপরে বানানো হয়েছে, ৯০ টাকারও ঐরকম একটা ছক বানানো যেতে পারে. তাতে হয়তো দেখা গেল যে, ৬৫ টাকার জিনিস তৈরী করতে আর ২৫ টাকার বিজ্ঞাপন দিতে খরচ করে টাকা উঠছে সবচেয়ে বেশী—ধরুন ১৬০ টাকা। তাহলে ৯০ টাকা সবচেয়ে সেরাভাবে খরচ করলে ৭০ টাকা অবধি লাভ করা যেতে পারে। আবার এইভাবে হিসাব কষে দেখলেন যে ১১০ টাকা যদি খরচ করেন, তবে তার থেকে ১৯০ টাকা অবধি তুলতে পারেন। অর্থাৎ ১১০ টাকার সেরা লাভ হচ্ছে ৮০ টাকা। এই যে আলাদা আলাদা পরিমাণে খরচ করা হচ্ছে, এরও একটা তালিকা বানানো যেতে পারে।

মোট খরচ	সবচেয়ে বেশী খরচ	সবচেয়ে বেশী লাভ	জিনিসের তৈরীর খরচ	বিজ্ঞাপনের খরচ
৯০	১৬০	৭০	৬৫	২৫
১০০	১৭৫	৭৫	৭০	৩০
১১০	১৯০	৮০	৭৫	৩৫
১২০	১৯৫	৭৫	৮০	৪০

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে যখন মোট খরচ ১১০ টাকা তখন লাভ হচ্ছে সবচেয়ে বেশী। ৭৫ টাকা জিনিস তৈরীতে আর ৩৫ টাকা বিজ্ঞাপনে খরচ করে নগদ আশিটি টাকা লাভ করা যাচ্ছে। এই হচ্ছে বিজ্ঞাপনের "বাঞ্ছনীয়" (Optimum) খরচ।

এই প্রক্রিয়ায় হিসাব ঠিক করা নিয়ে নানা আপত্তি উঠেছে। একদল অর্থনীতিবিদ্‌রা দেখিয়েছেন যে ৩৫ টাকা বিজ্ঞাপনে খরচ করা হবে বললে কিছুই বলা হোল না। নানারকম বিজ্ঞাপন আছে—এক একটার এক এক রকম ফল। বিজ্ঞাপন তো আর হিন্দী সিনেমার গান নয় যে একটার সঙ্গে আরেকটার তফাৎ বের করা যাবে না। দেখে যতটা কঠিন মনে হয় আসলে কিন্তু সমস্যাটি তত বড় নয়। আমরা এতক্ষণ যে নিয়ম অনুসরণ করছি, তাতেই এর জবাব মিলবে। ৩৫ টাকার বিজ্ঞাপন বলতে আমরা বুঝিয়েছি ঐ টাকার সবচেয়ে বেশী ফলপ্রদ বিজ্ঞাপন। এমন অবস্থায় পৌঁছুতে হবে যে, কোন বিশেষ ধরণের বিজ্ঞাপনের খরচ বাড়িয়ে অন্য ধরণের পিছনে খরচ কমিয়ে এর থেকে বেশী টাকা তোলা সম্ভব নয়। তাই এ সমস্যাটির সমাধান করা খুব কিছু কঠিন বললে ভুল হবে।

আরেকটা আপত্তি উঠেছে লাভের মূল্য নিয়ে। আমরা এতক্ষণ ধরে এসেছি যে শুধু লাভ বাড়ানোই ব্যবসাদারের লক্ষ্য। কিন্তু অন্যদিকেও তার নজর রাখা দরকার। ব্যবসায় বেশী দিন টিঁকে থাকা, ঝুঁকি কমিয়ে ফেলা, সুখে দিনযাপন করা—এসব দিকেও তার নজর রাখতে হয়। তার উপর লাভ বলতে শুধু এই মুহূর্তের লাভ বোঝায় না। আজকের বিজ্ঞাপনে হয়তো মাস ছয়েক বাদে কেনা বাড়তে পারে. লোকের মনের মধ্যে ছাপ রেখে যাওয়া বিজ্ঞাপনের কাজ, আর সেই ছাপের ফলে চাহিদা যেমন এক্ষুণি বাড়তে পারে, ছমাস বাদেও তেমনি পারে। তাই আমাদের হিসেবে প্রচুর গলদের অবকাশ আছে।

এর থেকেও বড় প্রশ্ন করেছেন অনেকে। তাঁরা বলেন যে বিজ্ঞাপনের খরচ বলে আদৌ কোন আলাদা হিসাব নেই। বই বিক্রী করে যে ব্রাউন পেপারে দোকানদার সেটা মুড়ে দিল সেটাও তো একটা বিজ্ঞাপন। সাহেবী দোকানে "সেলস্‌গার্ল"টি যে ফিক করে একটু হাসল, এর মধ্যে বিজ্ঞাপনের আমেজ আছে। এমন কি কোন জিনিসকে ভাল ভাবে তৈরী করাও তো তার একটা বিজ্ঞাপন। বইয়ের চকচকে মলাট দেখে কেনার ইচ্ছা আমাদের সবারই হয় ("আন্‌কাল্‌চর্ড্‌" আখ্যা পাবার ভয়ে আমরা তা নাই বা স্বীকার করলাম)! এমন কি গল্পের বইএর গল্পটা ভাল হওয়াও তো আর একটা বিজ্ঞাপন! এই বিজ্ঞাপনের খরচ বলে আলাদ কোন হিসাব ঠিক রাখা সম্ভভ নয়। যে খরচে লোকের চাহিদা বাড়ে তাকে যদি বিজ্ঞাপনের খরচ বলি, তবে প্রায় সব খরচই বিজ্ঞাপনের খরচ।

আবার অনেকে প্রশ্ন করেছেন ব্যবসাদারকে যে আমরা এতক্ষণ সবজান্তা বলে ধরে রেখেছি, তার ভিত্তি কতটুকু? বিজ্ঞাপনে কতটা খরচ করলে কি দামে জিনিসটা বিক্রী হবে, তা সে জানবে কেমন করে? তাই তার পক্ষে ভেবেচিন্তে সেরা হিসাবটা বের করা নিতান্তই অসম্ভব।

এর থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, এতক্ষণ ধরে আমরা যে নিয়ম খাড়া করলাম তার মূল্য খুব বেশী নেই। সত্যি কথা বলতে কি, ব্যবসাদারেরা এ নিয়ম মোটেই অনুসরণ করে না। তারা দাম বা খরচ বাড়িয়ে কমিয়ে দেখে তার ফল কি হচ্ছে। এই "ট্রায়াল্‌ এণ্ড এরর্‌" পদ্ধতিতেই তাদের হিসাব ঠিক হয়। আমাদের নিয়মটার মূল্য শুধু এইখানেই যে ব্যবসাদার যদি লাভটাকে চূড়ান্ত বানাতে চায় তবে তার ঠেকে শেখার মধ্যে দিয়েই নিজের অজ্ঞাতে সে এই নিয়মটি অনুসরণ করবে

এর পরে আসা যাক্ একটা বড় প্রশ্নে—বিজ্ঞাপন থেকে সমাজের কি লাভ হয়? অনেকে বলে থাকেন যে বিজ্ঞাপনের ভিতর দিয়ে আমরা অনেক খবর পাই। কোথায় কি সিনেমা চলছে, কোন দোকানে জুতোর দাম কমেছে এসব খবর আমরা বিজ্ঞাপন মারফৎই পেয়ে থাকি। কিন্তু এর উল্টো দিকটাও আছে। বিজ্ঞাপনে খবরের থেকে "অখবর"ই আমরা বেশী পাই। বিজ্ঞাপনের কাজ নয় বিজ্ঞজনকে আপন করা—তার কাজ হচ্ছে যেন তেন প্রকারেণ লোককে ধোঁকা দিয়ে বিক্রী বাড়ানো। "নিউ সাঙ্গুভ্যালী" যে নতুন সাঙ্গুভ্যালী নয়, "ফেমাস্ সাঙ্গুভ্যালী" যে সেই প্রসিদ্ধ সাঙ্গুভ্যালীর থেকে সংযোগমুক্ত, "অরিজিনাল সাঙ্গুভ্যালী" যে আসল সাঙ্গুভ্যালী থেকে বিচ্ছিন্ন,—সেকথা অনেকেই জানেন না। বলুন তো কোলকাতায় লক্ষ্মীবাবুর সোনা ঔর চাঁদিকো অস্লি দোকান কটা আছে? বিজ্ঞাপনের বহর দেখে দ্বিগুণ দাম দিয়ে আপনি যে হাত ঘড়িটা কিনলেন, বাড়ী এসে হয়তো দেখবেন সেটা দ্বিগুণ স্পীডে চলছে। জেফারসন্ যতই বলুন না কেন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনেই একমাত্র সত্যি কথা পাওয়া যায় (Advertisements contain the only truth to be relied on in a newspaper"), আমরা জানি কল্পনাশক্তির উগ্রতার সেরা পরিচয় মেলে বিজ্ঞাপনে।

এসব আলোচনা ছেড়ে এবার ঢোকা যাক্ খাস্ অর্থনীতিতে। কেম্ব্রিজের এক অর্থনীতিবিদ্ দেখিয়েছেন যে অযোগ্য ব্যবসাদারেরাই (inefficient producers) বিজ্ঞাপনে সবচেয়ে বেশী খরচ করে। এর ফলে লোকে অযোগ্য কোম্পানীর কাছ থেকে বেশী জিনিস কেনে। ফলে, ভাল প্রতিষ্ঠানের জায়গায় খারাপ প্রতিষ্ঠানই বাড়বার বেশী সুযোগ পায়। তাই বিজ্ঞাপনে ব্যবহারে সমাজের ক্ষতির পরিমাণ, লাভের অঙ্ক থেকে অনেক বেশী।

এর উত্তরে বিজ্ঞাপনের সমর্থকেরা বলে থাকেন যে বিজ্ঞাপনের একটা ভালো দিক লোকে অনেক সময়ে বুঝতে পারে না। বিজ্ঞাপনে দেশের বেকার সমস্যার সমাধান হয়। বিজ্ঞাপন তৈরীর কাজে কিছু লোক চাকরী পায়। এই সমস্ত লোক আবার এই অর্জিত টাকার কিছু অংশ খরচ করে। যে সব জিনিস কিনতে এ টাকা খরচ হয় সে সব জিনিস তৈরীতে লাভ বাড়ে—তৈরীও বাড়ে সঙ্গে সঙ্গে। এতেও কিছু লোকের চাকরী জোটে। তারা আবার তাদের রোজগার কিছু খরচ করে। আবার কিছু নতুন লোকে চাকরী জোটে। আরা আবার তাদের রোজগার কিছু খরচ করে। আবার কিছু নুতন লোকে চাকরী পায়। এই ভাবে বেড়ে চলে চাকুরে লোকের সংখ্যা (multiplier process)।

বেকার সমস্যার আর এক ভাবেও সমাধান হতে পারে। বিজ্ঞাপনের দরুণ লোকে জিনিস কেনে বেশী—ফলে সেই সব জিনিস তৈরীও হয় বেশী। সঙ্গে বেশী লোকের চাকরীর সংস্থান হয়।

কিন্তু ব্যাপারটাকে যতটা সহজ মনে হচ্ছে আসলে তা নয়। ব্যবসাদারেরা যদি লাভ বাড়া সত্ত্বেও একজোট হয়ে ঠিক করে, জিনিস তৈরী বাড়বে না? এক্ষেত্রে বেশী জিনস কেনার ইচ্ছার ফলে জিনিসের দামই শুধু বাড়বে, আর বাড়বে ব্যবসাদারের মুনাফা—বেকার সমস্যার কোনও সমাধান হবে না। যেখানে একটি ব্যবসাদারই কোন জিনিস তৈরী করছে (monoploy), অথবা যেখানে বেশ কয়েকজন ব্যবসাদার মিলে ঠিক করেছে যে তারা একজোট হয়ে কাজ করবে (monopolistic combine), সেই সব বাজারে বিক্রী বাড়ার চেয়ে দাম বাড়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী। এই সমস্যাটি নিয়ে পুরো আলোচনা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে পড়বে,—তবে এটুকু দেখা গেছে যে সাধারণতঃ চাকরী বাড়াবার উপায় হিসাবে বিজ্ঞাপনের দান খুব সামান্যই।

আর তাছাড়া যদিই বা ধরে নিই যে "লোক জোটানো" বিজ্ঞাপনে জিনিস কেনা বাড়ে, "লোক ভাঙানো" বিজ্ঞাপনে তো আর তা হয় না। খাস্ কমড়াকামড়িতে দেশের লাভ কমই। তার উপর সত্যিই যদি অযোগ্য ব্যবসাদারেরা এতে সুবিধা পেয়ে যায়, তবে যথেষ্ট ক্ষতির আশঙ্কাই আছে।

এইজন্যেই আজ পৃথিবীর আর সব দেশেই বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে এর একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হয়েছে এই কাজের জন্য। সেখানকার বিশেষজ্ঞরা বিবেচনা করেন কোনো বিজ্ঞাপনে অন্যায়ভাবে আত্মপ্রশংসা করা হয়েছে কিনা। একবার পৃথিবীবিখ্যাত এক গুঁড়ো দুধের কোম্পানী বিজ্ঞাপন দিয়েছিল যে সারাদিনের খাটুনীর ফলে এক রকম অসুখ হয় ("Night starvation") যাতে সারারাত ঘুমের মধ্যেই জীবনীশক্তি (energy) ক্ষয় হতে থাকে। ফলে ভোর বেলাতেই ক্লান্তি বোধ হয়, পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় ফেল করে, ইত্যাদি। এ অসুখ থেকে বাঁচার একমাত্র ওষুধ ঐ গুঁড়ো দুধ খাওয়া। ডাক্তারেরা এই রকম এক নতুন অসুখের খবর পেয়ে তো অবাক্। খোঁজটোজ করে যখন বেরোল যে ঐ অসুখটি পরিপূর্ণভাবেই ঐ দুধের কোম্পানীর কল্পনাপ্রসূত, তখন ঐ ধরণের বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হোল। আরেকবার এক নামকরা সিগারেট কোম্পানী দাবী করেছিল যে ঐ সিগারেট পান করলে গলার উপকার হয়। ডাক্তারেরা এই অভিনব আবিষ্কারটিকে অবিশ্বাস করায় এই ধরণের বিজ্ঞাপনও তুলে দেওয়া হয়। আবার ধরুন পেটেন্ট ওষুধে অন্যায় প্রচারের কথা। দু মিনিটে যক্ষ্মা আরোগ্য, তিন মিনিটে হাঁপানি নীরোগ,—এ সমস্ত বিজ্ঞাপনে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কতটুকু তাতো জানাই আছে। বিলেত, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে নিয়ম করা হয়েছে যে "পেটেন্ট" ওষুধের গায়ে তার রাসায়নিক "ফরমূলা" লিখে দিতে হবে। এই রকম নানা উপায়ে অসাধু বিজ্ঞাপন বন্ধের চেষ্টা চলছে। কিন্তু এই জাতীয় দু একটা নিয়মে আর কতটুকুই বা করা সম্ভব?

ধনতান্ত্রিক দেশে যতদিন বাজার নিয়ে প্রতিযোগিতা থাকবে, ততদিন লোকভাঙানো বিজ্ঞাপন বন্ধ করা অসম্ভব। ঐ বিজ্ঞাপন বন্ধ করার চেষ্টা হলে ব্যবসায়ীদের মধ্য থেকে প্রচণ্ড প্রতিবাদ উঠবে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য হয়তো সেই প্রতিবাদ উপেক্ষা করা উচিত হবে, কিন্তু তা সম্ভব হবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যবসায়ীদের প্রতিবাদের মূল্য অনেক।

আরেকটা প্রশ্ন রইল—লোকভাঙানো বিজ্ঞাপনের সঙ্গে লোকজোটানো বিজ্ঞাপনে তফাৎ করবো কি করে? একটিকে বন্ধ করতে গেলে আরেকটিও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। "জগুবাবুর রসগোল্লা—আহা, যেন অমৃত!"—এই বিজ্ঞাপনে রসগোল্লা কেনা হয়তো অনেকে নতুন করে শুরু করতে পারে, আবার অনেকে নাশুবাবুর দোকান ছেড়ে জগুবাবুর থেকে কেনা আরম্ভ করতে পারে। তাই নিয়ম করে লোকভাঙানো বিজ্ঞাপন বন্ধ করার উপায় খুব সামান্যই। ধনতান্ত্রিক সমাজে এই বাজে খরচটুকু বাঁচাবার উপায় নেই। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অবশ্য সমস্যাটি অপেক্ষাকৃত সহজ। সরকার থেকে সেখানে কারবার চালানো হচ্ছে—তাই জনসাধারণের প্রতিনিধিরা নিজেরাই ঠিক করতে পারেন দেশের প্রয়োজনের জন্য কতটা বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত। কিন্তু ধনতন্ত্রে সেই সুযোগের অভাব স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যায়। তাই বর্তমান সমাজব্যবস্থার পক্ষে বেশ খানিকটা অন্যায় বিজ্ঞাপনকেও দরকারী বলে ধরে নিতে হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে কিছুটা বিজ্ঞাপন সমাজের পক্ষে দরকারী, আর কিছখুটা অদরকারী বাচে খরচ মাত্র। কতটা প্রয়োজনীয় আর কতটা অপ্রয়োজনীয় নির্ভর করে বাজারের অবস্থা আর সমাজের ব্যবস্থার উপর।

সেদিন দেখছিলাম এক ইংরেজ লেখক বিজ্ঞাপনকে গালাগাল দিয়েছেন "অমানুষিক" বলে। সারা পৃথিবী জুড়ে যখন লোকে খাবারের অভাবে ভুগছে, শীতে কাপড়ের অভাবে জমে যাচ্ছে, রোগে বিনা ওষুধে মারা যাচ্ছে, তখন রঙবেরঙের আলো দিয়ে মদের বিজ্ঞাপন দেওয়া তাঁর কাছে পাশবিক ঠেকেছে। তিনি বিজ্ঞাপনের ভালো দিকটা দেখতে পান নি। বিজ্ঞাপন মানুষকে দেয় সমাজচেতনা। না খেতে পেয়ে মরার সময়ে "নিয়ন্ লাইটিঙ" ডিনার এবং ভাল্সের বিজ্ঞাপন দেখে সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হওয়া যায়।

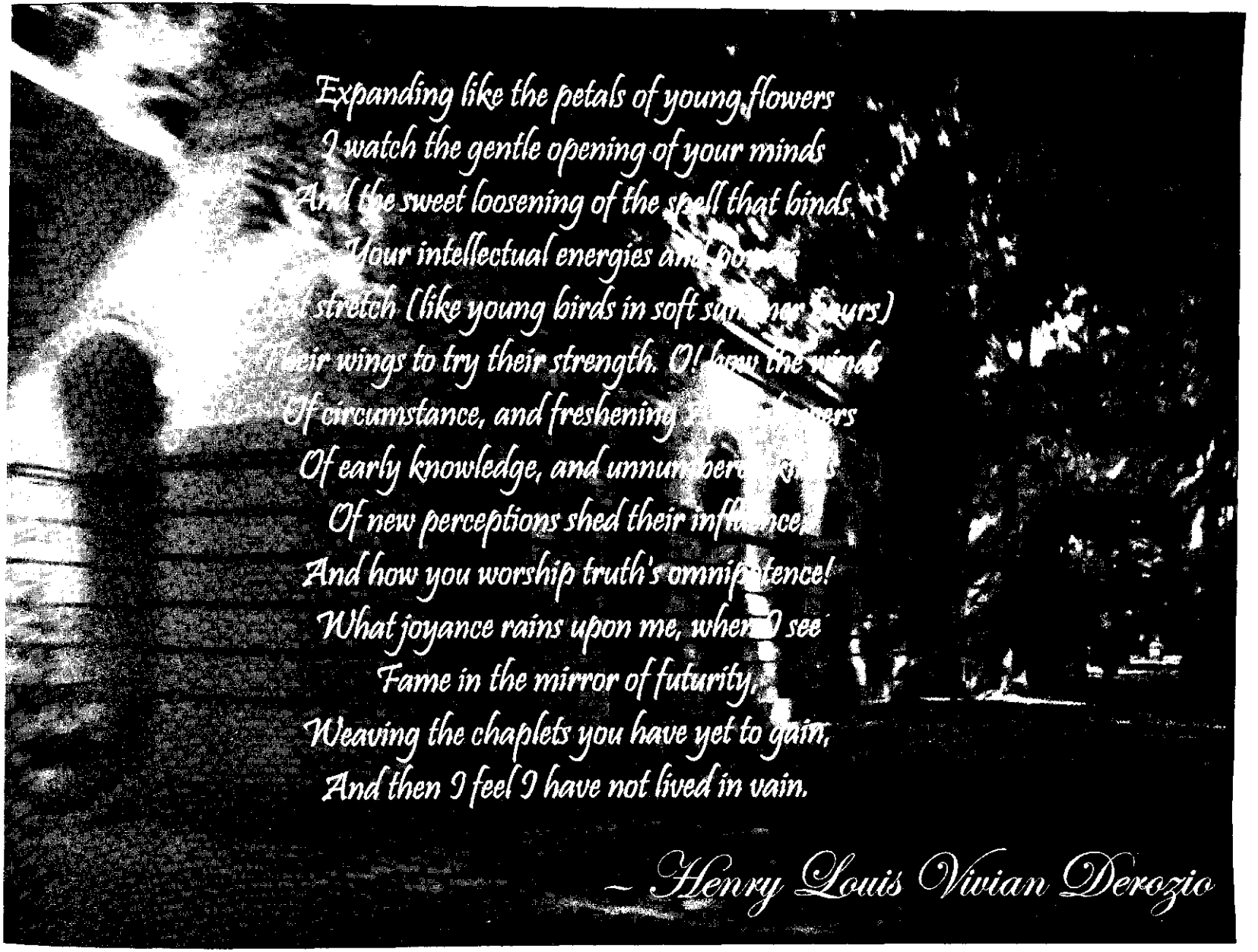
Expanding like the petals of young flowers
I watch the gentle opening of your minds
And the sweet loosening of the spell that binds
Your intellectual energies and powers
That stretch (like young birds in soft summer showers)
Their wings to try their strength. O! how the winds
Of circumstance, and freshening
Of early knowledge, and unnumbered
Of new perceptions shed their influence
And how you worship truth's omnipotence!
What joyance rains upon me, when I see
Fame in the mirror of futurity,
Weaving the chaplets you have yet to gain,
And then I feel I have not lived in vain.
– Henry Louis Vivian Derozio

জন্ম দ্বিশতবর্ষে প্রণাম...

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও

১৮ই এপ্রিল, ১৮০৯ - ২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৩১

REPRINT

Extracts from the Proceedings of the Hindu College Committee relating to the dismissal of Henry Louis Vivian Derozio

Culled by — Prof. Susobhan Chandra Sarkar

Saturday, April 23, 1831

Present :

Baboo Chundro Coomar Tagore — Governor

H. H. Wilson — Vice Presdt.

Baboo Radhamadub Banerjee

Baboo Radha Canto Deb

Baboo Ram Comul Sen

Da Hare Esqr.

Baboo Russomoy Dutt

Baboo Prasonno Coomar Tagore

Baboo Sri Kishen Sinh

Luckynarayan Mookerjeea — Secretary

Read the following Memorandum on the occasion of calling the Present Meeting.

The object of convening this meeting is the necessity of checking the growing evil and the Public alarm arising from the very unwarranted arrangement and misconduct of a certain Teacher in whom great many children have been interested who it appears has materially injured their Morals and introduced some strange system the tendency of which is destruction to their moral character and to the peace in Society.

The affair is well-known to almost everyone and need not require to be stated.

In consequence of his misunderstanding no less than 25 Pupils of respectable families have been withdrawn from the College. There are no less than 160 boys absent some of whom are supposed to be sick but many have purposed to remove unless proper remedies are adopted ....

Memoranda of the proposed rules and arrangements.

1. Mr. Derozio being the root of all evils and cause of Public alarm, should be discharged from the College, and all communications between him and the Pupils be cut off.

2. Such of the Students of the higher Class whose bad habits and practices are known and who were at the dining party shoul be removed.
3. All those Students who are publicly hostile to Hindooism and the established custom of the Country and who have proved themselves as such by their conduct, should be turned out.
4. The age of admission and the time of the College Study to be fixed 10 to 12 and 18 to 20 (sic).
5. Corporal punishment to be introduced when admonition fails for all crimes committed by the boys. This should be left at the discretion of the head Teacher.
6. Boys should not be admitted indiscriminately without previous enquiry regarding their character.
7. Whenever Europeans are procurable a preference shall be given to them in future their character and religion being ascertained before admission.
9. (sic) Boys are not allowed to remain in the College after school hours.
10. If any of the boys go to see or attend private lectures or meetings, to be dismissed.
11. Books to read and time for each study to be fixed.
12. Such books as may injure the morals should not be allowed to be brought, taught or read in the College.
13. More time for studying Persian and Bengally should be allowed to the boys.
14. The Sanskrit should be studied by the Senior Classes.
15. Monthly Stipends be granted only to those who have good character, respectable Proficiency and whose further stay in the College be considered beneficial.
16. The student wishing to get allowance must have respectable proficiency in Sanskrit and Arabic.
17. The boys transferred from the School Society's Establishment to be admitted in the usual way and not as hitherto and their posting class to be left to the head Teacher.
18. The practice of teaching boys in a doorshut room should be discontinued.

With reference to the 1 article of the above the following proposition was submitted to the meeting and pout to the Vote.

"Whether the managers had any just grounds to conclude that the moral and religious tenets of Mr. Derozio as far as ascertainable from the effects they have produced upon his Scholars are such as to render him an improper person to be intrusted with the education of youth.

Baboo Chandra Coomar stated that he knew nothing of the ill effects of Mr. Derozio's instructions except from report.

Mr. Wilson stated that he had never observed any ill effects from them and that he considered Mr. Derozio to be a teacher of superior ability.

Baboo Radha Canto Deb stated that he considered Mr. Derozio very improper person to be intrusted with the education of youth.

Baboo Russomoy Dutt stated that he knew nothing to Mr. Derozio's prejudice except from report.

Baboo Prosonno Coomar Tagore acquitted Mr. Derozio of all blame for want of proof to his disadvantage.

Baboo Radha Madub Banerjea believed him to be an improper person from the report he heard.

Baboo Ram Comul Sen concurred with Baboo Radha Canto Deb in considering him a very improper person as the teacher of youth.

Baboo Sri Kishen Sinh was firmly convinced that he was from being an improper person and Mr. Hare was of opinion that Mr. Derozio was a highly competent teacher and that his instructions have always been most beneficial.

The majority of the managers being unable from their own knowledge to pronounce upon Mr. Derozio's disqualifications as a teacher

the Committee proceeded to the consideration of the negative question.

Whether it was expedient in the present state of public feeling amongst the Hindoo community of Calcutta to dismiss Mr. Derozio from the College.

Baboos Chandra Coomar Tagore, Rudha Canto Deb, Ram Comul Sen, and Radha Madub Banerjea voted that it was necessary. Baboos Russomoy Dutt and Prasana Coomar Tagore that is was expedient and Baboo Sri Kishen Sinh that it was unnecessary. Mr. Wilson and Mr. Hare decined voting on a subject affecting the state of native feeling alone. Resolved that the measure of Mr. Derozio's dismissal be carried into effect with due consideration to his merits and services.

[Ed. Rules 5, 6, 11, 12, 19 were adopted. Rules 7, 9, 13 were adopted with modifications. Rules 2 and 15 were supposedly already in force.]

–No. 30. Letter from Mr. Derozio communicating his resignation and commenting on the Resolution of the Committee passed at the Special Meeting to dismiss him without examining the circumstances thereof and affording him time to vindicate his character from those accusations which have been fixed upon it. — 25 April.

No. 31 Letter from Ditto furnishing replies to the Queries put on him by the Vice-President as to have inculcated the following lessons. Firstly Denying the existence of God. Secondly Disrespect to Parents, & thirdly marriage with sisters. — 26 April.

[Ed Socrates was tried and sentenced to death for "Corrupting the youth"]

"Gems in bezels" — sonnets of Juvenis

Chaitali Maitra
Department of English

The Eurasian poet Henry Louis Vivian Derozio was a most promising young talent in the third decade of the nineteenth century. In the rife times of the Raj, when the Christian missionary goals were definite and defined, when Hinduism was understood more evidently in terms of orthodoxies and less so in terms of enlightenment, Derozio was a man in his own orbit, trying to induce free-thinking which could uphold the concept of spiritual illumination. As a teacher of the Hindoo College (Presidency College), he had ample means to cultivate his thoughts among the students. Although in his salad days, the endeavour to uplift the moral consciousness, without siding with any particular religion did not go without opposition and this resulted in his forced resignation from the college in 1831. His prolific literary output was only the result of his effort, after a very busy schedule which included editing and sub editing magazines like "India Gazette," Calcutta Gazette", "The Bengal Annual" and "The Kaleidoscope", apart from managing the first debating society called Academic Association, established in 1831.

Among his different types of poems, the sonnets (mostly published in "The Fakeer of Jungheera") can be grouped as the most succinct expression of his intense imagination. Sonneteering was a pronounced, contemporary practice of Bengal Renaissance and the scope of these poems allowed the poets to be forceful and terse. The sonnets of Derozio have definite diversity in themes. Some are deeply patriotic, some have been written with a particular person in mind; the more thoughtful ones are subjective, trying to deal with the themes of pain and death. "The harp of India"and "My native land" are charged with the patriotic fervour : the sonnet to Henry Meredith Parker, and the one on the Philosophy of Bacon, show his deep veneration and reverence for these meteoric personalities while about six of these poems are on death. Although Derozio is accepted in the arena of the lesser Romantics, his attitude to death, tempered by intense suffering, is able to rise above the mere mundane. Frequent classical allusions show the influence of Drummond, under whose aegis Derozio received his education from the age of six, in 1815. David Drummond was a Scotsman, who used to run the famous school Drummond's Academy in "Dhuramtalla'. The poet's introspective mind developed further as a lonely child; he lost his mother in the same year. Insult and injury sometimes found expression in his sonnets :

"Misery on misery — I soon shall be / Like Atlas with a world upon my back / My heart's almost worn out" or a painful accent like :

"Where are thy waters Lethe? I would steep/My past existence in their source .....

Death is welcomed, obviously as an agent who can release him from the sufferings of the world and promise a better life :

Death! My best friend if thou dost open the door / The gloomy entrance to a sunnier world / It boots not when my being's scene is furled/So thou canst aught like vanished bliss restore."

The influence of philosophers like Hume, Bentham and Paine was immense in the young poet's mind. The concept of enlightened self-interest, extension of individual liberty and equalization of political systems became his keynotes too; in his essay on the colonization of India by Europeans, he writes;

"Upon the whole then, we must draw the inference that colonization would not be beneficial, unless the British Legislature interferes and materielly alters the present system of Indian policy, by admitting natives and Indo-Britons to a participation of priviledges; ....

The basis of good government is as Jeremy Bentham observes, "the greatest good of the greatest number" ..... (The Kaleidoscope, September, 1829).

He was an extremely popular teacher and in his 'Conclusion of my address to my students before the Grand Vacation' in 1829, he said,

'As your knowledge increases, your moral principles will be fortified; and rectitudes of conduct will ensure happiness. My advice to you is that you go forth into the world strong in wisdom and in worth; scatter the seeds of love among mankind, seek the peace of your fellow creatures, for in their peace you will have peace yourselves.' (Thoughts on various subjects; Calcutta Literary Gazette Januray 3rd, 1835).

His confidence and fearlessness had disastrous consequences and he was charged by the vice-president of Hindoo College, Mr. H. H. Wilson as to the clamour raised for his inclinations. To his question, 'Do you believe in God?' Derozio's answer was open and straight; the same attitude to independence is seen in his sonnet 'On the philosophy of Bacon'. Derozio wrote to Wilson :

'Setting aside the narrowness of mind with which such a course might have been evinced, it would have been injurious to the mental energies and acquirements ..... I can indicate my procedure by quoting no less orthodox authority than Bacon;' If a man will begin with certainties, he shall end in doubt.' (Correspondences, April 26th, 1831)

He corroborates the same in the sonnet on Bacon :

'Man must remain/Shut from the light of Truth nor shall he see

That sacred path (where mortal cannot err/In gaining her bright temple) till he be Great Nature's servant and interpreter.'

Derozio's translation of Maupertuis also shows his preoccupation with pleasure and pain as part of human existence. Statements like :

'Misery is the sum of good that remains after deducting the good.'

'Happiness is the sum of good that remains after deducting evil.'

'In ordinary life the sum of evil exceeds that of good.'

find a more pointed expression in the sonnets :

"Human ill/Is with our nature linked eternally/Man and misfortune are twin-born — I feel

This to be true, at least 'twas so with me."

Entwined with this idea, are the moon sonnets, which evoke a sense of dreamy, soft landscape reminiscent of "Bright Star" of Keats. 'The pale light', 'the melancholy brow', 'the ceaseless gazing on the thousand showers / Of ill that inundate this world of ours' — makes the moon the 'melancholy queen' on whose cheek 'the red rose has sickened'. Finally, the moon is compared to a 'grief-struck maiden',

'who has heard revealed/To all the world that which she wished concealed—

Her trusting Love's and hapless Frailty's tale'.

The poet, teacher and journalist Derozio took the pseudonym Juvenis which pertains to youth and its similar attributes. He has also been compared to the stormy petrel — the smallest, web-footed bird who hardly touches the land except for laying eggs. Derozio's life was too short for his promising voyage through the troubled, colonized and orthodox India. The clarity and enlightenment of his mind is clearly in evidence in spite of his premature death. Remembering the lines on the grave stone of this prodigy would be a fitting close :

"We look around/But vainly look for those who formed a part/Of us as we of them and when we wore/Like gems in bezels, in the heart's deep core."

।। অবিস্মরণীয় হেন্‌রি ডিরোজিও ।।

স্বপনকুমার দে

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

হেন্‌রি ডিরোজিও। পুরো নাম — হেন্‌রি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (Derozio, Henry Louis Vivian — 18 April 1809 – 26 December 1831)। স্মৃতি বিস্মৃতির বাইরে, ভালো লাগা মন্দ লাগার বাইরে এখন তাঁর অবস্থান। এ বছর তাঁর জন্ম-দ্বিশতবর্ষ। গভীর তাৎপর্যময় এই জন্ম-দ্বিশতবর্ষ। নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নানাভাবে তাঁকে স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানানো হবে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবে, যদি সেই তরুণ-য়ুরেশিয় শিক্ষক-কবির বৌদ্ধিক জিজ্ঞাসা, আদর্শ, সততাকে আমাদের জীবনে, আমাদের মননে, আমাদের হৃদয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারি। ..... আর তা না হলে অর্থহীন হয়ে পড়বে সেইসব স্মরণ-অনুষ্ঠান।

এখন থেকে দুশো বছর আগে হেন্‌রি ডিরোজিও এসেছিলেন পৃথিবীর আলোয়। জন্মেছিলেন কলকাতার মৌলালির দরগা সন্নিহিত স্থানে (১৫৫, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড) ১৮ এপ্রিল ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে। ডিরোজিও-র পৈত্রিক বাড়িটি একাধিকবার হস্তান্তরিত হয় এবং এটি ভেঙে ফেলা হয় ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে। সেই জায়গায় 'মিনার' নামে চিহ্নিত বাড়িটি নির্মিত হয়।[১]

ডিরোজিও-র বাবার নাম ছিল — ফ্রান্‌সিস্‌ ডিরোজিও (Derozio, Francis — 07 September 1779-26 November 1830)। তিনি James Scott and Co. নামে কলকাতার এক সওদাগরি অফিসে চাকরি করতেন। তাঁর কাজ ছিল হিসেব রক্ষকের। কিন্তু তিনি বিদ্যানুরাগী ছিলেন।

হেন্‌রি ডিরোজিও-র পরিবার যে পর্তুগীজ বংশোৎপন্ন তা নিশ্চিতভাবে অনুমান করা যায়। 'ডি' (D) এই অনুমানের দ্যোতক। দীর্ঘকাল (প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে) এদেশে বসবাস করার জন্যে এ দেশীয় এবং ভারতে প্রবাসী কোনো কোনো য়ুরোপীদের সঙ্গে বিবাহ-সূত্রে এঁদের আত্মীয়তা গড়ে ওঠে। ..... ডিরোজিও-র বাবার দুই বিয়ে। ডিরোজিও র মা সোফিয়া জনসন (Sophia Johnson — ? - Before 21 January 1816)। ফ্রান্‌সিসের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল ১১ অক্টোবর ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ইংরেজ ছিলেন। ২১ জানুয়ারির আগে ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। এই বছরেই ১১ মে ফ্রান্‌সিস্‌ আনা মারিয়া রিভার্স (Anna Maria Revers —? — 30 November 1851) নামে এক বিদুষী ইংরেজ মহিলাকে বিয়ে করেন।

ফ্রান্‌সিসের প্রথম পক্ষের সন্তান হেন্‌রি ডিরোজিও। ডিরোজিও-র আরও দুই ভাই ও দুই বোন ছিল। তাঁর দাদা ফ্রাঙ্ক (Frank – 1807-1828) কুসঙ্গে বিপথগামী হয়েছিল। ছোটো ভাই ক্লডিয়স (Claudius Gilbert Ashmore — 1814-136) উচ্চ-শিক্ষার জন্যে স্কটল্যাণ্ডে গিয়েছিল। বড়ো বোন সোফিয়া (Sophia — 1810-1827) ১৭ বছর বয়সে মারা যায়। ছোটো বোন এমিলিয়ার (Amelia — 1813-1835) সঙ্গে আর্থার ডিরোজিও জনসন (A. D. Johnson)-এর বিয়ে হয় শ্রীরামপুরে ২৫ অক্টোবর ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে। আর্থার জনসন রাজপুতানাতে কোটার মহারাজের শিক্ষক নিযুক্ত হন। আর্থার এমিলিয়ার একমাত্র সন্তান অ্যালেন এমিলিয়া মারি (Ellen Amelia Mary) মাত্র সাত মাস বেঁচে ছিল। কোটাতে এমিলিয়ার মৃত্যু হয় ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে। ফ্রান্‌সিসের ছেলেমেয়েরা কেউই দীর্ঘজীবী ছিল না। ..... ৩০ নভেম্বর ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে ডিরোজিও-র সৎমা-র মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পরিবারের অবসান ঘটে।[২]

(২)

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে হেন্‌রি ডিরোজিও-র জন্ম। তাঁর ব্যক্তিমানস রচনায় পরিবারের চেয়ে বাইরের প্রভাব অধিকতর সক্রিয় ছিল — একথা আর অজানা নয়। ..... তাঁর জীবনের আসল ভিত্তি ছিল ইস্কুল। ডেভিড ড্রামণ্ড (David Drummond — 1787-1843)-এর 'ধর্মতলা আকাদেমি' (Durrumtollah Academy)-তে তিনি ছয় বছর থেকে চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত (১৮২৩ খ্রিস্টাব্দ) পড়াশুনো করেন। এখানকার শিক্ষার বিষয় থেকে শিক্ষা পদ্ধতি সবই ছিল বেশ অভিনব; অভিনব ছিল পরীক্ষা-ব্যবস্থাও। সব মিলিয়ে ডিরোজিও শৈশব থেকেই সান্নিধ্য পেয়েছিলেন এমন এক প্রতিষ্ঠানের, এমন এক ব্যক্তিত্বের, যেখানে এবং যাঁর পরতে পরতে নতুনের স্বীকৃতি, প্রচলনের বাইরে যাবার আহ্বান — বাঁধা পথ ছেড়ে অন্য কিছু সৃষ্টি করার প্রেরণা।

কে এই ডেভিড ড্রামণ্ড? তাঁর একটু পরিচয় নেওয়া যেতে পারে এখানে।

ডেভিড ড্রামণ্ড জন্মেছিলেন স্কটল্যাণ্ডে। তাঁর বাবা খ্রিস্টান ধর্মযাজক ছিলেন। ডেভিড কলকাতায় আসেন ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে। ধর্মবিষয়ে আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় তিনি চিরদিনের জন্যে স্কটল্যাণ্ড ছেড়ে এদেশে চলে আসেন। একদিকে তিনি ছিলেন উদ্ধত, অনমনীয় স্বভাবের মানুষ, আর অন্যদিকে দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর পড়াশুনো ছিল সীমাহীন। কয়েকজন শিক্ষানুরাগী বন্ধুর সাহায্যে ধর্মতলা স্ট্রীট (অধুনা লেলিন সরণি) ও হস্‌পিটাল লেনের সংযোগস্থলে 'ধর্মতলা আকাদেমি' প্রতিষ্ঠা করেন। পিঠের ওপর কুঁজ থাকায় তিনি 'কুঁজো স্কচম্যান' নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু মনের ঐশ্বর্যে তিনি তাঁর দৈহিক বিকৃতিকে ঢেকে দিতে পেরেছিলেন। ....

ব্যক্তিগত জীবনে ডেভিড ড্রামণ্ড স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল ছিলেন। ব্যক্তিজীবনে সুখ ও আনন্দ উপভোগের জন্যে বিলাসী জীবনযাপনকে অসঙ্গত বলে মনে করতেন না। তাঁর কাছে ঈশ্বরচিন্তার চেয়ে মানবচিন্তাই বড়ো ছিল। ..... দার্শনিক ডেভিড হিউম (David Hume — 1711-1776) এবং কবি রবার্ট বার্নস (Robert Burns — 1759-1796)-এর রচনায় প্রভাবিত ড্রামণ্ড অনুভব করেছিলেন যে, যুক্তি ও স্বচ্ছ বিবেক মানুষের ঐহিক সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা সবকিছুরই নিয়ামক এবং যত দোষ-ত্রুটি থাকুক না কেন, মানুষ শেষ পর্যন্ত মানুষই। যে স্বাধীনতা ও স্বাধিকার চেতনার অভিঘাতে ফরাসি বিপ্লবের অভ্যুদয় (French Revolution — 1789), সেই স্বাধীন চিন্তা তাঁর মনে প্রবলভাবে সক্রিয় ছিল। ড্রামণ্ড যেসময় ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন সেসময় ইংরেজরা তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁদের আশঙ্কা ছিল ড্রামণ্ডের আকাদেমিতে পড়লে ছাত্ররা নাস্তিক হয়ে যাবে। তবুও ড্রামণ্ডের আকাদেমিতে ছাত্রাভাব ঘটেনি।[৫]

আকাদেমির বাইরেও ড্রামণ্ডের বাড়িতে সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বৈঠকগুলি কম আকর্ষক ছিল না। তাঁর গুণমুগ্ধ 'Calcutta Journal'-এর সম্পাদক স্যাণ্ডফোর্ট আর্নট (Sandfort Arnt) তাঁর লেখা 'হিন্দুস্থানী গ্রামার' ড্রামণ্ডকে উৎসর্গ করেছিলেন।[৬] উপনিবেশ ভারতবর্ষের রাজকীয় বিলাসিতার পঙ্কস্রোতে ড্রামণ্ডের জ্ঞানস্পৃহা ডুবে যায় নি। 'D.D.' নাম দিয়ে সেকালের অনেক পত্র-পত্রিকায় তাঁর বহু কবিতাও প্রকাশিত হয়েছিল।

সাংবাদিক হিসেবে ড্রামণ্ড খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি 'Weekly Examiner — A Journal of Politics, News and Literature' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রায় দু'বছর প্রকাশ করেছিলেন।

ড্রামণ্ডের 'ধর্মতলা আকাদেমি'তে পড়বার সময় ডিরোজিও এদেশীয়দের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হন। শৈশব ও কৈশোরের শিক্ষার গুণেই ডিরোজিও খুব সহজেই হিন্দু ছাত্রদের আপন করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। যে যুক্তিবাদ, মানবিক মূল্যবোধ এবং সংস্কার-মুক্ত চিন্তা-চেতনা হেনরি ডিরোজিও-র জীবনের মুখ্য আদর্শ ছিল সেগুলি অনেক পরিমাণে ডেভিড ড্রামণ্ডের উত্তরাধিকারের ঐশ্বর্য।

ইয়াংবেঙ্গল গোষ্ঠীর স্রষ্টা ডিরোজিও-র ছাত্রজীবন ছিল উজ্জ্বল। ..... বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরেজি আবৃত্তি, পাঠ, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে প্রায়ই প্রথম হতেন। .... ৩ জানুয়ারি ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে Govt. Gazette-এ 'ধর্মতলা আকাদেমি'র একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। তাতে হেনরি ডিরোজিও-র পুরস্কারপ্রাপ্তির উল্লেখ রয়েছে। তিনি পেয়েছিলেন 'Walker's Elocution'। অন্য দু'জন বাঙালি ছাত্রেরও পুরস্কার প্রাপ্তির উল্লেখ আছে। তাঁরা হলেন— হরচন্দ্র দাস Simpson's Euclid; শম্ভুচন্দ্র দাস — রৌপ্য পদক।[৭]

এ সম্পর্কে যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন :

"এই সময়ের সংবাদপত্রের ধর্মতলা অ্যাকাডেমির বিজ্ঞপ্তি বাহির হইত। ইহার দুইটি আমি দেখিতে পাইয়াছি। একটি বাহির হয় ২৫ ডিসেম্বর ১৮১৭ তারিখের 'দি ক্যালকাটা গেজেটে', দ্বিতীয়টি বাহির হয় ৩১ ডিসেম্বর ১৮১৮ তারিখের 'দি গভর্মেন্ট গেজেটে'। দুইটিতেই ডিরোজিওর কৃতিত্ব যথাক্রমে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে,—

"Henry Derozio — First in Recitation, Reading, Geograpy and general extraordinary acquirements at 8 years of age. — A Gold Medal"

"Henry Derozio — First Reader in the School and remarkable powers in recitation, etc. (9 year of age). — Walker's Elocution (Prize)"

সে যুগের স্কুলগুলির বার্ষিক পরীক্ষা বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইত। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা, এমন কি সংবাদপত্রের সম্পাদকগণও পরীক্ষা দর্শন করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইতেন। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের ২০-এ ডিসেম্বর এইরূপ একটি পরীক্ষায় 'ইণ্ডিয়া গেজেট' সংবাদপত্রের সম্পাদক বিখ্যাত ডক্টর জন গ্রাণ্ট উপস্থিত ছিলেন। ইনি পরে ডিরোজিওর একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। ....."[৮]

ডেভিড ড্রামণ্ডের শিক্ষায় ও সাহচর্যে ডিরোজিও নব্যযুগের ন্যায়দর্শনে (Ethics) দীক্ষিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বিচারবুদ্ধি ও যুক্তির আলোকে তিনি সমাজ ও জীবনকে দেখেছেন এবং নিজের ছাত্রদেরও সেই পথে পরিচালিত করেছেন।

(৩)

১৮২২ খ্রিস্টাব্দ। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে ডিরোজিও তাঁর বাবার মার্চেন্ট অফিসে ক্লার্কের চাকরি করতে শুরু করেন। প্রায় এক বছর কাজ করার পর তিনি নিজের পিসেমশাই (মামাও) নীলকর আর্থার জনসন (A. Johnson)-এর ভাগলপুরের কাছে তারাপুরের বাড়িতে যান। ডিরোজিও সেখানে তিন বছর ছিলেন। ভাগলপুর অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁর কিশোর মনকে মুগ্ধ করে। সেখানকার মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশেই তিনি কাহিনীকাব্য 'The Fukeer of Jungheera : A Metrical Tale and Other Poems' (Baptist Mission Press, Calcutta). লেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। দুই সর্গে বিভক্ত এই কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ হয় ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে। ... এই কাব্যের কাহিনীর সূত্রপাত হয়েছে একটি সতীদাহের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। কাহিনীর শুরু এভাবে :

স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন দিয়ে 'সতী' হবার জন্যে শ্মশানভূমিতে আনা হয়েছে সদ্যোবিধবা ব্রাহ্মণ-তরুণী নলিনীকে। সেই অবস্থায় নলিনী ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে — একদিকে ধর্মবিশ্বাসের সর্বগ্রাসী সংস্কার আর অন্যদিকে তীব্র জীবনতৃষ্ণা। ধর্মীয় সংস্কারে বিহ্বল হয়ে শেষ পর্যন্ত নলিনী স্বামীর সাজানো চিতায় উঠে বসে সূর্যবন্দনা করতে শুরু করে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তার বাল্যপ্রেমিক — এক মুসলিম যুবক — প্রেমে ব্যর্থ হয়ে দস্যু সর্দারে পরিণত হয়েছে — সেখানে এসে পৌঁছয় সদলবলে। নলিনীকে প্রায় অনিবার্য মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়ে সে ঘর বাঁধে জঙ্গিরা পাহাড়ের গহন বনে। .....

দ্বিতীয় সর্গে আছে : রাজমহলের নবাবশাহ সুজা নলিনীর ক্ষুব্ধ আত্মীয়বর্গের অনুরোধে সাড়া দিয়ে দস্যুদলকে ধরবার জন্যে সৈন্যবাহিনীকে নিয়োগ করেছেন। নবাবী সৈন্যের আক্রমণে নলিনী আর তার প্রেমিকের সুখের নীড় ভেঙে যায়। যুদ্ধের শেষে দেখা যায় যে, নবাবের বাহিনীও যেমন ছত্রখান হয়ে গিয়েছে — তেমনি আবার দুই তরুণ-তরুণী — দস্যু সর্দার আর নলিনীরও ঘটেছে জীবনাবসান। যুদ্ধক্ষেত্রের একধারে প্রাণহীন দেহ দুটি পড়ে রয়েছে নিবিড় আশ্লেষে আবদ্ধ হয়ে। ...

যুগ যখন যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠে তখন কবিকণ্ঠে সেই যুগের যন্ত্রণা এবং বেদনা ধ্বনিত হয়। ডিরোজিও-র কণ্ঠে আমরা সেই যুগেরই ধ্বনি শুনেছি। গভীর মমতাবোধ এবং তীব্র সহানুভূতি ছিল বলেই একরকম কাব্য লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল ..... সতীদাহের যৌক্তিকতা নিয়ে কবি প্রশ্ন করেছেন :

"Think'st thou she dreams of love, and for whom?
The parted dead whose home should be the tomb?'

'The Fukeer of Jungeera' কাব্যের গল্পটা থেকেই বোঝা যায় কী বিষম বৈপ্লবিক এই আখ্যানকাব্য — সে যুগের পক্ষে তো বটেই, এমনকি পরবর্তী যুগেও এর আবেদন ফুরিয়ে যায় নি।

ডিরোজিও তাঁর এই কাব্য সম্পর্কে বলেছেন :

"Although I once lived nearly three years in the vicinity of Jungheera, I had but one opportunity of seeing that beautiful and truly romantic spot."[৭]

শহর কলকাতায় ডিরোজিও স্বদেশের যে রূপ দেখেছিলেন, তারাপুরে গিয়ে তিনি স্বদেশের আর এক অভিনব রূপ দেখলেন। তিনি যেন এক নতুন দেশের সন্ধান পেলেন। ভাগলপুরেই তাঁর কবি-প্রতিভার প্রকৃত উন্মেষ হয়। তারাপুরে বাসের সময়েই তিনি India Gazette'-এর সম্পাদক ড. জন গ্রান্টের (Dr. John Grant 1794-1862) কাছে কবিতা লিখে পাঠাতেন ইংরেজিতে। কবিতাগুলি সামান্য পরিমার্জিত হয়ে India Gazette-এ ছাপা হতো। উল্লেখ্য, 'জুভেনিস' (Juvenis) ছদ্মনামে ডিরোজিও এই কবিতাগুলি লিখতেন। ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে সাতচল্লিশটি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'Poems' (Baptist Mission Press, Calcutta)।

এই সময়ে লেখা ডিরোজিও-র একটি কবিতা[৮] এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

GOOD NIGHT

Good Night! — Well then, good night to thee,
In peace thine eyelids close;
May dreams of future happiness
Illume thy soft repose!

I've that within which knows no rest,
Sleep comes to me in vain;
My dreams are dark — I never more
Shall pass good night again.

ডিরোজিও অজস্র রোমান্টিক কবিতা লিখছেন। তাঁর কিছু প্রেমের কবিতাও আছে। লিখেছেন দেশপ্রেম-মূলক কবিতা আবার অনুবাদও করেছেন হাফিজের (মহম্মদ শামসুদ্দীন হাফিজ) লেখা কবিতা।

কবিতা প্রধানত আবেগ-প্রধান সৃষ্টি। কিন্তু আবেগের অতি উচ্ছ্বাস অনেক সময় কবিতার সৌন্দর্যকে ব্যাহত করে। ডিরোজিও-র আবেগ প্রধানত সংযত, কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় হয়তো বা মাত্রাতিরিক্ত হয়ে পড়েছে। তবে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে ডিরোজিও-র কবিতাগুলিতে আবেগের বাহুল্য থাকলেও তার কাব্য-সৌন্দর্যকে ব্যাহত করেনি। তিনি হয়তো লর্ড বায়রন (George Gordon Byron — 1788-1824), পি. বি. শেলি (Percy Bysshe Shelley — 1792-1822) কিংবা জন কীটস (John Keats — 1795-1821)-এর সমপর্যায়ের কবি নন — কিন্তু তিনি মহৎ কবি এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই।

(৪)

ড. জন গ্রান্ট 'India Gazette'-এর সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব দিয়ে ডিরোজিও-কে ভাগলপুর থেকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। ডিরোজিও-র ঝড়ো জীবনে ড. গ্রান্টের ভূমিকা কম ছিল না। কলকাতায় ইংরেজি শিক্ষিত সমাজে তিনিই ডিরোজিও-কে পরিচিত করে দিয়েছিলেন।

১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে হেনরি ডিরোজিও হিন্দু কলেজ (Hindoo College)-এ চতুর্থ শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। 'সমাচার দর্পণ'-এ এই বিষয়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল :

"ইংরাজী পাঠশালায় ডিয়রম্যান নামক একজন গোরা আর ডিরোজী সাহেব এই দুইজন নতুন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। ...."[৩]

২০ জানুয়ারি ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। ২৩ জানুয়ারি ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে 'Govt Gazette'-এ লেখা হয়েছিল :

"On monday the 20th instant the school of this Institution was opened at 10 O'clock. Before 11 all the scholars were assembled to the number of 20, which is more than expected. They were dismissed at past ....."

হিন্দু কলেজে তখন জুনিয়ার ও সীনিয়ার এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। জুনিয়ার বিভাগ পাঠশাল আর সিনিয়ার বিভাগ মহাপাঠশালা নামে অভিহিত ছিল। জুনিয়ার বিভাগ, অর্থাৎ Primary or Preparatory School-এ ল্যাঙ্কাস্টারি পদ্ধতিতে (Lancasterian Plan) শিক্ষাদান করা হতো। ৪ জুলাই ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে 'Govt. Gazette' লিখেছিল :

"The plan for Hindoo college is, we understand, in considerable progress ..... In the primary school the pupil is to be instructed according to the Lancasterian plan in reading and writing English, and in copying."

ডিরোজিও হিন্দু কলেজে শিক্ষক নিযুক্ত হলে তাঁকে প্রথম শ্রেণি ছাড়া অন্যান্য শ্রেণিতেও পড়াতে হতো। Committee of Management তাঁর জন্যে নিম্নলিখিত পাঠ্যসূচি[৪] প্রস্তুত করেছিলেন—

Goldsmith's History of Greece, Rome and England.
Russell's Modern Europe.
Robertson's Charles the Fifth.
Gray's Fables.
Pope's Homer's Iliad and Odyssey.
Dryden's Virgil.
Milton's Paradise Lost.
Shakespeare, One of the Yragedis.

তরুণ শিক্ষক হেনরি ডিরোজিও নিজের শ্রেণি ছাড়াও অন্যান্য শ্রেণির ছাত্রদের প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছিলেন। তারা তাঁর অমায়িক ব্যবহারে আকৃষ্ট হয় এবং তাঁকে বন্ধু হিসেবে

গ্রহণ করে। ইস্কুলের ছুটির পর ছাত্রদের সঙ্গে তিনি নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। ..... তাঁর আলোচনার পদ্ধতি ছিল যে, তিনি একপক্ষ অবলম্বন করে ছাত্রদের অন্যপক্ষ অবলম্বন করতে উৎসাহিত করতেন। এভাবে ছাত্রদের তর্ক-বিতর্ক করার শক্তি বিকশিত হতো। উচ্চশ্রেণির ছাত্ররাও নিম্নশ্রেণিতে তাঁর পড়ানো শোনার জন্যে ভিড় করত। শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-১৮৯০), রাধানাথ সিকদার (১৮১৩-১৮৭০), রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-১৮৯৮), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩), দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-১৮৭৮), রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-১৮৬৮) প্রমুখরা তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্র ছিলেন। হরচন্দ্র ঘোষ (১৮০৮-১৮৬৮), রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-১৮৫৮), কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫) প্রমুখরা পড়াশোনার জন্যে তাঁর ক্লাসে যেতেন। ছাত্রদের নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে তিনি তাদের নিজের মা ও বোনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন। .....[১১]

রাধানাথ শিকদার তাঁর ইংরেজি আত্মজীবনীতে এ মর্মে লিখেছেন :

"ডিরোজিও দয়ালু এবং স্নেহপরায়ণ শিক্ষক ছিলেন। বিদ্যাবত্তার অভিমান করিলেও তিনি সুবিদ্বান ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদিগকে উপদেশ দিতেন। এ শিক্ষা অমূল্য। তাঁহার শিক্ষাগুণে সাহিত্যিক যশের আকাঙ্ক্ষা আমার মনে এমনভাবে বদ্ধমূল হইয়াছে যে, আজও তাহা আমার সকল কর্ম নিয়ন্ত্রিত এবং আমাকে অনুপ্রাণিত করিতেছে। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে আমি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করি। তাঁহার নিকট হইতে এরূপ কতকগুলি উদার ও নীতিমূলক ধারণা লাভ করিয়াছি, যাহা চিরকাল আমার কার্যকে প্রভাবিত করিবে। বড়ই দুঃখের বিষয়, উন্নতির নানা জল্পনা-কল্পনার মধ্যে যৌবনে পদার্পণ করিতেই মৃত্যু তাঁহাকে অপসারিত করিয়াছে। নিশ্চিত বলিতে পারি যে, সত্যানুসন্ধিৎসা ও পাপের প্রতি ঘৃণা — যাহা সমাজের শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে আজ এত অধিক পরিমাণে দেখা যায় — এ সকলের মূলে ছিলেন একমাত্র তিনিই। ...." (আর্যদর্শন, কার্ত্তিক, ১৮৯১)[১২]

শিক্ষক হিসেবে ডিরোজিও-র সার্থকতা কিংবদন্তিতে পরিণত। তার কারণ — যা জানা যায়, তিনি পুথিগত বিদ্যাতেই তাঁর ছাত্রদের জীবন শেষ করে দিতে চাননি; যুক্তির আলোকে তিনি তাদের জীবন ও জগৎকে যাচাই করতে শিখিয়েছেন। একথা ঠিক, গতানুগতিক শিক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন করে হেন্‌রি ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের মনের সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি দূর করতে পারতেন না। ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তার উপযোগী করে তিনি তাদের মানুষের জীবনের সবচেয়ে যে মহৎ শিক্ষা, সত্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা এবং অন্যায় ও অসত্যের প্রতি অপরিসীম ঘৃণাকে জাগরিত করেছিলেন। আর এইখানেই তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র।

হিন্দু কলেজের অন্যান্য অনেক শিক্ষকের তাঁর চেয়ে পাণ্ডিত্য ও কর্মদক্ষতা হয়তো ছিল, কিন্তু তাঁদের প্রতিভার যাদুকরি স্পর্শ ছিল না; সেজন্যে তাঁরা ছিলেন গতানুগতিক। যুগে যুগে ব্যতিক্রমের প্রতি মানুষের আক্রোশ তৈরি হয়, স্বাতন্ত্র্যকে মানুষ সহ্য করতে পারে না। তাই হেন্‌রি ডিরোজিও-র শিক্ষা পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে কলেজের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রবল ঝড় উঠেছিল। .....[১৩]

(৫)

যুক্তিবাদী জীবনাদর্শে ও বস্তুবাদী জীবনদর্শনে অঙ্গীকারবদ্ধ হেন্‌রি ডিরোজিও ইমানুয়েল কান্ট (Imanuel Kant — 1724-1804)-এর দর্শনের ওপর Objections to the Philosophy of Emanuel Kant' নামে একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধের মূল্যায়নে বিশপ কলেজের Principal W.H. Mill বলেছেন :

"..... the objections which Derozio published to the philosophy of Kant were perfectly original, and displayed powers of reasoning and observation which wouldn't disgrace even gifted philosophers."[১৪] ডিরোজিও-র এই বস্তুবাদী চেতনাটি ছাত্রদের মনে সঞ্চারিত হয়েছিল।

"..... শুধু কলেজের সময়টুকু যে ডিরোজিও ছেলেদের পড়াইতেন তাহা নহে, ছুটির পর কলেজ-গৃহে বসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনাও করিতেন; তাঁহার গৃহেও মধ্যে মধ্যে আলোচনা-বৈঠক বসিত। এই আলোচনা-বৈঠকই ক্রমে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন বা ইন্‌স্টিটিউশনে পরিণত হয়। এ সম্বন্ধে প্যারীচাঁদ হেয়ার জীবনীতে লেখেন :

"It was at last proposed to establish, in 1828 or 1829, a debating club, called the academic association, at the house now occupied by the Wards' Institution."

অর্থাৎ এইসব আলাপ-আলোচনা অধ্যয়ন অনুধ্যানের ফলে ১৮২৮ কি ১৮২৯ সনে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন নামীয় বিতর্ক-সভা স্থাপিত হয়।"[১৫]

হেন্‌রি ডিরোজিও এই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং উমাচরণ বসু এর সম্পাদক হলেন। এক বছরের মধ্যে অ্যাসোসিয়েশনের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। প্রথমে এই সভা বসত লোয়ার সারকুলার রোডে ডিরোজিও-র নিজের বাড়িতে। পরে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মানিকতলার বাগানবাড়িতে ওই সভা উঠে যায়। কলেজের উচ্চশ্রেণির ছাত্রগণ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য শ্রেণিভুক্ত ছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র স্বয়ং এর সদস্য ছিলেন। আরও কয়েকজন বিশেষ সদস্যের নাম তিনি এরূপ দিয়েছেন : কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়,

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, মাধবচন্দ্র মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব প্রমুখ। ডেভিড হেয়ার (David Hare — 1775-1842) নিয়মিতভাবে সভার অধিবেশনগুলিতে আসতেন. ..... ডিরোজিও সভার কাজ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করতেন।

সপ্তাহে সপ্তাহে কাব্য, ইতিহাস, দর্শনাদি আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও সমাজমূলক নানারকম প্রশ্ন, যেমন— স্বদেশপ্রেম, পাপপুণ্য, সত্যবাদিতা, ঈশ্বরের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা হতো। ডিরোজিও ছাত্রদের পঠনীয় বইপত্রের কথা বলে দিতেন। ছাত্ররা সেইসব বইপত্র পড়ে প্রবন্ধ লিখে পড়তেন অথবা আলোচনায় অংশ নিতেন। হিন্দু কলেজের ক্লাসের মতো এখানে তিনি ছাত্রদের যুক্তিভিত্তিক আলোচনায় উৎসাহ দিতেন।

'আকাদেমিক অ্যাসোসিয়েশনে'র সাপ্তাহিক আলোচনা সভাগুলির ভূমিকা নিঃসন্দেহে ফলপ্রসূ হয়েছিল। ডিরোজি-র ছাত্ররা সত্যমিথ্যাকে যুক্তি দিয়ে বিচার করতে শিখেছিলেন। তাঁরা শুধু হিন্দু ধর্মের নয়, অন্যান্য ধর্মেরও নানা অসঙ্গতি এবং শাস্ত্র-তন্ত্র-মন্ত্রের মানুষ ও মনুষ্যত্ব বিরোধী বহু বিধানকে বর্জন করে নায়সঙ্গত সমাজ গড়ার কথা ভেবেছিলেন।

ডিরোজিও-র মৃত্যুর পর রেভারেণ্ড লালবিহারী দে (Rev. Lal Behary Dey) কলকাতায় এসেছিলেন। কলকাতা সে সময় ইয়ং বেঙ্গল পন্থীদের ভাবনাচিন্তায় আলোড়িত। তিনি এ সম্পর্কে লিখেছেন :

"The general tone of the discussions was a decided revolt against religious institutions. .... The young lions of the Academy roared out, week after week, 'Down with Hindusim! Down with orthodoxy."[১৪]

'আকাদেমিক অ্যাসোসিয়েশন'-এর ছাত্রদের মনোভাব হিন্দু কলেজের অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। প্রবীণ ও নবীনদের মধ্যে বিরোধ ঘনীভূত হয়। কলেজের ছাত্ররা উপনয়নে অস্বীকৃত হলো। সন্ধ্যা-আহ্নিক তাঁদের কাছে সময়ের অপব্যয় বলে মনে হলো, ঠাকুরঘরে ঢুকে তাঁরা মন্ত্র পড়ার বদলে ইলিয়াদ, শেক্সপিয়ার থেকে আবৃত্তি করতে শুরু করলেন, শুধু তাই নয়, মুসলমানের জল মুখে দেওয়া, গোমাংস খাবার কথা সগৌরবে ঘোষণা করা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। .....

(৬)

কলকাতার সমাজ মানস যে সময় সংস্কার আন্দোলন আর সংস্কার বিমুখ আন্দোলনে আলোড়িত ঠিক সে সময়ে খ্রিস্টান মিশনারি আলেকজাণ্ডার ডাফ (Rev. Alexander Duff — 1805-1878) কলকাতায় পৌঁছলেন। রামমোহন রায় (১৭৭৪?-১৮৩৩)-এর সহযোগিতায় ডাফ তিন মাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করলেন 'জেনারেল অ্যাসেম্বলিস ইনস্টিটিউশন' (General Assembly's Institution—13 July 1830)। হিন্দু কলেজের তরুণ সম্প্রদায়, বিশেষ করে ডিরোজিও-র ছাত্রদের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের সম্ভাবনা বিবেচনা করে ডাফ কলেজের কাছাকাছি বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন। সেই বাড়ির একতলার হলে বক্তৃতার আয়োজন করা হতো। কলকাতার শিক্ষিত তরুণকে ধর্মান্তরিত করতে পারলে হিন্দু সমাজের দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেঙে যাবে বলে আলেকজাণ্ডার ডাফ বিশ্বাস করতেন।

প্রথম বক্তৃতা (অগস্ট ১৮৩০) দিলেন খ্রিস্টান ধর্মযাজক হিল (Mr. Hill)। উগ্র আবেগাত্মক অথচ যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় কলকাতার হিন্দুসমাজ কেঁপে উঠল। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে লিখেছেন :

"..... That lecture fell like a bomb-shell amoung the college authorities."[১৭]

এই বক্তৃতার পর হিন্দু সমাজের ধারণা হলো যে, খ্রিস্টান মিশনারিরা নানা কৌশলে হিন্দু যুবকদের ধর্মান্তরিত করতে চান। মিশনারিদের কবল থেকে যুবকদের রক্ষার জন্যে জনসভায়, পথেঘাটে ও সংবাদপত্রে উত্তেজনাময় আলোচনা চলতে লাগল। যুবকদের নৈতিক চরিত্রের নিয়গামিতার জন্যে বিজাতীয় ধর্মহীন শিক্ষা দায়ী বলে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে অজস্র অভিযোগ আসতে লাগল। কলেজ কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে ছাত্রদের ধর্মবিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণে, এমন কি কলেজের ভেতরে বা বাইরে শিক্ষকদের সঙ্গে ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বিচার-বিতর্ক নিষিদ্ধ করলেন। কিন্তু হিন্দু কলেজের ছাত্ররা এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ডিরোজিও-র সঙ্গে আলোচনা, বিচার বিতর্ক চালাতে লাগল। অন্যদিকে ডাফের বক্তৃতায়ও লোকের অভাব ঘটল না। ..... এই প্রসঙ্গে 'Indian Gazette'-এর মন্তব্যে ডিরোজিও-র ছাত্রদের প্রতি সমর্থনই পাওয়া যায় :

"The interference is presumptuous, for the Managers, as managers, have no right whatever to dictate to the students of their time out of college."[১৮]

ডিরোজিও-র ওপর হিন্দুসমাজের প্রথম পর্যায়ের আঘাত এভাবে ব্যর্থ হওয়ায় দ্বিতীয় পর্যায়ের আঘাতের প্রস্তুতি চলতে লাগল। হেনরি ডিরোজিও-র ওপর কর্তৃপক্ষের অভিযোগ

অনেক। তরুণ শিক্ষক ডিরোজিও সহজেই প্রায় সমবয়সী ছাত্রদের যুক্তিবুদ্ধির দীপালোকে মুক্তচিন্তায় উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। তিনি গতানুগতিক পদ্ধতিতে শিক্ষা না দিয়ে বেদ-কোরাণ-বাইবেলের অনড় অচল নির্দেশকে উপেক্ষা করে যুক্তি, মুক্তবুদ্ধি ও পরিচ্ছন্ন বিবেককে ছাত্রদের জীবনের সহচর করতে শেখান। .....

একদিকে ডিরোজিও-র ওপর দ্বিতীয় পর্যায়ের আক্রমণের উদ্যোগ, অন্যদিকে 'সংবাদ প্রভাকর', 'সংবাদ চন্দ্রিকা' প্রভৃতি পত্রিকায় ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রদের চরিত্রহননের কুৎসিত প্রয়াস চলতে লাগল। .....

হিন্দু কলেজের প্রথম যুগের ছাত্রদের শিক্ষক-বন্ধু-দার্শনিক ডিরোজিও-র জীবনে এভাবেই মর্মান্তিক আঘাতের প্রস্তুতি রচিত হয়ে চলল।

২৩ এপ্রিল ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ। হিন্দু কলেজের সভায় Committee of Management-এর সদস্যরা মিলিত হন। সেই সভায় ডিরোজিও-র কর্মচ্যুতির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। ২৮ এপ্রিল ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় সংবাদটি প্রকাশিত হয় :

"হিন্দু কলেজের বিষয় আমরা অবগত হইলাম যে গত ১১ বৈশাখ ২৩ এপ্রিল শনিবার ডাইরেক্টর অর্থাৎ কর্মাধ্যক্ষদিগের কলেজের ভদ্রাভদ্র বিবেচনা নিমিত্ত বৈঠক হইয়াছিল তাহাতে যে যে বিষয় স্থির হইয়াছে তদ্বিবরণের প্রতিলিপি আমরা প্রাপ্ত হই নাই, কিন্তু শুনিয়াছি শ্রী যুক্ত ডোজ্রু সাহেব নামক একজন টিচার অর্থাৎ শিক্ষককে কর্ম্ম হইতে রহিত করিয়াছেন।"[১৯]

এর পরের ইতিহাস আর অজানা নয়। .... ড. এইচ. এইচ. উইলসন (Dr. H. H. Wilson — 1786-1860) সভার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে ডিরোজিও-কে পদত্যাগ করতে অনুরোধ করলেন। ডিরোজিও তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেন। তারপর উইলসনের সঙ্গে ডিরোজিও-র যে পত্র বিনিময় হয় বাংলার র‍্যনেশাঁসের ক্ষেত্রে তা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

(৭)

হিন্দু কলেজ থেকে পদত্যাগের পর হেন্‌রি ডিরোজিও কবিতা লেখা ও পত্রিকা সম্পাদনায় মনোনিবেশ করেন। প্রথমেই তিনি সান্ধ্য পত্রিকা (Evening Paper) 'হেস্‌পারাস্' (The Hesperus) সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত হলেন। কিন্তু পরে জীবিকার কথা ভেবে অথবা অন্য কোনো কারণে তিনি নিজে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিলেন। ৩ মে ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে 'Calcutta Gazette'-এ প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায়, ডিরোজিও সম্পাদিত 'The East Indian' পত্রিকার (সান্ধ্য দৈনিক) মাসিক চাঁদা পাঁচ টাকা. ইউরোপ, দক্ষিণ আফ্রিকা, প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জ, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও উত্তরপ্রদেশ থেকে টাট্‌কা খবর পরিবেশনার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

ডিরোজিও নিজের সমস্ত উপার্জিত অর্থ ব্যয় করে ১ কসাইতলা (১১ বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট) থেকে 'The East Indian' সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকা ১ জুন ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন। মুখ্যত য়ুরোপীয় সমাজের মুখপত্র হলেও এই পত্রিকায় হিন্দু সমাজ সংক্রান্ত প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও সংবাদাদি প্রকাশিত হতো। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, 'The East Indian' পত্রিকার একটি সংখ্যাও পাওয়া যায়নি। ..... তবে সেই সময়ের পত্র-পত্রিকায় 'The East Indian' পত্রিকার কিছু কিছু উল্লেখ রয়েছে।

'The East Indian' পত্রিকায় 'Modern Hindoo Sects' নামে এক উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।[২০] এই প্রবন্ধটিতে একদিকে রামমোহন রায় ও তাঁর অনুগামীদের, অন্যদিকে ডিরোজিয়ানস্ (The Derozians) হিসেবে পরিচিত হিন্দু কলেজের ছাত্রদের সম্পর্কে ডিরোজিও-র দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। প্রবন্ধটি ডিরোজিও-র লেখা কিনা জানা যায় না। কিন্তু প্রবন্ধটি যে ডিরোজিও-র অনুমোদিত এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই।

'The East Indian' পত্রিকাটি প্রকাশ করতে গিয়ে ডিরোজিও ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন বলে অনুমান করা হয়; কেননা ডিরোজিও প্রয়াত হবার অব্যবহিত পরেই পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, তিন-চার মাসের ভেতরে তাঁর মা ও বোনকে কলকাতা ছেড়ে শ্রীরামপুরে চলে যেতে হয়। .....

২৬ ডিসেম্বর ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে দুরারোগ্য কলেরা (Cholera) রোগে হেন্‌রি ডিরোজিও প্রয়াত হন। রোগশয্যায় তরুণ ছাত্ররাই তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করেছিলেন। তাঁর ছাত্রদের অন্যতম মহেশচন্দ্র ঘোষ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ডিরোজিও-র পাশে ছিলেন। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও ডিরোজিও সত্যচারিতাকে জীবনের ধ্রুব আদর্শ রূপে গ্রহণ করতে মহেশচন্দ্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন। খ্রিস্টান ধর্মযাজক হিল মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে ডিরোজিও-র সঙ্গে দেখা করে প্রশ্ন করেন ডিরোজিও নিজেকে খ্রিস্টান বলে মনে করেন কিনা? ডিরোজিও নিজেকে খ্রিস্টান বলেন নি। ধর্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনো শেষ কথাও তিনি বলতে চান নি। ডিরোজিও-র ধর্মমত সম্বন্ধে 'Calcutta Gazette'-এর Indian Register-এ একটি উদ্ধৃতি পাওয়া যাচ্ছে :

"..... That he did not view Christianity as communication from the divenity to fallen man is well known; but it is perhaps impossible to say in what manner he came to fall into such an opinion."[২১]

খ্রিস্টধর্মের ঈশ্বর-মাহাত্ম্য বা অলৌকিকতায় ডিরোজিও বিশ্বাস করতেন না; কেননা তা যুক্তিনির্ভর নয়। এই কারণে পার্ক স্ট্রীটের গোরস্থানে (Burial ground) ডিরোজিও কে সমাধিস্থ করার ব্যাপারে অসুবিধে দেখা দিয়েছিল।

মৃত্যুর তিন দিন আগে (২৩ ডিসেম্বর ১৮৩১) ডিরোজিও একটা উইল (Will) করেন। উইলটি কলকাতা হাইকোর্টের মহাফেজখানা থেকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের হেপাজতে আসে।

উইলের সাক্ষীদের একজন হলেন সৎ মা আনা মারিয়া ডিরোজিও। পরিবারের সবার সঙ্গে ডিরোজিও-র যে প্রীতির সম্পর্ক ছিল তা উইলে প্রকাশিত হয়েছে। সৎ মার ভবিষ্যৎ চিন্তায় তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে তিনি তাঁর কোনো ছাত্রকেই মা-বাবার প্রতি নৈতিক কর্তব্য পালনে বা শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে শিক্ষা দেন নি। ..... উইলের এক্সিকিউটর ড্যানিয়েল মিকিন্স কিং (Dyaniel Mikings King) ৩০ ডিসেম্বর আদালতে উইল দাখিল করেন। দাখিল করার পর হিসেব নিকেশ করে জানা গেল তাঁর পাওনার ঘরে তেমন কিছু নেই, কিন্তু দেনা অনেকটা।[১১]

৯ জানুয়ারি ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে 'Calcutta Gazette' থেকে জানা যাচ্ছে — ৫ জানুয়ারি ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে পেরেন্টাল অ্যাকাডেমিক ইন্‌স্টিটিউশন (Parental Academic Institution)-এর এক সভায় ডিরোজিও-র স্মৃতিসৌধ স্থাপনের এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। চণ্ডালগড়ের পাথর দিয়ে সেই সৌধ নির্মাণের জন্যে আটশো টাকা সংগ্রহ করা হয়, কিন্তু সেই আটশো টাকা যে কোথায় হারিয়ে যায় তা জানা যায়নি। এরপর প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে ডিরোজিও-র গুণমুগ্ধ সুধীসমাজ তাঁর সমাধির ওপর স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেন, ডিরোজিও-র লেখা একটি কবিতার 'The Poet's Grave'[১২] কয়েকটি পঙ্‌ক্তি স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে উৎকীর্ণ করা হয় :

"There, all in silence, let him sleep his sleep,
No dream shall flit into slumber deep—
No wandering mortal thither once shall wend,
There, nothing o'er him but heavens shall weep,
There, never pilgrim at his shrine shall bend
But holy stars alone their mighty vigils keep!

ডিরোজিও বেশি দিন বাঁচেন নি, বাঁচলে তিনি কোনো দার্শনিক মতবাদ রচনা করবার প্রয়াস করতেন কিনা আমরা জানি না। সম্ভবত করতেন না। তিনি শুধু চেয়েছিলেন তাঁর ছাত্রদের মধ্যে এক নতুন বৌদ্ধিক চেতনা, এক স্বাধীন জিজ্ঞাসু মনের জন্ম দিতে। তাঁর ধারণা ছিল — তাহলেই তাঁর দেশবাসীকে তাদের মতান্ধতার ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলা যাবে। এভাবেই তিনি নিজের অতি পরিচিত দেশকে জঞ্জালমুক্ত করে নতুন করতে চেয়েছিলেন। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। ডিরোজিও ভারতবর্ষকে ভালোবাসতেন গভীরভাবে কিন্তু ভারতীয় চিন্তার কোনো খোঁজ রাখতেন বলে মনে হয় না। তিনি যা চাইতেন তা হলো তাঁর ছাত্রদের জিজ্ঞাসু মনকে জাগিয়ে তুলতে। আর তা করতে পারলেই জাতির সামাজিক ও নৈতিক পুনরুজ্জীবন ঘটবে। ..... তিনি কোনো সামাজিক, রাজনৈতি, ধর্মীয় মতবাদ সৃষ্টি করেন নি। তাঁর চেষ্টা ছিল নতুন এক বৌদ্ধিক মনোভাব সৃষ্টি করবার। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এই নতুন বৌদ্ধিক চেতনা থেকেই বেরিয়ে আসবে ক্ষয়িষ্ণু সমাজের পুনরুজ্জীবনের জন্যে যাবতীয় আন্দোলনের পরিকল্পনা. .....

শিক্ষক-কবি হেন্‌রি ডিরোজিও-কে জন্ম-দ্বিশতবর্ষে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম।

উল্লেখসূত্র :

১. রাধারমণ মিত্র, 'কলকাতার বাড়ি, বাগান, বাগান বাড়ি, (দ্র. ডিরোজিও-র বাড়ির ইতিহাস), শারদীয় এক্ষণ, ১৪ বর্ষ, সংখ্যা ৩-৪, ১৩৮৭, পৃ. ১০১-১০৩।

২. Sakti Sadhan Mukhopadhyay (Complied and Edited), Derozio Remembered, Birth Bicentenary celebration commemoration volume, Sources and Documents, Vol. 1. 1830-1947, Derozio commemoration committee, Kolkata, April 2008, p. 281.

৩. অমর দত্ত, ডিরোজিও ডিরোজিয়ান্‌স্, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, মার্চ ১৯৯৬, পৃ. ২-৩।

৪. যোগেশচন্দ্র বাগল, ডিরোজিও, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৭৫, পৃ. ২১।

৫. যোগেশচন্দ্র বাগল, 'হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও', ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস, কলকাতা, পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৬৩, পৃ. ১৩৬।

৬. তদেব, পৃ. ১৩৬-১৩৭।

৭. Thomas Edwards, Henry Derozio, the Eurasian Poet, Teacher and Journalist, W. Newman & Co. Ltd., Calcutta, 1884, pp. 17-18.

৮. 'কবিতাগুচ্ছ', শিবনারায়ণ রায় (সম্পাদনা), নবজাগরণের বিবেকী পথিকৃৎ ডিরোজিও, রেনেসাঁস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ১২৭।

৯. সমাচার দর্পণ, ১৩ মে ১৮২৬।

১০. দ্র. Thomas Edwards, op.cit. p. 23.

১১. অমর দত্ত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৭।

১২. যোগেশচন্দ্র বাগল, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, পৃ. ১৩৯।

১৩. শিবনারায়ন রায় (সম্পাদনা), পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৫৩-১৫৪।

১৪. Thomas Edwards, op.cit., p. 29.

১৫. যোগেশচন্দ্র বাগল, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, পৃ. ১৪১।

১৬. দ্র. Rev. Lal Behary Dey, Recollections of Alexander Duff.

১৭. Rev. Lal Behary Dey, op. cit.

১৮. Thomas Edwards, op.cit. 56-57.

১৯. সমাচার চন্দ্রিকা, ২৮ এপ্রিল ১৮৩১।

২০. Asiatic Intilligence, Vol. 7, p. 174.

২১. 13 February 1832.

২২. দ্র. নিখিল সরকার (শ্রীপান্থ), 'ডিরোজিও শেষ ইচ্ছাপত্র', ডিরোজিও (প্রবন্ধ সংকলন), রমাপ্রসাদ দে সম্পাদিত, শশধর প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৩।

২৩. Derozio Remembered, Ibid. p. xxix.

শিক্ষক ডিরোজিও ও প্রাসঙ্গিক কয়েকটি কথা

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ চিন্তাভাবনায় যে যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল, তা ছিল নগরকেন্দ্রিক। এই পরিবর্তনের প্রকাশ তীব্রভাবে ঘটেছিল হিন্দু-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে এবং এই বৈপ্লবিক মনোভাবের উৎস ছিল হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও র (১৮০৯-৩১) ব্যতিক্রমী শিক্ষক সত্তা। সাহিত্যিক হিসেবে ডিরোজিওর যে খ্যাতি, তা অনেকটাই ম্লান হয়ে যায় শিক্ষক হিসেবে তাঁর সাফল্যের কাছে। হিন্দু কলেজের তরুণ এই শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের মনে সময়, সমাজ ও জীবন বিষয়ে যে নতুন চেতনার জন্ম দিতে পেরেছিলেন তার তুলনা বাংলায় আর নেই বললেই চলে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজের শিক্ষকতা থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু সে স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ। যে উদ্যম ও ব্যতিক্রমী ভাবনা নিয়ে ডিরোজিও শিক্ষক হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, নতুন যুগ ও সময় যেন তারই প্রতীক্ষায় ছিল। নগর জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থেকে যে তরুণ প্রাণ হিন্দু কলেজে শিক্ষিত হবার চেষ্টা করছিল, ডিরোজিও তাদের সামনে শিক্ষার এক নূতন সংজ্ঞা এনে দিলেন। শিক্ষক হিসেবে ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের চেতনার উদ্বোধনে যে পন্থাসমূহ গ্রহণ করেছিলেন তার তাৎপর্য বর্তমান দিনেও হ্রাস পায়নি মোটেই। ডিরোজিওর জন্মের দুশো বছর উপলক্ষে চারদিকে যেসব উৎসব অনুষ্ঠান হচ্ছে, সেখানে তাঁর জীবন ও কর্মের বর্তমান-সম্বন্ধী তাৎপর্য অনুসন্ধান একান্ত প্রয়োজন বলে আমাদের মনে হয়। যে তরুণ শিক্ষক তাঁর শিক্ষকতার স্পর্শে ছাত্রদের মধ্যে নবচেতনার জন্ম দিতে পারেন, তাঁর শিক্ষকসত্তার প্রকৃত তাৎপর্য অনুসন্ধান আজকের শিক্ষক-ছাত্রেরও অবশ্য কর্তব্য বলেই মনে হয়।

ছাত্রদের মধ্যে চিন্তার স্বাধীনতা ও যুক্তির মুক্ত উদ্বোধন দেখতে চেয়েছিলেন ডিরোজিও। তিনি যে বিষয়গুলি পড়াতেন, সেই বিষয়ের উপর সামগ্রিক চিত্র তাঁর ছাত্রের সামনে রাখতেন। যে কোনো বিষয়েরই আলোচনায় দুটি পক্ষ থাকতে পারে, বিশেষত দার্শনিক আলোচনায় পক্ষে ও বিপক্ষে দুটি মত তো থাকেই। ডিরোজিও এই বিপক্ষের মতটিকেও ছাত্রের সামনে রাখতে পারতেন। ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে বিতাড়নের পিছনে অন্যতম প্রধান কারণ ছিল তাঁর সম্পর্কে নিরীশ্বরবাদ প্রচারের অভিযোগ। ২৩ এপ্রিল ১৮৩১ হিন্দু কলেজের পরিচালকবর্গের যে বিশেষ সভা হয়েছিল, সেখানে আলোচিত বিষয়সমূহের মধ্যে থেকে যে বক্তব্য উঠে এসেছিল, তার অন্যতম ছিল-

"All those students who are publicly hostile to Hindooism and the established custom of the country and who have proved themselves as such by their conduct, should be turned out."[১]

বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না যে একথাগুলি ডিরোজিওর অনুগত ছাত্রদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। কিন্তু ডিরোজিও কি হিন্দু সমাজ প্রচলিত সংস্কার, রীতি পদ্ধতির বিরুদ্ধে চলার জন্য ছাত্রদের প্ররোচিত করতেন? এর স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যাবে ডিরোজিওর নিজের লেখা চিঠিতে। এইচ. এইচ. উইলসনকে ২৬ এপ্রিল ১৮৩১ এ লেখা চিঠিতে ডিরোজিও লিখেছেন যে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব বিষয়ে পক্ষে ও বিপক্ষের মতসমূহ ছাত্রের সামনে রেখেছেন। তিনি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ছাত্রদের মুক্ত করার জন্য বিপক্ষ মতকে সামনে আনতে পিছপা হননি। ঐ চিঠিতে তিনি লিখছেন— 'I therefore thought it my duty to acquaint several of the college students with the substance of Hume's celebrated dialogue between cleanthes and Philo, in which the most subtile and refined arguments against theism are adduced. But I have also furnished them with Dr. Reid's and Dugald Stewart's more acute replies to Hume — replies which to this day continue unrefuted.'[২]

বোঝাই যাচ্ছে যে ডিরোজিও নিজের মতের বিরুদ্ধবাদী কিন্তু প্রতিষ্ঠিত মতগুলিও ছাত্রদের সামনে প্রকাশ করে যে কেবল নিজের নিরপেক্ষ অবস্থান স্পষ্ট করেছেন তা-ই নয়, ছাত্রদের স্বাধীন, যুক্তিনিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপযুক্ত মনোকাঠামো নির্মাণেও সচেষ্ট হয়েছেন।

ডিরোজিও ছিলেন হিন্দু কলেজের চতুর্থ শিক্ষক। তিনি পড়াতেন দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে। তাঁর বিষয় ছিল ইংরেজি, সাহিত্য, ইতিহাস। তখন পাঠ্যতালিকায় ছিল : গোল্ডস্মিথের গ্রিস, রোম ও ইংলণ্ডের ইতিহাস, রাসেলের মডার্ন ইউরোপ, ইলিয়াদ-ওদিসি, মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট ইত্যাদি।[৩] বিষয়ের এই ব্যাপক বিস্তারে শিক্ষক ডিরোজিও ছাত্রের আগ্রহ বৃদ্ধিতে

সফল হয়েছিলেন। তিনি সে সময়ের অত্যন্ত সফল শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষকের সাফল্য কিভাবে বিচার করা যায়? পরীক্ষা পাশের কোনো সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসেবে শিক্ষকের কাজকর্মের পরিধির সঠিক বিচার হয় না। শিক্ষক ছাত্রের ব্যক্তিক ও চারিত্রিক কাঠামো নির্মাণে কিভাবে সহায়তা করছেন এবং ছাত্রের পাঠকেন্দ্রিক বোধসমূহকে তা কেমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করছে, তাই শিক্ষকের সাফল্যের মাপকাঠি হয়ে উঠতে পারে। অবশ্য সেখানে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে এক আদর্শ সম্পর্কের বন্ধন পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে যাবে। ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রদের জীবনী এবং স্মৃতিমূলক রচনাগুলির পড়লে বোঝা যায় যে ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষকের প্রকৃত সম্পর্ক তৈরীতেও কি সচেষ্ট ছিলেন এই তরুণ শিক্ষক। ডিরোজিওর জীবনীকার লিখছেন— "..... ডিরোজিও শিক্ষাদানকে শুধু ক্লাসঘরের মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি। ক্লাসের বাইরে তাঁর বাড়িতে অথবা অন্যত্র, তিনি ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত হতেন। বিতর্ক, আলোচনা সভা, পত্রপত্রিকা প্রকাশ এসবেও মূলত ডিরোজিও ছিলেন প্রেরণাদাতা। সুতরাং বন্ধু, দার্শনিক এবং পথপ্রদর্শক বলতে যা বোঝায়, তিনি ছিলেন ঠিক তা-ই।" (রায়চৌধুরী, ১৯৯৯ : পৃ. ৪৮)।

ডিরোজিও পাঠ্যক্রমের চেনা চেহারাটার মধ্যেই নিজের শিক্ষকতাকে বন্দি হতে দেন নি। "ইতিহাস থেকে দর্শনে, দর্শন থেকে সাহিত্যে সহজ আনাগোনা ছিলো তাঁর" (ঐ প. ৪৯)। এই জায়গা থেকেই বিতর্কে প্রেরণা দেওয়ার কথা আসে। যখনই পাঠ্য বিষয়ের স্বাধীন ব্যাখ্যা ও তুলনামূলক আলোচনা হয়, তখনই ভিন্ন ভিন্ন মতের সম্মুখীন হতে হয়। সমস্ত প্রকার মতকে মূল্য দেবার জন্য, যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দরকার বিতর্ক। তাই ডিরোজিওর প্রেরণাতেই ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'। এই বিতর্ক সভায় স্বদেশপ্রেম, পৌত্তলিকতা ইত্যাদি বিষয়ে বিতর্ক হত। ডিরোজিও কেবল এর সভাপতিই ছিলেন না, এর গোড়াপত্তন হয়েছিল তাঁরই বাড়িতে।

শিক্ষক হিসেবে ডিরোজিও এত অল্প সময়ের মধ্যে কি করে এত সফল হয়েছিলেন তা এবার সংক্ষেপে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে।

১. ডিরোজিও পড়াশুনোকে ক্লাসরুমের বাইরেও ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ২. ছাত্রদের সঙ্গে তিনি প্রায় বন্ধুভাবে মিশতে পারতেন। ৩. সকল প্রকার মতকেই তিনি গুরত্ব দিতেন ৪. বিতর্কের মাধ্যমে যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি উৎসাহ দিতেন। ৫. পূর্বপ্রচলিত যে কোনো ধারণাকে তিনি যুক্তির সাহায্যে বাজিয়ে নেওয়ায় বিশ্বাসী ছিলেন। ৬. ছাত্রের সামাজিক ও নৈতিক চরিত্র গঠনে দৃষ্টি দিতেন ইত্যাদি। এই ব্যতিক্রমী শিক্ষকের জন্মের দুশো বছর পার হওয়ার সময় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের পাশাপাশি তাঁর শিক্ষকতার মূল সূত্রগুলির অনুশীলন প্রয়োজন। আজ বিপণন সর্বস্বতার যুগে, ভোগবাদে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের সময়ে ডিরোজিওর শিক্ষাদর্শ আমাদের মধ্যে নতুনভাবে পথ চলার প্রেরণা যোগাতে পারে।

সূত্রনির্দেশ

১। রায়চৌধুরী, সুবীর; হেনরি ডিরোজিও : তাঁর জীবন ও সময়; এন.বি.টি., নয়াদিল্লি ১৯৯৯; পরিশিষ্ট ২, পৃষ্ঠা-১১৭

২। Edwards, Thomas; Henry Derozio; Riddhi-India Ed.; Kolkata 1980; Pg 84.

৩। রায়চৌধুরী, ১৯৯৯ : পৃ. ৪৭।

ডিরোজিও এবং তাঁর শিক্ষা

সুরমিতা কাঞ্জিলাল

স্নাতক তৃতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

একুশ শতকে দাঁড়িয়ে যদি হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা করতে হয়, তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কোনো এক পুরোনো অ্যালবামের পাতা থেকে কিছু সাদা-কালো ছবি, চোখের সামনে উঠে আসে। ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রী না হলেও ছবিগুলো সবার চেনা এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে, সেই ছবিগুলোর গুরুত্ব কতটা, তাও আন্দাজ করা খুব কঠিন নয়। কিন্তু শুধু সেই সময় নয়, এই সময়ের রঙেও ডিরোজিও-র জীবনদর্শন, সমাজ-ধর্মভাবনা সবই, প্রতি মুহূর্তে প্রাসঙ্গিক। বস্তুত, ডিরোজিও, তাঁর ছাত্রদের যা শিখিয়েছিলেন, সময়ের ব্যবধান ছাপিয়ে তা, যে কোনো প্রজন্মের চর্চা করার বিষয়। যুক্তিবোধ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, স্বাধীন-মুক্ত চিন্তা পদ্ধতি, ব্যক্তি স্বাধীনতা— প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি সচেতনতা যে কোনো মানুষের জীবন যাপনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সে দিক দিয়ে উনিশ শতকে আর একুশ শতকে ফারাক খুব বেশি নয়।

তবে, একথা স্বীকার করতেই হয় যে, ডিরোজিওর সময়টাই ছিল পট-পরিবর্তনের, পুরোনোর জায়গায় নতুন বীজ বপনের। ফলে বাংলার সমাজ জুড়ে ডিরোজিও ও তাঁর হিন্দু কলেজের ছাত্ররা যে আলোড়ন তুলেছিলেন, সমকালই তার মাটি প্রস্তুত করেছিল। বাংলা তথা ভারতের বাইরে, বিশ্ব-ইতিহাসে যদি চোখ রাখা যায়, তাহলে পালা-বদলের উত্তাল পরিস্থিতি লক্ষ করা যায়। অতএব অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, ডিরোজিও তাঁর ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গি কোথা থেকে পেয়েছিলেন।

প্রায় সমস্ত পৃথিবীতে তখন তলিয়ে যেতে চলেছে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা, আর তার জায়গা দখল করছে পুঁজিবাদ। এই পুঁজিবাদী সভ্যতার হাত ধরে সারা বিশ্বে তৈরী হয়, নতুন সমাজভাবনা। ইংল্যাণ্ডে ঘটে যায় শিল্প বিপ্লব, উদ্ভব হয় শ্রমিক শ্রেণির। পুঁজির ওপর ভর করে শুরু হয়ে যায় সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতিযোগিতা। আর এর মাঝে ঘটে যায় দুটি বড় ঘটনা — প্রথম ১৭৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং দ্বিতীয় ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লব। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ সারা বিশ্বের ইতিহাসে এক নজির- বিহীন ঘটনা। মানুষের মনে, এই যুদ্ধের ফলাফল গণতন্ত্রের উদাহরণ সৃষ্টি করে। আর ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমে মানুষের মননে ঢেউ তোলে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার মহান আদর্শ। স্বাভাবিকভাবেই, এরপর ভেঙে যেতে থাকে পুরোনো বিশ্বাস। জন্ম নিতে থাকে নতুন মূল্যবোধ। আর সারা বিশ্বের এই পরিবর্তনের হাওয়া অনায়াসে প্রভাব ফেলে বাংলাদেশে। ডিরোজিও-ও এই পরিবর্তনের ফসল।

মধ্যযুগীয় বাংলাদেশে আধুনিক চেতনার পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায়। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টাতে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের ভিতে আঘাত লাগে। মানুষের জীবনে যেন জোয়ার আসে। রাজা রামমোহনের সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা, একেশ্বরবাদের প্রচার, ব্রহ্মধর্মের প্রচার—প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে, সমাজ প্রায় দ্বিধা বিভক্ত হয়ে উঠেছিল। রামমোহন রায়ের 'আত্মীয় সভা'-র জবাবে গোঁড়া হিন্দু মহল গড়ে তোলে 'ধর্মসভা'। এই ভাবে সমস্ত সমাজ জুড়ে গতির সৃষ্টি হয়। এতদিনের জড় সমাজে যেন প্রাণের স্পন্দন লাগে। ডিরোজিও এই নব্য স্পন্দনে প্রাণের সূচনা করেন।

ডিরোজিও, ডেভিড ড্রামণ্ডের ধর্মতলা অ্যাকাডেমি থেকে শিক্ষা লাভ করেন। প্রচলিত পড়াশোনার বাইরে তাঁর ওপর প্রভাব ফেলে ডেভিড ড্রামণ্ডের প্রগতিপন্থী স্বাধীন চিন্তা-চেতনা। ফলে বাংলাদেশে জন্মেও, এখানকার প্রথাগত ধ্যান-ধারণা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। এছাড়া ডিরোজিও-র ব্যতিক্রমী মননকে পরিপুষ্ট করেছিল, দার্শনিক লক, হিউমের রচনা ও ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ। হিন্দু কলেজের শিক্ষকতার চাকরি-ও তাঁর কাছে মুক্ত বাতাসের কাজ করে। ধর্মতলা অ্যাকাডেমির শিক্ষা তাঁর মধ্যে দেখার ক্ষমতা তৈরি করে। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যেও তিনি সেই দেখার ক্ষমতা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন; ছাত্রদের নিজস্ব বোধকে, বিচারের ক্ষমতাকে তৈরি করতে চেয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, কুসংস্কারগ্রস্ত হিন্দুসমাজ ছাত্রদের মনে অজস্র প্রাচীর তুলে দিয়েছে, তাদের চিন্তাশক্তিকে করে তুলেছে ভোঁতা। ডিরোজিও, তাই প্রাণপণে ছাত্রদের ঘাড় থেকে হিন্দুত্বের বোঝা নামানোর চেষ্টা করতেন। হিন্দু ধর্মের বিবিধ নিয়ম-কানুন, সাধারণ মানুষ যাকে বোঝার মতো বয়ে বেড়াত, সেই সব নিয়মকে তর্ক-বিতর্কের মধ্যে ফেলে, ডিরোজিও, তাঁর ছাত্রদের ধর্মনামক—ভার বাহকের

ভূমিকা থেকে সরে আসতে সাহায্য করেছিলেন। গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যাবার মন্ত্র ডিরোজিও শেখাননি— বরং তাঁর ছাত্ররা যা বিশ্বাস করতেন, যা জীবনে পালন করতেন, অন্ধের মতো যেন তা আঁকড়ে না থাকেন, দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন মানুষের মতো যুক্তি-প্রতিযুক্তির মাধ্যমে নিজের বিশ্বাসকে জোরালো করেন এটাই ছিল তাঁর প্রচেষ্টা। ফলে বোঝা যায়, হিন্দু-কলেজ কর্তৃপক্ষ, তাঁর ওপর ছাত্রদের ধর্মান্তরিত করার যে অভিযোগ এনেছিল, তা একেবারেই ভিত্তিহীন।

ডিরোজিও হিন্দু কলেজে মূলত ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস পড়াতেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিকে তিনি ধারণ করেননি। ব্রিটিশ সরকার, এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন শুরু করেছিল ঠিকই, কিন্তু ছাত্রদের কাছে শিক্ষার প্রকৃত আলো জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্যে নয়। ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার চেয়েছিল, আধা-ইংরেজি জানা দেশীয় কর্মচারী তৈরি করতে। যার ফলে এদেশে ব্রিটিশ শক্তির-ই ভিত মজবুত হবে। এই কারণে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের শুরুর দিকে ধারাপাতের নামতার মতো ইংরেজি শব্দ দিয়ে ছড়া তৈরি ক'রে, ছাত্রদের ইংরেজি শেখানো হতো, যেমন—

"ফিলজোফার বিজ্ঞলোক, প্লাউম্যান চাষা,
পমকিন্ লাউ কুমড়ো, কুকুম্বর শশা।"

ডিরোজিও কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে শব্দার্থে থেমে থাকেননি। বরং শেক্স্পিয়ার থেকে শুরু করে বায়রন, মুর, ক্যাম্পবেল পর্যন্ত ইংরেজি সাহিত্যের আনন্দময় সম্বিতের দরজা খুলে দিলেন। ইতিহাস পড়ানোর মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক ও বর্তমান সমাজ-পরিস্থিতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে প্রশ্ন সৃষ্টি করলেন। যেমন— ভগবান আছেন কি নেই, জাতিভেদ ভালো কি মন্দ, প্রতিমা পূজা বর্জন করা উচিত কিনা। — এইসব বিষয়ের আলোচনায় ছাত্রদের মত প্রকাশের একটা সুবিধা ছিল। ডিরোজিও ছিলেন ছাত্রদের প্রায় সমবয়সী। ফলে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে গড়ে উঠেছিল বন্ধুর সম্পর্ক। ছাত্রদের সঙ্গে এরকমই নানা বিষয় আলোচনার জন্যে তিনি গড়ে তুললেন-- 'অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন'।

এইভাবে ডিরোজিও বাঙালি বর্ণহিন্দু সমাজে আত্মবিশ্লেষণের প্রচলন ঘটালেন। এতদিন রক্ষণশীল, পঙ্গু ও নির্জীব হিন্দু সমাজে, মানুষ কার্যত প্রশ্ন করতেই ভুলে গিয়েছিল। ডিরোজিওর শিক্ষা, তাঁর ছাত্রদের শেখালো প্রশ্ন করতে, বিশ্লেষণ করতে।

একটা কথা মনে রাখতে হয় যে, ডিরোজিও সমাজ সংস্কারক ছিলেন না। ছিলেন শিক্ষক। ফলে রামমোহন রায়ের মতো আইনের সাহায্য নিয়ে কোনো অমানবিক প্রথা রদ করার দিকে তিনি এগোননি। বরং তাঁর কাজ ছিল আরো বেশি কঠিন। ছাত্রদের এতদিনের অর্জিত ও চর্চিত সংস্কারের জগদ্দল পাথরকে সরিয়ে, তাদের চিন্তার জগতে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন তিনি! বলা বাহুল্য, ডিরোজিও এই কাজে সফল হয়েছিলেন। তাই হিন্দু-কলেজ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত এত জোরালো হয়ে উঠেছিল। তবে, অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে ডিরোজিও-এর ছাত্ররা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমাজ পরিবর্তনের নামে নিজেরাই কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। ফলে মানুষের মনে কোনো জোরালো ছাপ সৃষ্টি করতে পারেনি। পরবর্তীকালেও তারা বড় কোনো আন্দোলন তৈরি করতে পারেনি।

তবুও একথা ভুললে চলে না যে, ডিরোজিও এবং তাঁর শিক্ষা পদ্ধতি যে ঝড় তুলেছিল, ঝড় থামার পরেও তাঁর চিহ্ন এখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়েছিল। পরবর্তীকালে বাংলায় নবজাগরণের যে ফলাফল লক্ষ করা যায়, ডিরোজিওর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সে ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। আর বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েও ডিরোজিওকে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। যদিও সময়টা আধুনিক, সময়টা প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনকামী। কিন্তু আজও সমাজের আনাচে-কানাচে তৈরি হয় স্থবিরতা, যাকে সরানোর জন্য প্রয়োজন সেই আত্মবিশ্লেষণের প্রয়োগ। আধুনিকতার নাম ক'রে, জীবন যাপনের যে দৃষ্টান্ত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা হয়, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়ায় পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ, সুস্থ সংস্কৃতির পরিপন্থী। বর্তমান রাজনীতি-সমাজনীতি, বস্তুত যৌবনের গতিশীলতার মোড়কে বর্তমান প্রজন্মের হাতে তুলে দেয় কিছু স্থূল ভাবনার উপকরণ, যা আসলে তাকে সমাজ-বিমুখ, স্বার্থপর জীবন-যাপনে উৎসাহিত করে। প্রজন্মের পর প্রজন্মকে এই ভাবে রাজনীতি ও সমাজের প্রয়োজনে মানসিকভাবে স্থবির করে দেওয়ার চেষ্টা চলে। ফলে আজকে সেই আত্মবিশ্লেষণময় শিক্ষার প্রয়োজন সবচাইতে বেশি, যে শিক্ষা কেবল ডিগ্রীর পেছনে ছোটাতে শেখায় না, মানুষের মনন ও চেতনায় আনে সামাজিক সচেতনতা, যুক্তিবোধ ও সংস্কারমুক্ত ভাবনা

Derozio — The first voice against conservatism

Shriya Bandyapadhyay

Department of History, Third Year

Whenever a society stands at the crossroads of change it faces many commotions. Impetus of change may come from outside or from within. This commotion takes the form of confrontation between the forces of change and those of stability. This confrontation between forces finds expression differently in different societies. This conflict was present in the French revolution, the civil war of England or in the Russian Revolution. These are somewhat of extreme category. In the 19th century Bengal the process was more or less peaceful but the fundamental point remains — commotion and confrontation between two mutually contradictory currents. In this essay we would try to place Derozio as a force confornting with the orthodox force represented by Radhakanta Deb, Ram Kamal Sen etc. We would note how the platform was initially prepared for change by the spread of western education and then how in this juncture Derozio and his students appear in the scenario. They brought a new philosophy of life which perturbed the orthodox and religious conservatives. Here we must keep in mind that Radhakanta Deb representing the orthodox authority of Hindoo College was also a pioneer in the spread of female education. His role was also fascinating in bringing change in social sphere. But he was basically a religious conservative, always trying to secure Hindoo college from radical ideas. So after one point of time he stood against Derozio. As a result of this conflict Derozio's career as a teacher came to an end. Actually things were already in motion, changes were in the air, radicalism was the language of the youthful Derozians. In this situation Derozio acted as the most explosive single catalyst.

We know that Hindoo college was primarily established for the education of the boys from rich Hindu Merchant class, in due course which gradually transformed into the most radical and top grade institution. We shall look back to its foundation.

When it was found that in the Charter Act Rs 1 Lakh was given for the purpose of the education of the indigenous masses there was a debate among the anglicists and the orientalists over the type of education on which the money would be spent. Raja Rammohan Roy, David Hare, Radhakanta Deb all were supporters of western education. Raja Rammohan even wrote a letter to Lord Bentinck in favour of it. In this context was established the Hindoo College in 1817. So the balance ultimately fitted in favour of western education. Already Christian missionaries (for eg. Hare) started opening schools in different parts of Bengal. The british intention was to create a new class of western educated people through whom western education would infiltrate in Bengal, then other parts of the country. As a result the indigenous society would benefit from superior education, superior moral and ethical ideas. For utilitarians it was the greatest good for the greatest number of people. Obviously the greatest good was British rule and greatest number of people meant the Indian native population. We may realize the desperate need of the imperialists to establish the legitimacy of their rule. The British were now trying to create a class of collaborators. It had other necessities too. The British policy was to recruit Indians in petty administrtive jobs in great number, as they would be offered inferior payments than their white counterparts. The policy becomes clear when we see that the important administraive posts were always occupied by the Englishmen. Gauri Visvanathan said truly that "colonial education system deployed English literary studies in its curriculae as an instrument for ensuring industriousness, eifficiency, trustworthiness and compliance in native subjects." So English education, introduced initially to inculcate, a spirit of loyalty, gradually exposed to Indians

to quote A. R. Desai "the nationalist and democratic thoughts of the Modern West." Their new ideas constituted a new ideological package which Dipesh Chakravarti has called "political modernity", consisting of such concepts as citizenship, the state, human rights, equality before the law etc. This English education also generated some questions about imperialism.

However, the first successful attempt to institutionalize English education got momentum with the establishment of Hindoo College in 1817. The first meeting was attended by Harimohan Tagore, Gopimohan Deb, Ramtanu Mullick, Abhay Charan Banerjee, Ramdulal Dey, Ramratan Mullick, Kalishankar Ghoshal, Gopimohan Tagore. In the second session it is interesting to note that five sanskrit pandits Chaturbhuj Vidyabhushan, Taraprasad Nyaybhushan, Subrahmanya Sastri, Mrityunjay Vidyalankar, Raghumani Vidyabhushan were new additions along with Wilson and Dr. Wallis. This was a very crucial session in which the primary aim for the foundation of Hindoo college — "National education of the Hindu children" was expressed. It was stressed "The Primary object of this institution be the tution of the sons of respectable Hindoos in the English and Indian languages; and in the literature and science of Europe." We may note the phrase "sons of respectable Hindoos." So, from the very beginning, Hindoo college carried with it elitism in the true sense of the term. The college gate was closed for lower caste Hindoos and obviously for Musalmans and Christians etc. So on 20th January 1817 the long legendary journey of Hindoo college began with twenty students in the house of Gorachand Basak, at Chitpore. In 1819 David Hare was appointed as the Visitor of the college. Within 1824 (by the time once again the college was transferred to the house of Firingi Kamal Basu in Chitpore road in 1819) the increasing number of students demanded more teachers and non-teaching staff. In 1824 the governors sought government help for the college. We find the second letter of the governors saying "It is scarcely to be apprehended that any question would arise in which the opinion of the native and European Managers would be exactly balanced but should such an event occur we hope it will not be thought unreasonable in us to propose that a negative voice may be allowed to the native managers that is to say that any measure to which the natives express an unanimous objection shall not be carried into effect." It was also said that "we beg further to observe that in thus expressing our readiness to play the Vidyalaya under the joint mangement of the natives and Europeans we do so in the full confidence that not only an informed course of study but the satisfaction of the native subscribers and managers of the Hindu community will be equality the object of both and we entertain no doubt therefore that in all modification of the rules of the college it will never be forgotten that it is a Hindu institution for the purpose of cultivating especially English literature and science alone, that the admission of persons likely to injure that respectability and consequently to contract the utility of the college will always be strictly prohibited and that works directed against the character and principle of our countrymen will be also excluded." (G.C.P.I Unpublished records Vol. 8. P. 96; 98). This letter was signed by Chandrakumar Tagore, Ramkamal Sen, Gopimohan Deb, Rajkrishna Sinha, Radhakanta Deb, Rosmoy Dutta, Guruprasad Basu, Ladlimohan Tagore, Radhamadhav Banerjee, Kamalakanta Das. We may realise the strong conservative elements dominating each and every sphere of the college, namely — the course of study, the admission of students, also the sentiment of Hindu society in the modification of college matters etc. This letter is of immense importance in realizing the nature of the college authority. Consquently, the Government accepted all the terms and conditions presented by the managers of the college and took the financial responsibility of the college. Government sent Horace Wilson as the Visitor of the college along with another government representative in the managing committee.

The new Visitor of college Wilson had to play a crucial role in the evolution of Hindoo college. He planned an exclusive syllabus and realised that to materialize it an efficient teacher was necessary. On 1st May 1826, seventeen year old Derozio was appointed as a teacher of Hindoo college. Wilson realised the shortcomings of the institution. He said — "as long as Enfield's speaker and Blair's

Exercises are the only books read by the upper classes, however valuable such books may be accessory and introductory to our literature it cannot be admitted that they convey accurate notions of its worth." According to him — "upper classes should lay aside Miscellenies and enter boldly upon our best writers in prose and verse." Now, he said — "The general result of the operations of the Hindu college is to give students a considerable command of the English language, to extend their knowledge in History, Geography and to open to them a view of the objects and means of science." Gradually he changed the syllabus and obviously in this matter received the help of Henry Louis Vivian Derozio.

The new syllabus of 1830, includes Mental philosophy, History, Mathematics, Natural philosophy, Geography, Shakespeare, Milton, Pope, Dryden, Johnson, Goldsmith, translated Homer in the sphere of literature — Bacon, Locke, Stuart, Reed etc in philosophy and in science three sections of Newton, Optics, Mechanics of Porter, Differential and Integral Calculus of Hall was included. The history syllabus then consisted of Gibbon, Hume, Robertson, while in Economics Adam Smith's Wealth of Nations was incorporated. Logic included Mills Whitely; perhaps the days of glory for Hindoo college got its momentum. Many leading newspapers criticized that Hindoo college had totally rejected religious teaching.

Now I will concentrate on Derozio's conflict with the orthodox authority of Hindoo college, which is my focal point of discussion. Derozio's teaching was really an eye opener for the young students of Hindoo college. New Western education gave birth to several questions in their minds against the existing society, superstitious practices, the nature of imperial government, religious conservatism and other evils of society. These quests found their expressions for the first time in the Academic Association, a debating club, established in 1828, by Derozio and his students. In its first session topics like — freewill and fate, virtue and vice, patriotism, argument for and against the existence of God, the shames of idolatry and priestcraft were discussed.

Hindoo college boys now started a magazine — "Parthenon" on 15th February 1830 which discussed matters like — women's education, colonization, necessity of cheap justice and the curse of supersition. Derozio himself at this time delivered a course of lectures on metaphysics in his school which attracted a few hundred audience, inspired by the philosophy of Bacon, Locke, Hume, Smith, Paine and Bentham. Criticizing the "Parthenon", 'India Gazzette' said — "this Magazine is Hindu by birth yet English by education". In this context radical sentiments were emerging among the students. In 'India Gazettee' a Hindu college student sharply attacked the colonization process of the British. On 10th December 1830 two hundred persons celebrated July revolution in the Town Hall. On the eve of Christmas a tricolour flag of French Revolution was seen on the Monument. The suspects were obviously the Derozians.

Conservative society felt agitated for they suspected that Hindu religion was in danger. Sensational news were published in the leding newspapers about the activity of the Derozians. Humor spread that students when required to chant mantras they would recite from the Iliad. One student instead of bowing down to the idol of Kali, greeted with a 'good morning madame'. Samvad Prabhakar and Samachar Chandrika raised a hue and cry against the students who imitated the 'Vagabond Firingis'. Now the managing committee of Hindoo College began to take repulsive measures. The first clash of Derozio with the managing committee of Hindoo college occured when Derozio wrote a poem expressing his deep pleasure, on the eve of abolition of Sati. He wrote — "Hark! heard ye not? the widow's wail is o'er. A rising spirit speaking peace to man". (India Gazette, Quoted in John Bull, 14 December, 1829)

We can recall Hindoo college managing committee were hardcore religious conservatives, naturally a clash with Derozio in very near future became inevitable.

The first attack came upon "Parthenon". Its publication was forbidden and all copies were destroyed. Most probably "Parthenon" stood

strong against the interest of conservatives along with the imperial and colonial policies of the Raj. During the time Radhakanta Deb wrote to the Visitor of the college, Wilson — "They (students) are guilty of fornication and sodomy to the utter disgrace of the institution." Harsh measures were taken against — 'Academic Association'. Now it was not allowed to convene its sessions within the premises of Hindoo college. During this time Scottish Missionary Alexander Duff came to Calcutta. His lectures attracted a large number of students. The college authority was alarmed. It imposed a new decree by which it was declared that any student who would attend political, religious discussion in different societies would be severely punished. In the opposition to this black decree, two letters were published in 'India Gazette' Some say the writer of which was Derozio himself. However 'Calcutta Monthly Journal' said it was the political discussions which offended the college authority.

The opposition of Derozio was active throughout the time. Even before the newspaper campaign started the managing committee of the college tried to create a quarrel between Derozio and the Head master D'Anselme. Rumours were heard that Dakshinaranjan one of the Derozians was going to marry Amilia, Derozio's sister. This news had a strong reaction obviously among the conservatives. The Presidency College still preserves a volume of manuscript record, says Prof. Sushobhon Chandra Sarkar, which contains the proceedings of the meeting of the directors of Hindoo college on 23rd April 1831. It was said — "Mr. Derozio, being the root of all evils and the cause of public alarm, should be discharged from the college." It was declared that Derozio's 'Misconduct' was responsible for the withdrawal of students from the college. These written allegations were made by Ramkamal Sen and Radhakanta Deb. They also brought nineteen counts of charges against Derozio. Not that all the members of the managing committee were unanimous over the allegations. The governor of the college Chandrakumar Tagore said, before this report he had not heard anything negative about Derizio's teaching method and conduct. To Wilson, Derozio was a teacher of a superior quality. Rosmoy Dutta whose two sons were students of this college expressed his ignorance on any 'Misconduct' on Derozio's part. Lawyer Prasannakumar Tagore pointed out the allegations were not sufficient proof against Derozio. Sri Krishna Sinha dismissed the allegations saying that those had no real basis. David Hare expressed his view that a teacher like Derozio was rare. So only three among nine members of the managing committee were against Derozio. Ramkamal Sen and Radhakanta were desperate. Finding no other way to insult Derozio personally or as a teacher they tried to play the Hindu sentimental card. They raised the question if was expedient in the contemporary state of public felling amongst the Hindu community of Calcutta to continue Derozio in the college. Chandrakumar Tagore, Rosmoy Dutta were convinced by the arguments of Radhakanta and Ramkamal especially after Radhakanta had shown the members the complaints of guardians, he brought with him.

We know that in any moral question of college the right to vote was only restricted to the natives. So now it was said — "Resolved that the measure of Mr. Derozio's removal be carried into effect with due consideration for his merits and services." There were also eighteen other proposals raised by Radhakanta and Ramkamal which points to their immense Hindu conservative attitude and effort to make Hindoo college an institution guided by Hindu Orthodox sentiments. They were strongly opposed to the political activities of the students. But this was dismissed by the opposition of other members. Some surprising, at the same time ridiculous, proposals were there which had been rejected by the authority. For example — the doors should not be closed during the time of teaching etc.

Derozio in due course was informed about the discussions of the meeting. He sent his resignation on the 25th April, along with a personal letter to Wilson.

In every society there are some orthodox elements who try to crush any new development good or bad. Especially Hindoo College from its very beginning was elitist and conservative in its nature. Orthodox elements were dominant in the authority also. They always

practised stringent control over the admission, syllabus, method of teaching of the college. In this context Derozio brought with him new ideas. His immense influence on the students opened their eyes. In the excellent language of Dr. Suresh Chandra Maitra—

"হিন্দু কলেজের জন্মান্তর ঘটে গেছে। ছাত্রেরা কেরানী হতে এসে সৈনিক হয়ে উঠেছে। . . . . .
নতুন জীবনের স্বপ্নে মেতে উঠেছে।"

Their eyes were now filled with new dreams, new ideas. So the very basic aim for the establishment of the College was going to be unsuccessful. The hatred of orthodox Hindus against Deriozio was represented in the drama 'Persecuted.' From the very beginning the confrontation of the college authority with Derozio was inevitable. Here the representatives of the authority of college were Ramkamal and Radhakanta.

From the personal letters of Wilson and Derozio we come to know that the main three allegations against Derozio were — (1) Whether he asked his students to be atheist. (2) Whether he asked his students to disobey their parents, (3) Whether he preached in favour of marriage between brothers and sisters. Derozio's answer was that he had not preached his own ideas. What he taught was to question, to challenge every thing with free thinking. He not only taught the Philosophy of atheist Hume but at the same time also taught the ideas of theist Reed. The second allegation was baseless and the third he denied with immense hatred.

It is doubtfull to what extent Derozio's termination served the interest of the orthodox elements. The students of Hindoo college had already received the taste of modern, liberal thought. The imprint they left on society was powerful. Several associations were established by the Derozians. Thus the first wave Derozio brought in the intellectual sphere, continued after his sack and death. Through different associations, thought of Derozio spread widely, which continues to influence us till today. From that time on Hindoo college never looked back torwards orthodoxy. The 175 year old history of the legendary institution tells this. Here lies the success of Derozio. He was the person who was the real founder of the modern Presidency College.

1. A. R. Desai — 'Social Background of Indian Nationalism.
2. কৃষ্ণ ধর — কলকাতা তিন শতক [পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি]
3. Susobhan Chandra Sarkar — 'Derozio And Young Bengal.'
4. ড. সুরেশ চন্দ্র মৈত্র — 'অশান্ত কাল জিজ্ঞাসু যুবক।'

The Fire Sermon

Jhelum Roy
Department of English, U.G. First Year

March 1828 : a small candle was lit at heart of the Hindoo College, as a young man of Seventeen entered, with dreams in his eyes, energy in his heart and firmness in his mind. He was assigned to teach a bunch of equally eager, dreamy-eyed students the intricacies of literature and European history. It was then the journey began ... the spell named 'DEROZIO' was unleashed ....

No one in the Hindoo College had ever taught with such zeal and enthusiam. Thus the fire called 'Henry Louis Vivian Derozio' soon caught the young minds. His mode of teaching was as unconventional as were his ideas. His brilliant lectures presented closely related arguments based on his wide reading, giving his teaching a critical outlook. His students learned to reason out everything and denounced everything that cannot be reasoned. He took great pleasure in his interactions with students, writing about them :

"Expanding like the petals of young flowers
I watch the gentle opening of your minds ...."

But this was not all. The candle that was lit, now wanted to break open the confinement of the classroom and spread far and wide. Derozio's radicalism thus, caught on the young minds like wild fire which gave shape to a band of radical thinkers, known as 'DEROZIANS'. The derozians established a literary and debating club of their own known as the Academic Association, which provided a common meeting ground outside the restrictions of the classroom where young men under the guidance of Derozio could discuss freely the various topics that absorbed their attention. Their motto was : ***'He who will not reason is a bigot, he who cannot reason is a fool, and he who does not reason is a slave.'*** Derozio encouraged his students to read Thomas Paine's *Rights of Man* and other free-thinking texts and, infused in them the spirit of free expression, the yearning for knowledge and passion to live up to their identity, while questioning irrational religious and cultural practices. In the Academic Association, he encouraged debates on subjects like : free will, free ordination, fate, faith, the sacredness of truth, the high duty of cultivating virtue, and the meaness of vice, the nobility of patriotism, the attributes of God, and the arguments for and against the existence of the deity as these have been set forth in Hume on one side, and Reid, Dugald Stewart and Brosn on the other, the hollowness of idolatry and the shackees of priesthood.

As Haramohan Chatterjee states about the debates in the association :

"The principles and practices of Hindu religion were openly ridiculed and condemmed, and angry disputes were held on moral subjects; the sentiments of Hume had been widely diffused and warmly patronised." "The accusation of being irreligious is not entirely correct. The Derozian aim was in truth" *to summon Hinduism to the bar of reason."* When Derozio was dismissed he wrote back, *"That I should be called a sceptic and infidel is not surprising, as these names are always given to persons who think for themselves in religion ...."*

Derozio died in 1831, however, the Academic Association was kept alive till about 1839 with David Hare accepting the presidentship after Derozio.

The DEROZIANS, inspired by their fire-brand teacher formed the YOUNG BENGAL — a movement that like a mighty storm tried to sweep away everything before it. It was a storm that lashed society with violence causing some good, and perhaps quite expectedly, some discomfort and distress. The movement was the morning star of what later came to be known as the BENGAL RENAISSANCE ..... The flame, thus went higher and higher ....

but like always storms came upon to shake the flame, to blow it off. The orthodox Hindu families revolted accusing him of corrupting

the young minds, demanding his expulsion and threatening to withdraw their children otherwise. The Hindu-dominated management committee of the college, and the chairmanship of Radhakanta Deb, expelled him as a faculty member by a 6 : 1 vote, for having *'materially injured [the student's] Morals and introduced some strange system the tendency of which is destruction to their moral character and to the peace in Society ..... In consequence of his misunderstanding no less than 25 Pupils of respectable families have been withdrawn from the College."*

His dismissal, however, did not curb the flame. He continued his interaction with his students, help them bring out several newspapers .... thereby, keeping the flame of derozians burning ....

The flame then spread nationwide manifesting itself into papers like The Enquirer and Jnananvesan. He had opened the floodgates of free thinking, which, now flooded the entire Bengal — bringing about a revolution — with derozians — Krishna Mohan Banerjee, Dakshinaranjan Mukherjee and Rasik Krishna Mallick — in the lead. A movement, which, brought on a whirlwind of radical change in the thought process of most educated Bengalis ..... people started questioning the orthodox rituals and customs, seeking for logic and refused to accept anything without reason ..... the seed sowed by Derozio has started to bloom .....

The fire thus raged on and on ..... ravaging the illogical social norms, cleansing the nation of the vices of superstition ..... and the fire still burns on ..... when we at some point of time in our lives fan it by thinking freely, rationally, revolting against being a slave to social rules .... when we too stand up for a cause – reason, fight, rebel – or rather in one word – turn **DEROZIANS** .... and take forward the baton of this revolutionary, fire-brand gentleman named **HENRY LOUIS VIVIAN DEROZIO** — the fire that consumed itself to give us light!

What constitutes the Presidencian today...

Disclaimer: *We agree with everything, and yet nothing, in the following survey. The following views are not ours, yet ours as well. We have surveyed a mere 150 people, and employed exaggeration, vulgar generalization and non-sequitors of quite breathless effrontery. The results are not meant to offend, and if they do, PLEASE don't lynch us.*

1. What is the focal point of a Presidencian's life?

Contrary to empirical evidence, 72% of Presidencians claim that "Porashuno" is the focal point of their college life. 7% spend their time dancing around trees, singing lovey-dovey songs, 16.25% have something to do with the Revolution (whether they cheer it or jeer it). The grand old man of the college, Pramod da, is the focal point of a mere 4.75%. For his sake, one hopes that they are all women.

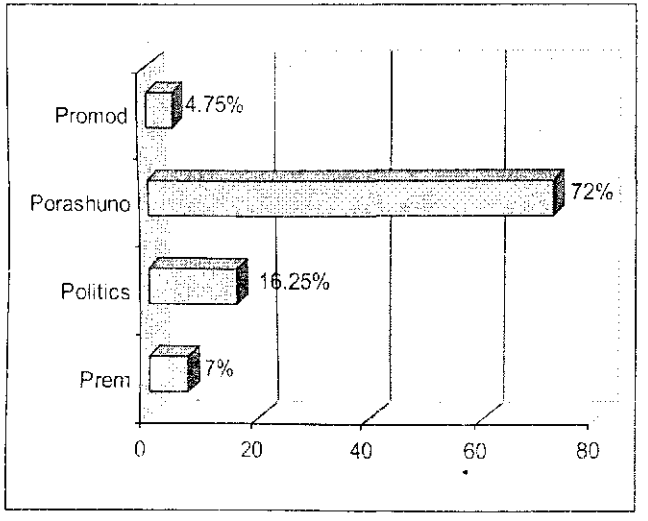

Moving on to mushier waters...

Prem:

2. Should homosexuality be legalized?

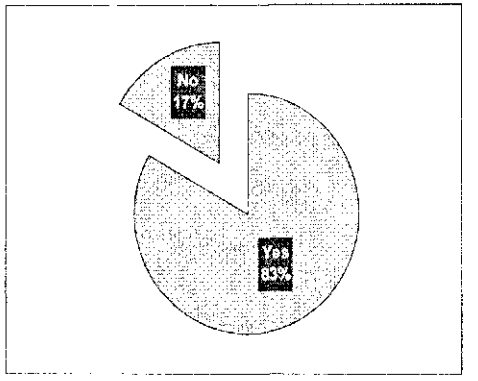

Strangely enough, we start off with homosexuality, and, in a healthy indication, a resounding 83% do not find "queerness" queer. Among the reactionaries who do, 92% find it contrary to our culture (what culture?!), 7% are not that liberal yet, and a mere 0.83% have moral scruples against it.

3. Do you believe in the institution of marriage?

Yes – 70%
No – 30%

4 a) Would you consummate your relation before marriage?

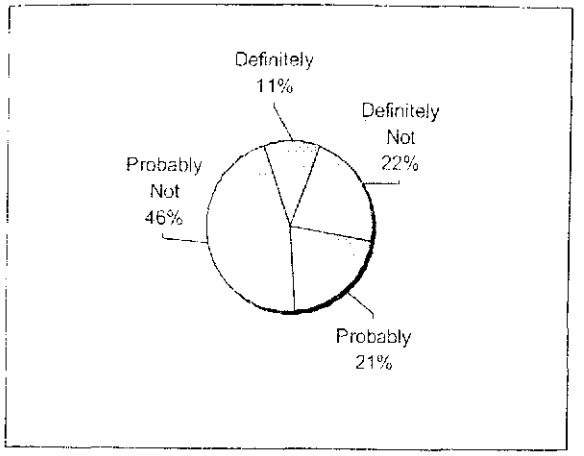

b) Would you live in with your partner before marriage?

Probably – 12.75%
Probably Not – 60.25%
Definitely – 6%
Definitely Not – 21%

Looks like we will have more bachelors and spinsters from the current student body, than 5 years ago (the last survey conducted). Yet in an interesting paradox, fewer people are ready to engage in casual sex!! In the same vein, the majority of the people are hesitant about living in with their partners, or consummating their relationships before marriage. They have the deepest sympathies of the editors of this survey. And so do their partners.

Would you ever agree to casual sex?

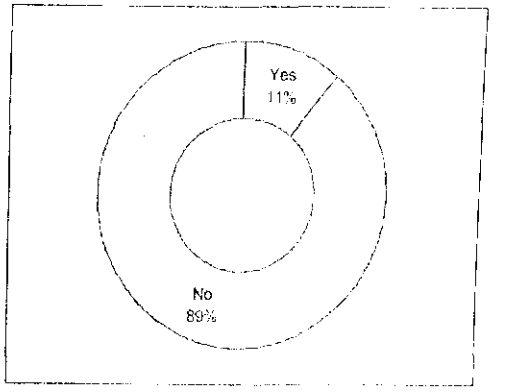

5. Well it seems 3 years is not enough for a Presidencian to find his/her dream girl/boy as 51% are hell-bent on not getting a partner from college (they would prefer bharatmatrimony.com) Come on now, there are still pretty ladies and handsome hunks left in the college, as 40% do believe, and still keep faith in getting a partner from Presi. The editors would like to declare that they are available.

6. Places in college you would prefer to be with your partner:

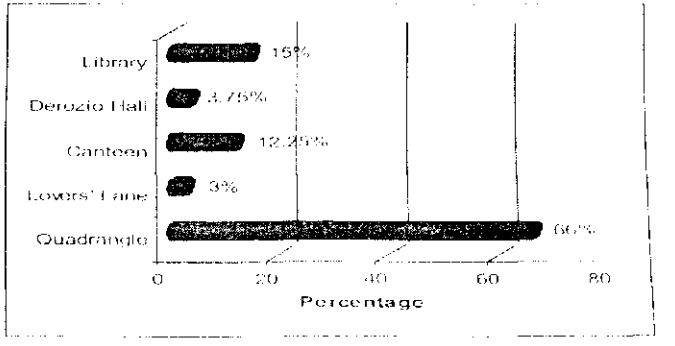

(this is not withstanding the fact that the quadrangle is one of the most inconspicuous places in the campus)

7. 60% agree that the husband of a working woman should also clean nappies, a greater number, 70%, believe in husband and wife sharing equal responsibilities. (Did this 10% miss the last question, or they just plain hate nappies?)
As expected, the girls are more ready to give up their jobs to take care of household responsibilities and support their spouse earning more, than the boys do. Any feminists reading this?

Now lets move on to what it seems is the most popular topic,

Porashuno:

8. Where do you learn most in college?

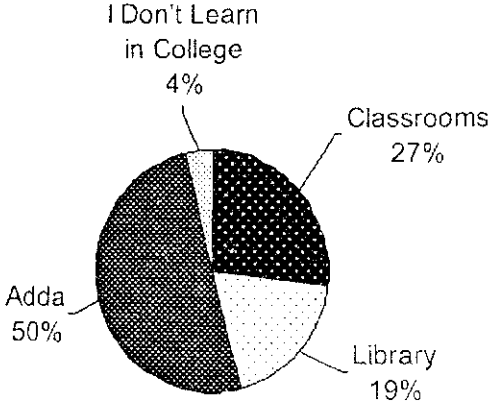

There goes the haloed tradition of legendary professors and house-full tutorials, even though 48% are still inspired by it (see next question). 28% of the population are closet intellectuals, and choose to "critically engage" with the Presidency of yore. (Eh??!!)

9. How does the "haloed academic traditions of Presidency College" affect you?

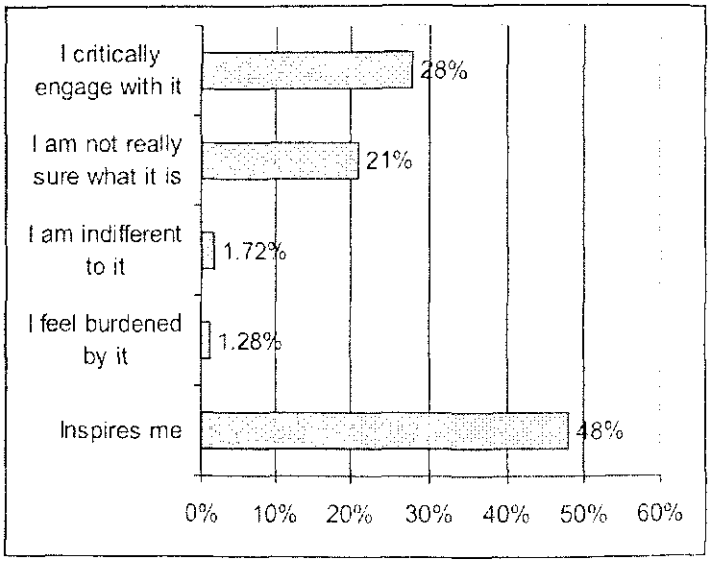

10. Why have you chosen the subject you are studying?

In a reassuring turn, 72% are still motivated by love for their subjects, although 16% are bogged down by family pressure. And Presidency still provides refuge to the elite 2% who chose their subject at random.

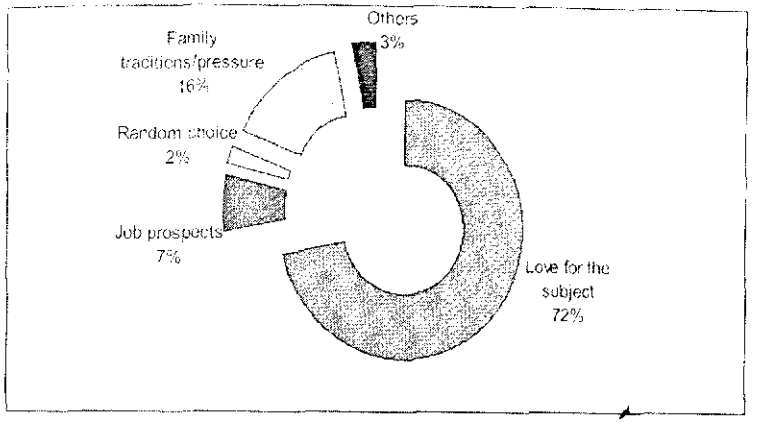

11. This magazine has a special section on Derozio, and Woo Hoo!! Everyone does know who Derozio is. 87% of the demographic think his greatest impact was Radicalism. 51% (these are the same comedians dancing around trees and singing lovey-dovey songs) argue for his romantic imagery being his biggest contribution. The remaining 8% are strict rationalists, and spend their lives being criticized by post modern scholars.

12. A healthy sign, as compared to 5 years ago, the number of students who wish to continue their studies abroad has come down considerably (only 9.6%), though Presidencians still continue to chose other states over West Bengal when it comes to studying (52.4%). The state government can take heart in the fact that the students wishing to remain in West Bengal has also come up to 31%.

13. Favorite authors of the college

Well, well, where to begin! Presidency is the supposed intellectual hot spot of Bengal, and --- Dan Brown and his conspiracy theories are evidently the most popular, as 86% seem to have read him! Its good to see that the Bard of Bengal holds his sway over the sob-staves of Chetan Bhagat. Harry Potter is working his magic, but Frodo remains marooned on Middle Earth. Sexists are keeping Taslima Nasreen at bay, and while name-dropping may be a norm, less than 9% have read Dostoevsky or Said. It turns out that Presidencians are a humorless, morose lot: just 2.2% read P G Wodehouse. (Can't you lot take a joke??)

Dan Brown	86%
Rabindranath Tagore	69%
Salman Rushdie	61%
Chetan Bhagat	58%
J K Rowling	47.7%
Parashuram	39%
Taslima Nasreen	22.7%
Amitabh Ghosh	21%
Premchand	12.5%
Edward Said	8.9%
Dostoevsky	7.5%
Ayn Rand	4.7%
Tolkien	3.7%
P G Wodehouse	2.2%

14. Which is the most pointless subject in Presidency?

Economics	-- 0.08%
Philosophy	-- 20%
History	-- 7%
Physics	-- 0.92%
None	-- 67%
No Comments	-- 5%

The editors would like the readers to note that they belong to the last category: **NO COMMENTS!**
(We are still trying to find out which of us came up with this question)

This section needs no introduction:

Politics:

15. A much, much greater number of people (73%) are interested in politics than 5 years before, and about half of them (51.66%) believe that social commitment demands active political participation.

Are you interested in politics?

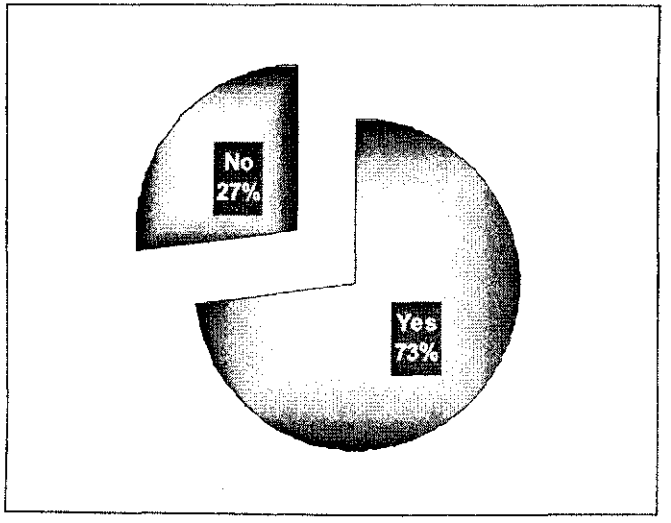

16. However, mainstream political parties are still scoffed at by large numbers (only 11% of those who want to enter active politics want to join mainstream political parties), who prefer activism or analysis instead...

17. Do you think that the government can handle terror?

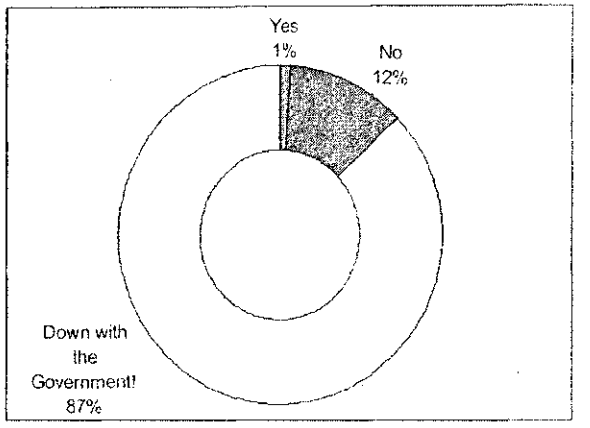

When faced with terror, the anarchist in most of us comes out, as 87% like to cry: "Down with the government!"
With the Lok Sabha elections coming up, political analysts should take note that only 1% of the Presidencians stand by the present government when it comes to handling terror.

Our final section is on the heart-throb of 4.75% of the students,

Pramodda:

18. 65% of the student body smoke, but most (52.5%) refuse to grant women the said dubious privilege. A streak of conservatism? An instance of patriarchal dominance? Readers decide...

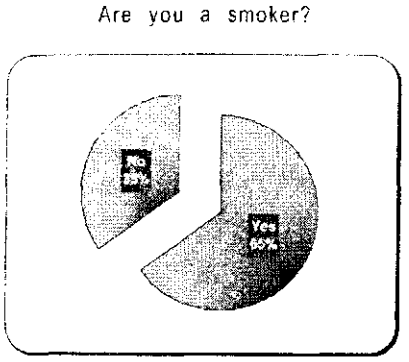

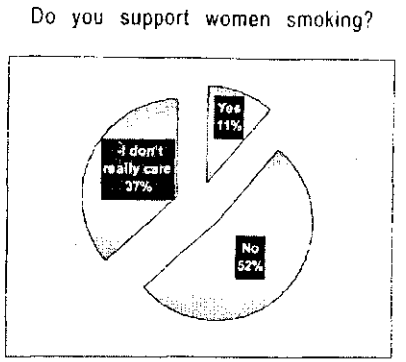

19. Do you think the canteen needs to be shifted?

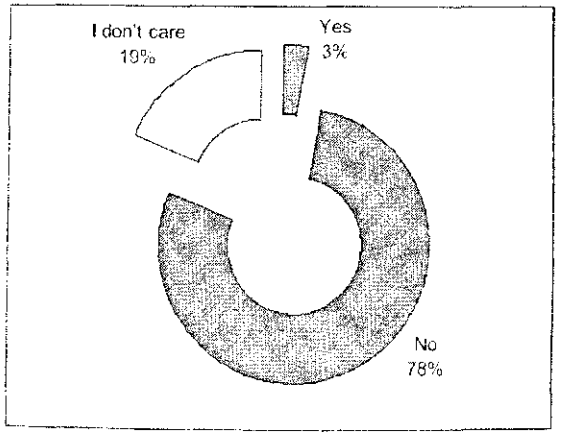

So much so for the administrations' plans...

20. Almost half (49%) of those surveyed think that Pramodda's fare is a "little" overpriced... We don't mind gulping oily chicken rolls and inviting coronary thrombosis, but we are damned if we have to turn bankrupt in the process.

21. Fundamentalists beware! 91% of Presidencians wouldn't allow religious shrines in the college if they had their say.

22. Which are the favorite "adda-spots" in the college?

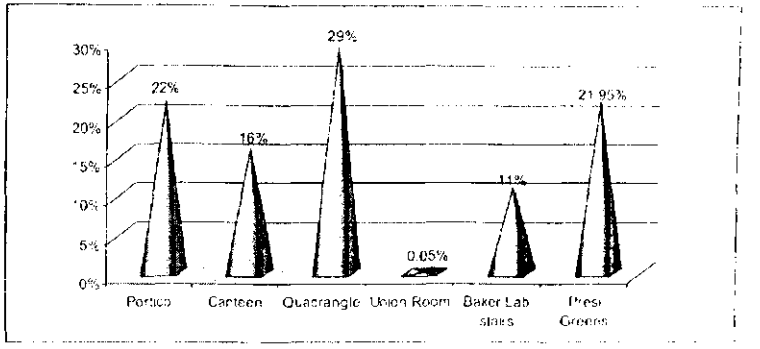

Again we find Presidencians don't like cramped, closed quarters...

Well, we have tried to present a picture, which may be a little biased (because the editors mainly distributed the survey sheets to their friends), but which does bring out how a Presidencian thinks today. One thing which we would have very much liked to add here are the numerous colorful comments that some students added to their survey sheets. But we are helpless... the government is doing nothing to bring down the price of paper. And we fear the censorship board...

Editors and Publication Secretaries of The Presidency College Magazine

YEAR	EDITORS	SECRETARIES
1914-15	Pramatha Nath Banerjee	Jogesh Chandra Chakravarti
1915-17	Mohit Kumar Sen Gupta	Prafulla Kumar Sircar
1917-18	Saroj Kumar Das	Ramaprasad Mukhopadhyay
1918-19	Amiya Kumar Sen	Mahmood Hasan
1919-20	Mahmood Hasan	Paran Chandra Gangooli
1920-21	Phiroze E. Dastoor	Shyama Prasad Mookherjee
1921-22	Shyama Prasad Mookherjee Brajakanta Guha	Bimal Kumar Bhattacharya Uma Prasad Mookherjee
1922-23	Uma Prasad Mookherjee	Akshyay Kumar Sarkar
1923-24	Subodh Chandra Sen Gupta	Bimal Prasad Mukherjee
1924-25	Subodh Chandra Sen Gupta	Bijoy Lal Lahiri
1925-26	Asit K. Mukherjee	Sunit Mahbub Murshed
1926-27	Humayun Kabir	Lokesh Chandra Guha Roy
1927-28	Hirendranath Mukherjee	Sunit Kumar Indra
1928-29	Sunit Kumar Indra	Syed Mahbub Murshed
1929-30	Taraknath Sen	Ajit Nath Roy
1930-31	Bhabatosh Dutta	Ajit Nath Roy
1931-32	Ajit Nath Roy	Nirmal Kumar Bhattacharjee
1932-33	Sachindra Kumar Majumdar	Nirmal Kumar Bhattacharjee
1933-34	Nikhilnath Chakravarty	Girindra Nath Chakravarti
1934-35	Ardhendu Bakshi	Sudhir Kumar Ghosh
1935-36	Kalidas Lahiri	Prabhat Kumar Sircar
1936-37	Asok Mitra	Arun Kumar Chandra
1937-38	Bimal Chandra Sinha	Ram Chandra Mukherjee
1938-39	Pratap Chandra Sen Nirmal Chandra Sen Gupta	Abu Sayeed Chowdhury
1939-40	A. O. M. Mahiudin	Bimal Chandra Dutta
1941-42	Arun Panerjee	Golam Karim

YEAR	EDITORS	SECRETARIES
1942-46	*(No Publication)*	
1947-48	Sudhindranath Gupta	Nirmal Kumar Sarkar
1948-49	Subir Kumar Sen	Bangendu Gangopadhyay
1949-50	Dilip Kumar Kar	Sourindra Mohan Chakravorty
1950-51	Kamal Kumar Ghatak	Mans Muktamani
1951-52	Sipra Sarkar	Kalyan Kumar Das Gupta
1952-53	Arun Kumar Das Gupta	Jyotirmoy Pal Choudhury
1953-54	Ashin Ranjan Das Gupta	Pradip Das
1954-55	Sukhamoy Chakravarty	Pradip Ranjan Sarbadhikari
1955-56	Amiya Kumar Sen	Devendra Nath Banerjee
1956-57	Ashok Kumar Chatterjee	Subal Das Gupta
1957-58	Asoke Sanjay Guha	Debaki Nandan Mandal
1958-59	Ketaki Kushari	Tapan Kumar Lahiri
1959-60	Gayatri Chakrabarty	Rupendra Majumdar
1960-61	Tapan Kumar Chakravarty	Ashim Chatterjee
1961-62	Gautam Chakravarty	Ajoy Kumar Banerjee
1962-63	Badal Mukherjee	Alok Kumar Mukherjee
	Mihir Bhattacharya	
1963-64	Pranab Kumar Chatterjee	Pritis Nandy
1964-65	Subhash Basu	Biswanath Maity
1965-66	*(No Publication)*	
1966-67	Sanjoy Kshetry	Gautam Bhadra
1967-68	(No Publication)	
1968-69	Abhijit Sen	Rebanta Ghosh
1969-72	*(No Publication)*	
1972-73	Anup Kumar Sinha	Rudrangshu Mukherjee
1973-74	Rudrangshu Mukherjee	Swapan Chakravarty
1974-75	Swapan Chakravarty	Suranjan Das
1975-76	Sankar Nath Sen	Paramita Banerjee
1977-78	Sugata Bose	Gautam Basu
1978-81	(No Publication)	
1981-82	Debasish Banerjee	Banya Dutta
	Somak Ray Chaudhury	

YEAR	EDITORS	SECRETARIES
1982-83	(No Publication)	
1983-84	Sudipta Sen, Bishnupriya Ghosh	Subrata Sen
1985-86	Brinda Bose, Anjan Guhathakurata	Chandrayee Niyogi
1986-87	Subha Mukherjee, Apurba Saha	Jayita Ghosh
1988-89	Anindya Dutta, Suddhasatwa Bandyopadhyay	Sanchita Bhowmik
1989-90	Abheek Barman, Amitendu Pali, Adrish Biswas	Debasish Das
1990-92	Jayanta Ray, Shiladitya Sarkar	Pratik Mitra, Chandrani Majumdar
	Debraj Bhattacharya, Pathikrit Sengupta	Sanjoy Chakroborty,
1993-95	Soumya Sundar Mukhopadhya	Ananda Sankar Roy
	Arjun Deb Sen Sharma, Debanuj Dasgupta	Soumya Sundar Mukherjee
	Santanu Das	
1995-96	Sanjoy Chakraborty, Saibal Basu	Arijit Bhattacharya
1996-98	Bodhisattva Kar, Anirban Mukherjee	Raja Bhattacharya
	Anindyo Sengupta, Kumar Kislay	Asis Pathak
1998-00	Riddhi Sankar Ray, Lincoln Roy	Roshni Mukherjee
	Ashok Kasari, Phalguni Ghosh	
2000-01	Paromita Chakraborty, Sapna Guha	Lincoln Roy
	Soumitro Ghoshm, Kunal Singh	
2001-02	Arjun Chatterjee, Uditi Sen, Deblina Sengupta	
	Nabaruna Bhattacharya, Saubhik Ghosh	Atig Ghosh Roy
2002-03	Riya Bhattacharjee, Shatarupa Banerjee	Abheek Banerjee
	Shibaprasad, Amritava Dey, Shubro Bhattacharya	
2004-05	Devapriya Roy, Vivek Shaw	Abhirup Dam
2005-06	Arka Chattopadhyay, Kaushik Baisya	Priyankar Dey
2006-07	Sharmishtha Ghosh (Joint Publication)	Debojyoti Mondol
2007-08	Avishek Ghoshal, Sharmishtha Ghosh	Soumik Ghosh
2008-09	Anitesh Chakraborty	Soumik Saha
	Sreecheta Das	
	Dinanath Singh	